আট-আনা-সংস্করণ-গ্রন্থমালার সপ্তম গ্রন্থ

দূর্ব্বাদল

[দ্বিতীয় সংস্করণ]

শ্রীযতীন্দ্রমোহন সেন গুপ্ত প্রণীত

কার্ত্তিক,—১৩২৪

প্রকাশক—শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়,

"গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্,"

২০১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

প্রিণ্টার—শ্রীবিহারীলাল নাথ,

"এমারেল্ড্ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্"

৯, নন্দকুমার চৌধুরীর দ্বিতীয় লেন, কলিকাতা

উৎসর্গ পত্র

বাণীর

চারু মন্দির দুয়ারে

যে দিন শঙ্কাচকিত বক্ষে দণ্ডায়মান হইয়াছিলাম,

সেদিন যাঁহার অযাচিত স্নেহ ও আশীর্ব্বাণী আমাকে

উৎসাহিত করিয়াছিল, যাঁহার অঙ্গুলিসঙ্কেত

আমার মন্দির প্রবেশ পথ

দেখাইয়া দিয়াছিল,

আজি সেই

'ভারতী'-সম্পাদিকা

দেবী

স্বর্ণকুমারীর

শ্রীচরণপঙ্কজোদ্দেশে

এই ক্ষুদ্র

'দূর্ব্বাদল'-রচিত অর্ঘ্যসম্পুট

উৎসর্গ করিতেছি।

'বিল্বপুষ্প দূর্ব্বাদলেই' দেবতা অর্চ্চিত হইয়া থাকেন;

আমি 'বিল্বপুষ্পদল' চয়ন করিতে পারি নাই,

'দূর্ব্বাদল'

আনিয়াছি।

ইহার শ্যাম কমনীয়তাটুকুও বুঝি নাই;—তবে শ্রদ্ধার

দান অযোগ্য হইলেও দেবতা তাহা গ্রহণ করিয়া

থাকেন, এই টুকুই আশা।

সেনহাটী,
শ্রাবণ, ১৩২৩

যতীন্দ্রমোহন

দূর্ব্বাদল

কমলা

নিখিল পাশ করিয়াই বাগেরহাটে ওকালতী আরম্ভ করিল। কমলার রজতোজ্জ্বল হাস্যধারায় এই নূতন উকিল বাবুটির গৃহখানি উদ্ভাসিত হইয়া না উঠিলেও, পত্নী কমলার নির্ম্মল স্মিতানন প্রভায় তাহার অন্তররাজ্য স্নিগ্ধ প্রেমোজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল।

সন্ধ্যার পূর্ব্বে কাছারী হইতে ফিরিয়া আসিয়া নিখিল অনুচ্চস্বরে ডাকিল, "ওগো—"

কমলা বাতায়নপার্শ্বে স্বামীর প্রত্যাগমনপথ চাহিয়া অপেক্ষা করিতেছিল; দ্রুত, চঞ্চল পদে কাছে আসিয়া কহিল—"ওগো কেন, আমার নাম নাই কি?"

নিখিল একটু হাসিয়া কহিল, "তা' হইলে কি হয়! কবি কি বলিয়াছেন জান ত? তোমরা হ'লে আমাদের জীবন-সংগ্রামের টোগো, আর সব চেয়ে মিষ্টি হ'ল তোমাদের ঐ নামটি 'ওগো'!"—নিখিল কবিতার চরণ দুইটি ভুলিয়া গিয়াছিল; বহুদিন পূর্ব্বে সে কোনও মাসিকে একটি কবিতা পড়িয়াছিল, সে কবিতাটির নাম ছিল 'ওগো'।

কমলা নিখিলের চাপ্‌কানের বোতাম খুলিয়া দিতে দিতে কহিল, "তা, তুমি ত আর কবি নও, কবি যাহা ইচ্ছা তাঁহার 'কবিনীকে' বলিতে পারেন!" "বটে, আমি কবি নই! জান

এতে দস্তুরমত মানহানি করা হইতেছে! কেন, সেদিনকার সে কবিতাটি বুঝি ভুলিয়া গেলে!" কমলা বিস্ময়ের ভাণ করিয়া কহিল, "কবে তুমি কবিতা লিখিলে আবার!" "কেন, এই সেদিনকার সেই কবিতাটি, যাহা তুমি ছিঁড়িয়া ফেলিয়াছিলে!"

কমলা হাসিল। অপাঙ্গদৃষ্টিতে স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া অধর উল্‌টাইয়া কহিল, "ইঃ, ভারি ত কবিতা তোমার!" কয়েক দিন পূর্ব্বে কমলার রূপ বর্ণনা করিয়া নিখিল একটা কবিতা লিখিয়াছিল। কমলাকে বুকের কাছে টানিয়া আনিয়া নিখিল তাহার পুষ্পপুটতুল্য রক্তাধরে ওষ্ঠ স্পর্শ করিল; একটু মৃদুস্বরে ডাকিল, "কমলা!"

স্বামীর সেই স্নেহকোমল আহ্বান শুনিয়া কমলার চক্ষু মুদ্রিত হইয়া আসিল; সে নিখিলের কণ্ঠলগ্ন হইয়া তাহার চুম্বনের প্রতিদান করিল। প্রায় দুই মিনিট কাটিয়া গেল! কমলা চক্ষু খুলিয়া নিখিলের দিকে চাহিল,—দেখিল স্বামীর স্নেহানত দৃষ্টি তাহার মুখের উপরেই নিবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। সে হাসিয়া উঠিল। পরক্ষণেই স্বামীর আলিঙ্গন হইতে মুক্ত হইবার চেষ্টা করিয়া কহিল, "ছাড় আমাকে, তোমার খাবার লইয়া আসি!"

নিখিল একটু মৃদু হাসিয়া কহিল, "আর খাবারের দরকার নাই!"—"ওমা, সে কি কথা!" নিখিল পত্নীর ফুল্ল রক্তাধর দুইটি আঙ্গুল দিয়া একটু টিপিয়া দিয়া কহিল, "কেন, এই যে খাইলাম!"

কমলা একটু হাসিল, কহিল,—"উহাতে ক্ষুধা মিটিবে কি?" "মিটে না?" "আমি কি জানি!"

"না, তুমি ত কিছুই জান না! তোমার ত এখন 'গুরু-মারা বিদ্যা' হইয়াছে।" "তুমি খুব সাধু কিনা!"—কমলা মুখ টিপিয়া হাসিল।

নিখিল উত্তর না দিয়া অন্য উপায়ে কমলার মুখ বন্ধ করিল। কমলা মুখ সরাইল না; একটু পরে কহিল,—"ছাড় সত্যি, খাবারটা নিয়া আসি।"

হাত মুখ ধুইয়া আসিয়া জলযোগ করিতে করিতে নিখিল কহিল, "ভাল কথা, রাত্রে আমি খাব না কিন্তু, সুরেশ নিমন্ত্রণ করিয়াছে, বুঝিলে ? কমলা সংক্ষেপে কহিল, "হুঁ!—"

স্বামী বাড়ীতে আহার করিবেন না বলিলেই কমলা বড় চটিয়া যাইত। স্বামীর জন্য স্বহস্তে পাক করিবার এবং তাঁহাকে পরিবেশন করিয়া পরিতোষপূর্ব্বক ভোজন করাইবার সুখটুকু হইতে বঞ্চিত হইবার সম্ভাবনা দেখিলেই তার মনটা বড়ই অপ্রসন্ন হইয়া উঠিত। সে দিনটা তার পক্ষে যেন একেবারেই বৃথা হইয়া যাইত। কমলার মুখ একটু ম্লান হইয়া উঠিয়াছিল; নিখিল তাহা লক্ষ্য করিবার পূর্ব্বেই কমলা উঠিয়া পান আনিতে গেল। কমলার সংক্ষিপ্ত উত্তরটা শুনিয়া নিখিল বুঝিয়াছিল যে নিমন্ত্রণ খাইতে যাওয়ার কথাটা তাহার একটুও ভাল লাগে নাই।

২

বন্ধুর বাড়ীতে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিয়া নিখিল যখন বাড়ী ফিরিয়া আসিতেছিল, তখন রাত্রি প্রায় বারটা। সঙ্গে সুরেশের চাকর ছিল; নিষেধ সত্ত্বেও সুরেশ তাহাকে সঙ্গে দিয়াছিল। আকাশে মেঘের অন্তরাল দিয়া দশমীর চন্দ্র ছুটিতেছিল। চন্দ্রালোক খুব উজ্জ্বল নহে। গাছের ছায়ায় ছায়ায় অন্ধকার জমাট বাঁধিয়া রহিয়াছে। পথ জনশূন্য। নিখিল অন্যমনস্ক ভাবে চলিতেছিল। হঠাৎ তাহার মনে হইল, পার্শ্ববর্ত্তী নির্জ্জন ভগ্ন-মন্দির হইতে কেহ গভীর কাতরোক্তি করিল। নিখিল থমকিয়া দাঁড়াইল; কারণ অনুসন্ধান করিবার জন্য একটা অদম্য কৌতূহল তাহার অন্তর মধ্যে জাগিয়া উঠিল। চাকরটা কাছে আসিয়াছিল,

নিখিল তাহাকে অস্ফুটস্বরে কহিল, "আমার সঙ্গে যাবি, ঐ মন্দিরের ভিতরে ?"—শব্দটা সেও শুনিয়াছিল।

সে কহিল, "আপনি এখানে অপেক্ষা করুন, আমি দেখিয়া আসি।—"

"একা যাওয়া ঠিক নহে; চল্, দু'জনেই যাইব; লাঠি আছে ত তোর হাতে ?"

চাকর লাঠি দেখাইল। তখন নিখিল ধীরপদে মন্দিরের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। একটা পরিত্যক্ত ভগ্ন মন্দির। একটি বিরাট্ বটবৃক্ষের দৃঢ় আলিঙ্গনে মন্দিরটি বহুদিন হইতে নিষ্পিষ্ট হইতেছিল। নিখিল অতি সন্তর্পণে দুয়ারের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। ভিতরের দিকে দৃষ্টিপাত করিল, কিছুই দেখা গেল না। শুধু স্থানে স্থানে অন্ধকারটা একটু বেশী জমাট্ মনে হইল; একটা অস্পষ্ট শব্দ শুনা যাইতেছিল; চারি পাঁচ জন লোকের একত্র সমাগম হইলেই তদ্রূপ অস্পষ্ট শব্দ শুনা যায়। এই সময়ে আর একবার পূর্ব্বশ্রুত কাতরোক্তির ন্যায় আর একটি শব্দ শ্রুত হইল। নিখিলের মনে হইল, ঐ শব্দ স্ত্রীকণ্ঠোত্থিত। মুহূর্ত্তমাত্র চিন্তা করিয়া সে পকেট হইতে বৈদ্যুতিক আলোকাধারটি বাহির করিয়া লইল; 'সুইচ্' টিপিয়া দিয়া, গর্জ্জন করিয়া এক লম্ফে সে মন্দিরমধ্যে প্রবেশ করিল। বৈদ্যুতিক আলোকপ্রভায় মন্দির আলোকিত হইয়া উঠিয়াছিল। যাহারা মন্দিরমধ্যে ছিল, তাহারা ভীত, সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল। এমন অতর্কিত আক্রমণ তাহারা স্বপ্নেও আশা করে নাই।

নিখিল গৃহপ্রবেশ করিয়াই একজনকে লাঠির আঘাতে ভূতলশায়ী করিল। অন্য কয়জন বিপরীত দ্বারপথে দ্রুতবেগে বাহির হইয়া গেল। নিখিলের সঙ্গের লোকটিও সেই দ্বার রোধ করিবার জন্য একপার্শ্বে দণ্ডায়মান ছিল। হঠাৎ মন্দির আলোকিত হইয়া উঠিবে, সেও আশা করিতে পারে নাই। তাহার

পাশ দিয়া যখন দুইটি লোক ছুটিয়া পলায়ন করিল, তখন সে সতর্ক হইয়া উঠিল। তৃতীয় ব্যক্তি তাহার লাঠির আঘাতে ভূতলশায়ী হইল।

নিখিল কক্ষতলে আলোকরশ্মিপাত করিয়া দেখিল, কেহ আবদ্ধাবস্থায় শায়িত রহিয়াছে; সে যে নারী, তাহা সে প্রথম দৃষ্টিতেই বুঝিল। ধীরে ধীরে তাহার বন্ধন উন্মোচন করিয়া দিয়া, নিখিল সেই রমণীর ত্রস্ত কুন্তলদামবিজড়িত মুখের দিকে চাহিল। নিখিল বুঝিল, সে সংজ্ঞাশূন্যা; তখন সে ডাকিল, "বিহারী!—"

বিহারী কাছে আসিল; আসিবার সময় সে ভূপাতিত লোকটাকে টানিয়া লইয়া আসিল। আশঙ্কা, যদি সে পলায়ন করে। নিখিল কহিল, "বিহারী, একখানি পাল্কী দেখিতে হইবে, এবং থানায়ও একটা খবর দিতে হইবে।"

"আপনি এখানে একা থাকিতে পারিবেন কি?"

"তা' পারিব, যাও তুমি, দেরী করিও না।"

বিহারী বাহির হইয়া গেল। কিছুদূর যাইতেই সে চৌকীদারের হাঁক শুনিল। সে তাহাকেই ডাকিয়া ফিরাইয়া মন্দির সম্মুখে লইয়া আসিল। পাহারাওয়ালা নিখিল বাবুকে চিনিতে পারিয়া সেলাম করিল। নিখিল তাহাকে অবস্থা বুঝাইয়া দিল; এবং আঘাতপ্রাপ্ত লোক দুইটাকে থানায় লইয়া যাইতে উপদেশ দিল। সে বাহিরে আসিয়া উচ্চকণ্ঠে তাহার সঙ্গীকে ডাকিল। সে দূর হইতে সাড়া দিয়া অচিরে কাছে আসিল।

বিহারী পাল্কী লইয়া আসিলে নিখিল সেই রমণীকে সাবধানে পাল্কীতে উঠাইল; পাহারাওয়ালাদিগকে যথোপযুক্ত উপদেশ দিয়া বাসায় ফিরিয়া আসিল। কমলার শুশ্রূষায় সেই অপরিচিতা নারী সংজ্ঞালাভ করিল দেখিয়া, নিখিল থানায় চলিয়া গেল, এবং সেই রাত্রেই পুলিস ইন্স্পেক্টরের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া সকল ব্যাপার বুঝাইয়া বলিয়া আসিল।

৩

মাসান্তে এক শনিবারের মধ্যাহ্নে কমলা আসিয়া সুষমাকে কহিল,—"সব ত শুনিয়াছ ?"

সুষমা সেই অপরিচিতা নারী,—যাহাকে নিখিল সে দিন রাত্রে উদ্ধার করিয়া আনিয়াছিল। সুষমা অন্যমনস্কভাবে কহিল, "হাঁ শুনিয়াছি"—তারপর অর্থশূন্য স্থির দৃষ্টিতে কমলার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। কমলা অন্তরে ব্যথিত হইয়া উঠিতেছিল। সুষমা যে কতখানি নিরুপায়, আশ্রয়হীন, সে তাহা আজ নিখিলের কাছে শুনিয়াছিল।

সুষমার পিতা বহুদিন পূর্ব্বে স্বর্গগত হইয়াছিলেন। দুঃখে, কষ্টে মাতাপুত্রীর দিন কোনও মতে কাটিতেছিল। দুই বৎসর পূর্ব্বে একদিন শ্রাবণের সন্ধ্যায় মাতারও ডাক আসিল। কন্যার যে কোনও উপায়ই করিয়া যাইতে পারিলেন না, এই চিন্তা তাঁহাকে মৃত্যুকালেও দগ্ধ করিতেছিল। রোগশীর্ণ দুর্ব্বল হস্তখানি অশ্রুমুখী কন্যার মস্তকের উপর রক্ষা করিয়া জননী কহিলেন, "মা, আমার ডাক আসিয়াছে, কিন্তু কত বড় নিঃসহায় অবস্থায় তোকে ফেলিয়া যাইতেছি, তাহা মনে করিয়া কোনও ক্রমেই শান্তি পাইতেছি না।"

দুই বিন্দু অশ্রু সেই মৃত্যুপথযাত্রিণীর বিশীর্ণ কপোল বাহিয়া নামিয়া আসিল। সুষমা মুখ ফিরাইয়া অঞ্চলে নিজের অশ্রু মুছিয়া ফেলিল; তার পর মাতার মুখের কাছে মুখ আনিয়া কহিল, "মা, যিনি নিঃসহায়ের সহায়, তিনি তোমার কন্যাকে আশ্রয় দিতে বিমুখ হবেন না; বাবা যখন চলিয়া গিয়াছিলেন, তখনও কি আমরা কম অসহায় অবস্থার মধ্যে পড়িয়াছিলাম? ঠাকুর ত আমাদের অসহায় বলিয়া তুচ্ছ করেন নাই, ত্যাগ করেন নাই; এখনও তিনিই, যাহাই হউক, একটা উপায় করিবেনই; এ জন্য তুমি কষ্ট করিও না, মা, মনের মধ্যে অশান্তি আনিও না।"

কন্যার কথা শুনিয়া জননীর ম্লানদৃষ্টি একবার আশায় ও বিশ্বাসে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। তিনি কন্যার মাথাটাকে প্রাণপণে বুকের কাছে টানিয়া আনিয়া কহিলেন, "ঠাকুরই তোকে আশ্রয় দিবেন; তোর কথা শুনিয়া আমি যেন নিশ্চিন্ত হইতে পারিতেছি; সুষমা, আমার মুখের কাছে তোর মুখখানি লইয়া আয়, আমি একবার ভাল করিয়া দেখিব।" জননীর দৃষ্টিশক্তি দ্রুত হ্রাস প্রাপ্ত হইতেছিল। সুষমা মুখের কাছে ঝুঁকিয়া পড়িল; চক্ষুর পাতা অবসন্ন হইয়া আসিতেছিল, তবু জোর করিয়া চক্ষু খুলিয়া তিনি কন্যার মুখের দিকে চাহিলেন। দৃষ্টি স্থির হইয়া আসিল; যে কাল ছায়াটা দৃষ্টির সম্মুখে এতক্ষণ অস্পষ্টভাবে নাচিতেছিল, তাহা গাঢ় হইয়া আসিল। সুষমা জননীর মুখের কাছে মুখ দিয়া একবার উন্মাদের ন্যায় আকুলকণ্ঠে ডাকিল,—"মা,—মা,—!"

মার ওষ্ঠ একটু নড়িল; তার পর সব স্থির, শান্ত হইয়া গেল! সুষমা মৃতা জননীর শয্যা-পার্শ্বেই স্থিরভাবে বসিয়া রহিল। তাহার চক্ষু শুষ্ক, কম্পনবিরহিত! প্রতিবেশিনী রমণীরা সান্ত্বনা প্রদান করিতে আসিয়াছিলেন, তাঁহারা সাহস করিয়া তাঁহার কাছে আসিলেন না।

সুষমার এমন কোনও নিকট আত্মীয় ছিল না, যাহার নিকট সে আশ্রয় পাইতে পারে। এক দূর জ্ঞাতি খুল্লতাত ছিলেন; সুষমার জননীর মৃত্যুর একমাস পরেই তাঁহার স্ত্রীর কাল হয়। সংসারে অন্য স্ত্রীলোক না থাকাতে তিনি বড়ই অসুবিধার মধ্যে পড়িলেন, এবং একদিন সুষমাকে লইয়া যাইবার জন্য তাহাদের বাড়ীতে আসিলেন। সুষমা খুড়ার সঙ্গে তাঁহার বাড়ীতে চলিয়া আসিল। সংসারের সমস্ত কার্য্য সে একদিনেই বুঝিয়া লইল, এবং খুড়াকে যত্ন ও সেবা দ্বারা সুখী করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিল।

দুইমাস পরে খুড়া যখন পুনর্ব্বার দারপরিগ্রহ করিয়া বাড়ী

আসিলেন, সে দিন সর্ব্বপ্রথমে সুষমা নবাগতাকে ভাণ্ডার গৃহের চাবির সহিত সমস্ত সংসারের দায়িত্ব বুঝাইয়া দিল। নূতন বধূ তীব্রকটাক্ষে এই সাক্ষাৎ ভগবতীর তুল্য রূপশালিনী রমণীর আপাদমস্তক দেখিয়া লইল, তারপর চাবির গোছা আঁচলে বাঁধিয়া একটি কথাও না বলিয়া গৃহান্তরে চলিয়া গেল। তাহারই ন্যায্য প্রাপ্য অধিকার তাহাকে বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে, ইহার মধ্যে কৃতজ্ঞতার কোনও কথাই থাকিতে পারে না! সেইদিন হইতে সুষমা সহস্র প্রকার উপেক্ষা, তীব্র শ্লেষ, নিন্দা ও গ্লানির মধ্যে সংসারের সর্ব্বপ্রকারের দাসীপণাকে নীরবে স্বীকার করিয়া লইল। যাহার আশ্রয় নাই, যাহার মুখের দিকে চাহিবার কেহ নাই, সে যেটুকু আশ্রয় পাইয়াছে, তাহা ত্যাগ করিয়া কোথায় যাইবে? সুতরাং সে বিপুল ধৈর্য্যের সহিত সর্ব্ব প্রকারের উপেক্ষা ও বেদনাকে বরণ করিয়া লইল এবং যিনি সুখ ও দুঃখের হিসাবকে সমভাবেই রক্ষা করেন, তাঁহার পায়ের কাছে সেই উপেক্ষা ও বেদনাকে নিবেদন করিয়া দিল। এমন সময়ে একদিন দুষ্কৃতকারিগণের নির্ম্মম হস্ত তাহাকে সেই আশ্রয়টুকু হইতেও বিচ্যুত করিয়া লইয়া গেল!

নিখিল যখন সুষমার খুল্লতাত কালীদয়াল বাবুর কাছে সুষমাকে ফিরাইয়া লইয়া আসিবার জন্য প্রস্তাব উপস্থিত করিল, তখন তিনি স্পষ্টই বলিয়াছিলেন যে যাহাকে পাপিষ্ঠেরা চুরি করিয়া লইয়া গিয়াছে, তাহাকে তিনি কোনও ক্রমেই ঘরে স্থান দিতে পারেন না! এবং উহাতে যে নিশ্চিত জাতিপাত হইবে এবং সমাজচ্যুত হইতে হইবে, এ কথাও নিখিলকে তিনি সুস্পষ্টরূপে বুঝাইয়া দিলেন। সমাজে বাস করিয়া এমন দুঃসাহসিকের কার্য্য তিনি কেমন করিয়া করিবেন? নিখিলের সহিত যখন তাঁহার কথা হয়, তখন নূতন বধূ হেমাঙ্গিনী দরজার অন্তরালেই ছিল, এবং মধ্যে মধ্যে চাবির গোছা নাড়িয়া নিজের উপস্থিতি

জ্ঞাপন করিতেছিল, পাছে স্বামী চক্ষুলজ্জায় পড়িয়া পুনরায় সুষমাকে আশ্রয় প্রদান করিতে স্বীকৃত হন !

জননীর যে দিন মৃত্যু হইয়াছিল, সে দিন সুষমা নিজেকে যতটুকু নিরাশ্রয়, অসহায়া মনে করিয়াছিল, আজ নিজেকে তদপেক্ষা সহস্রগুণ নিরাশ্রয়, অসহায় মনে করিতে লাগিল ! সে দিন মাথার উপর একটা কলঙ্কের বোঝা ছিল না, আজ যদিও সে দোষসংস্পর্শপরিশূন্যা, তবুও তাহাকে সমাজের গণ্ডীর বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইতে হইল ! যে তাহাকে আশ্রয় প্রদান করিবে, তাহাকেও সমাজের কাছে লাঞ্ছিত হইতে হইবে ! তাহার কোনও অপরাধই নাই, তবুও সমাজের উদ্যত বজ্রের নিম্নে তাহাকে মাথা পাতিয়া দিতেই হইবে। কিন্তু সমাজের বিচার আর ভগবানের বিচার ত এক নহে ! তিনি ত সবই জানেন ; সমাজ যদি তাহাকে তাহার বজ্রাঘাতে চূর্ণ, বিধ্বস্ত করিয়াও দেয়, তবুও সে বিচারের জন্য সেই বিশ্বের ঠাকুরের দিকেই চাহিয়া রহিবে !

সুষমা কমলার মুখের উপর হইতে দৃষ্টি ফিরাইয়া লইয়া, জানালার ফাঁক দিয়া বাহিরের আকাশের দিকে চাহিল ! উদার, অনন্ত নীলাকাশ ; সূর্যাকরোজ্জ্বল মেঘখণ্ড লঘুগতিতে ভাসিয়া যাইতেছে ! পূর্ণ সুন্দর বিশ্ব ! শুধু মানুষই কি এই সৃষ্টির মধ্যে অকরুণ, অপূর্ণ, অসুন্দর ?

সুষমার অন্তর বেদনায় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিতেছিল। কমলা তাহার কাছে বসিয়া তাহাকে বুকের কাছে টানিয়া লইল। তারপর ধীরে ধীরে কহিল, “একটা কথা বলিব, যদি দুঃখ না পাও !—”

সুষমা কমলার মুখের দিকে চাহিল, এবার তাহার চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। সহানুভূতির কোমল স্পর্শ অন্তরের রুদ্ধ অশ্রু-উৎসকে ভাগীরথীর পুণ্যধারার মত পথ দেখাইয়া বাহিরে

লইয়া আইসে। কমলা কহিল, "প্রথম যে দিন দেখিয়াছি, সেই দিন হইতেই তোমাকে ভালবাসিয়াছি; বোন্ নাই, কাজেই জানি না, মায়ের পেটের বোন্‌কে মানুষ কতটুকু ভালবাসিতে পারে; থাকিলে তোমাকে যতটুকু ভালবাসিয়াছি, এর চেয়ে বেশী ভালবাসিতাম মনে করি না।—" এই পর্য্যন্ত বলিয়াই কমলা একটু কুণ্ঠিত দৃষ্টিতে সুষমার মুখের দিকে চাহিল। বুকের মধ্যে যে রুদ্ধ স্নেহধারা এতদিন পুঞ্জীভূত হইতেছিল, আজি তাহার প্রবাহকে হঠাৎ সুষমার অভিমুখে প্রেরণ করিয়া দিয়া, কমলা কেমন একটু কুণ্ঠিত লজ্জার আনন্দে অভিভূত হইয়া পড়িল।

সুষমা কি ভাবে তাহার স্নেহাভিব্যক্তিকে গ্রহণ করিল, বরণ করিল, একবার অপাঙ্গদৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া সে অনুভব করিতে চাহিল। সুষমার অশ্রুপূর্ণ, শান্ত দৃষ্টিটুকু তাহাকে বলিয়া দিল যে, সে যাহাকে স্নেহদান করিয়াছে, সে সেই স্নেহকে গ্রহণ করিতে জানে। এই গ্রহণের মধ্যেও তাহার মূক নারী-হৃদয়ের বিপুল সৌন্দর্য্য ও মহিমা পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। তখন কমলা সুষমাকে প্রাণপণে বক্ষের কাছে আঁকড়াইয়া ধরিয়া এক নিঃশ্বাসে বলিয়া ফেলিল,—"সুষমা,—এখানেই তোমাকে থাকিতে হইবে, তুমি তোমার বোন্‌কে ছাড়িয়া কোথাও যাইতে পাইবে না!—বল, থাকিবে?"

সুষমা ধীরে ধীরে কমলার স্কন্ধে তাহার অশ্রুসিক্ত মুখ রক্ষা করিল; কহিল, "যাহার দাঁড়াইবার স্থান নাই, সে এ স্নেহ ছাড়িয়া কোথায় যাইবে, কমলা দি?" "মনে থাকে যেন, তুই ছোট বোন্ আমার—গুরুজন আমি,—কথার অবাধ্য হইলে, বুঝিতেই ত পারিস্!"—কমলা হাসিল;—সুষমার মুখেও জলসিক্ত পল্লবের উপর চকিত সূর্য্যকিরণ-সম্পাতের মত হাসি ফুটিয়া উঠিল!

৪

একদিন সন্ধ্যার পর বাসায় ফিরিয়া আসিয়া নিখিল তাহার পড়িবার ঘরে চুপ করিয়া বসিয়াছিল। টেবিলের উপর আলোকটা অনুজ্জ্বল ভাবে জ্বলিতেছিল। হাতে তেমন কোনও কাজ ছিল না। একটা মাসিক খোলা পড়িয়াছিল। ভারতীয় চিত্রকলাপদ্ধতির প্রকৃষ্ট নিদর্শনস্বরূপ একখানি চিত্র মাসিকের সেই পৃষ্ঠাটি অলঙ্কৃত করিয়া শোভা পাইতেছিল। নিখিল অন্যমনস্কভাবে সেই চিত্রখানির দিকে মধ্যে মধ্যে চাহিতেছিল। এমন সময়ে কমলা কক্ষে প্রবেশ করিয়া কহিল, "ওগো, এ সুষমার সঙ্গে ত আমি আর পারিয়া উঠি না!" নিখিল সুষমার বিরুদ্ধে নালিশ শুনিতে শুনিতে অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছিল, একটু হাসিয়া কহিল, "আজ আবার কি করিয়াছে তোমার সুষমা?" "সে সকাল বেলা ত পাক করিয়াছেই, এ বেলাও আয়োজন করিয়া লইয়াছে!"

"কেন, তুমি ছিলে কোথায়?"—নিখিল ক্রমাগতই হাসিতেছিল। কমলা রাগিয়া গেল, কহিল,—"তুমি যদি দেখতে একবার, সে দশভুজার মত দশ হাতে কাজ করে যেন!" "তা' তুমি অন্ততঃ দ্বিভুজার মত তাহাকে সাহায্য কর।" "হাঁ, সাহায্য করিব!—সে সাহায্য নেওয়ার মেয়েই কি না! বলে, 'ভারি ত কাজ!' আমি কাছে গেলে রাগিয়া উঠে!" "মারে না ত?" "তাও পারিলে ছাড়ে না;—এই দেখ না আমার খোঁপাটা খুলিয়া দিয়াছে;—গালটা টিপিয়া দিয়াছে"—বলিয়াই কমলা অপাঙ্গদৃষ্টিতে স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া একটু হাসিল।

মিথ্যা কথা!—সুষমা গাল টিপিয়া দেয় নাই, তবে গালের একটা স্থান একটু রঞ্জিত দেখাইতেছিল; শোণিতের একটা মৃদু উচ্ছ্বাস সেখানে আসিয়া একটু থামিয়াছে! কেন, তাহা

কেমন করিয়া ভাঙ্গিবে! নিখিল মুখ টিপিয়া টিপিয়া হাসিতেছিল, কহিল, "ভারি ত অন্যায়!" নিখিলের হাসি দেখিয়া কমলা ভ্রূভঙ্গি করিয়া কহিল, "তা এর একটা বিহিত শাস্তি দিবে না?" "কি শাস্তি?" "উহার একটা গতি কর, তাহা হইলে আর আমার সঙ্গে লাগিতে আসিতে পারিবে না!"—কথাটা বলিতে বলিতে কমলার চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিল। সে অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া লইয়া একটা চাপা দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিল।

নিখিল একটু বিমর্ষভাবে কহিল, "তা' গতি করিতে পারি কই, কমল? চেষ্টার ত্রুটি ত করিতেছি না; সমাজের ভয়ে কেহই ত স্বীকার হয় না।" "টাকা বেশী করিয়া দাও।" "তাহাতে অপাত্র দুই একটা মিলিতেও বা পারে,—সুপাত্র ত এখন পর্য্যন্ত জুটাইতে পারিলাম না!" "এ পোড়া দেশের কপালে আগুন! এমন ভগবতীর মত মেয়ের বর জুটে না!" "বর জুটিতেও পারে, কিন্তু ভগবতীর উপযুক্ত শঙ্কর জুটে না ত!"

কমলা কথা না কহিয়া টেবিলের উপরের অনুজ্জ্বল আলোকটার দিকে চাহিয়া রহিল। নিখিল মাসিকটা টানিয়া লইয়া তাহার পাতা উল্‌টাইতে লাগিল। কমলার মনের মধ্যে একটা কল্পনা জাগিয়া উঠিতেছিল। সে কল্পনাটা যেমনই দুষ্কর তেমনই অদ্ভুত, বিশ্বাসের অযোগ্য! কমল স্বামীর মুখের দিকে একবার চাহিল; তাহার দৃষ্টির মধ্যে অনন্ত প্রেম উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতেছিল,—সে প্রেম মহীয়সী নারীর প্রেম;—তাহা স্বার্থের সংঘাতে ক্ষুব্ধ নহে; ত্যাগের মহিমায় প্রোজ্জ্বল! কমলা দুই হাত বক্ষে চাপিয়া ধরিয়া হঠাৎ সেখান হইতে উঠিয়া গেল!

৫

পাকগৃহে, যেখানে বসিয়া সুষমা নিপুণ হস্তে আলুর খোসা ছাড়াইয়া থালার উপর রাখিতেছিল, কমলা চঞ্চল পদে সেইখানে

গিয়া দাঁড়াইল। সুষমা একবার চক্ষু তুলিয়া কমলার মুখের দিকে চাহিয়া একটু হাসিল। কমলা কহিল, "সুষি, লুচির ময়দাটা দে', আমি মাখিয়া রাখি।" সুষমা বিস্মিতভাবে কমলার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল,—"এত আগে মাখিলে যে নষ্ট. হইয়া যাইবে।" "তবে সর্, আমি আলুর খোসা ছাড়াইয়া দিতেছি।—" "আসিলে বুঝি আবার আমার সঙ্গে লাগিতে? আমাকে তুমি কি নিশ্চিন্ত থাকিতে দিবে না, কমলা দি?" "তুই এত পরিশ্রম করিয়া মারা পড়িবি নাকি লো?" সুষমা উচ্চহাস্য করিয়া উঠিল, কহিল,— "দিদি, তুমি বল কিন্তু বেশ! কাজ করিলে নাকি মেয়ে মানুষ মরে!" "তবে আমায় কাজ করিতে দিস্ না কেনরে, রাক্ষসী?" সুষমা কথাটার জবাব সহসা খুঁজিয়া পাইল না—একটু ঘুরাইয়া উত্তর দিল—"তা দিদি, কাজ করিয়াই আমি যেন কেমন একটা আনন্দ পাই,—একটু নিশ্চিন্ত থাকিতে পারি।"

কথা কয়টা এমন বিষাদপূর্ণস্বরে সুষমার মুখ হইতে বাহির হইল, যে কমলা চমকিয়া উঠিল; সুষমা যে কোনও মতেই নিজের অবস্থা ভুলিতে পারিতেছে না, সে তাহা বুঝিল;—বুঝিয়া কেমন একটা বেদনা অন্তরে অন্তরে অনুভব করিতে লাগিল। কমলা অশ্রুপূর্ণ চক্ষে চাহিয়া চাহিয়া দেখিতেছিল, এক নারী তাহার মলিন পাকগৃহ আলোকিত করিয়া বসিয়া রহিয়াছে,—রূপে সে ইন্দ্রাণী তুল্য, গুণে সে অন্নপূর্ণা সমান! এই নারী অচলা লক্ষ্মীর মত, যাহার গৃহে অধিষ্ঠিতা হইবে, তাহার অন্তর ও অন্তঃপুর এক অপূর্ব্ব গরিমায় প্রোজ্জ্বল হইয়া উঠিবে! হায়, এমন কি কোনও উপায়ই নাই, যাহা দ্বারা সে এই নারীকে চিরদিনের জন্য তাহার সঙ্গিনীবিহীন জীবনের কাছে চিরসঙ্গিনীরূপে প্রাপ্ত হইতে পারে, বাঁধিয়া রাখিতে পারে!

একটা বিপুল দীর্ঘনিঃশ্বাস তাহার বুকের মধ্যে গুমরিয়া উঠিতেছিল, সে সেই নিঃশ্বাসটাকে—সুষমা না জানিতে পারে,

এমন ভাবে—ধীরে ধীরে বাহির করিয়া দিল! বুকটা এতক্ষণ যেন সেই নিঃশ্বাসটাতেই পরিপূর্ণ ছিল, এখন বড় খালি বোধ হইতে লাগিল! সে সুষমার দিকে আবার চাহিল, সহসা বলিয়া উঠিল,—"বেশ, তুইই কাজ কর্। আশীর্ব্বাদ করি, কাজ করিবার পূর্ণ স্বাধীন অধিকারও যেন তুই লাভ করিস্!"—কমলা বিস্মিতা সুষমার মাথাটা একবার বুকের কাছে টানিয়া আনিল, তাহার সুগৌর মুখখানি তুলিয়া ধরিয়া, সেই মুখের দিকে স্নেহানত দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল! সুষমা পলকশূন্য দৃষ্টিতে দিদির মুখের দিকে চাহিয়াছিল;—এত আদর, এত যত্ন, এত স্নেহ সে ত কোনও দিন স্বপ্নেও কল্পনা করিতে পারে নাই! কমলা হাসিয়া কহিল,—"তোর লজ্জা করে না, যে তুই অমন করিয়া আমার চোখের দিকে চাহিয়া থাকিস্?"—সুষমা হাসিয়া উঠিল, কিন্তু সত্যই তাহার একটু লজ্জা করিতেছিল! "দিদি, তুই আমাকে এমন করে খাইতেছিস্ কেন?—এত আদর এ অভাগিনীর সহ্য হবে না ত!"

কমলা তাহার দুই চক্ষু সুষমার মুখের উপর নিবিষ্ট করিয়া ধীরে ধীরে কহিল, "ভাগ্যবতি, এত রূপ, এত গুণ, ঠাকুর তোকে দাসীপণার মধ্যে ব্যর্থ করিবার জন্য দেন নাই!—তোকে আমি সুখী দেখিবই,—কিন্তু তখন তোর দিদিকে ভুলিস্ না যেন!"—কমলা সুষমাকে ছাড়িয়া দিল, আর কোন কথা না কহিয়া ধীরে ধীরে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

কমলার কথাগুলি আজ সুষমার কাছে আগাগোড়াই প্রহেলিকার মত মনে হইতেছিল। সে মূঢ়ের মত দুয়ারের দিকে চাহিয়া যতক্ষণ কমলাকে দেখা যায় দেখিল। সে চলিয়া গেলে পরও অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত শূন্য দৃষ্টিতে সেই দিকেই চাহিয়া রহিল।

৬

কমলা তাহার সঙ্কল্প স্থির করিয়া লইয়াছিল। স্বামীর কাছে সেই সঙ্কল্প ব্যক্ত করিবার যখন সুবিধা পাইল না, তখন সে অভিমান করিল, কথা বন্ধ করিল, কিছুদিন পরে একেবারে শয্যা লইল।

কমলা প্রথম নিখিলকে বলিল, যখন চেষ্টা করিয়াও সুষমার বর জুটান গেল না, তখন তাহাকে সংসারের একজন করিয়া লইতেই হইবে। নিখিল একেবারে নিরুপায় হইয়া পড়িয়াছিল! চিরদিন এই অনূঢ়া নারীকে সংসারের মধ্যে রাখা তাহার পক্ষে কেমন করিয়া সম্ভবপর হইবে, তাহা সে বুঝিতে পারিতেছিল না; কিন্তু স্বীকার করা ছাড়াও ত আর উপায় ছিল না!

নিখিল বাহিরের হীন লোকনিন্দাকে গ্রাহ্য না করিলেও, তাহারা স্বামীস্ত্রীতে যে সংসার রচনা করিয়া তুলিয়াছে, সেই সংসারের মধ্যে আর একজন আসিয়া পড়িয়া, তাহার অশ্রান্ত সেবা, আদর ও যত্ন দ্বারা তাহাদিগকে সুখী করিতে চাহিবে, অথচ সে তাহাদের কেহই নহে; তাহার কাছে কোনও সম্পর্কে কিছুই প্রাপ্য না থাকিলেও, সে তাহাদিগকে সব দিতে পারে; তাহাদের আরামের জন্য, সুখের জন্য, সেবার জন্য, সব করিতে পারে; প্রতিদিন এক আশ্রয় ভিন্ন তাহাকে দেওয়ার মত বুঝি আর কিছুই নাই; এমন একটি প্রাণীকে লইয়া দিনের পর দিন, বৎসরের পর বৎসর, কেমন করিয়া কাটান যাইবে, ইহাই নিখিলের কাছে একটা প্রকাণ্ড সমস্যার মত মনে হইতেছিল!

কমলা তার সঙ্কল্পকে সিদ্ধির পথে আনিবার জন্য একটু একটু করিয়া অগ্রসর হইতেছিল। একদিন সে হঠাৎ নিখিলকে বলিল, —"দেখ, সে কি বাস্তবিকই শরীর কালী করিয়া তোমার সংসারে

দাসীপণা করিতে আসিয়াছে ?” নিখিল এই আকস্মিক আক্রমণের জন্য প্রস্তুত ছিল না ; সে বিস্মিতের মত কমলার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।—একটু সামলাইয়া লইয়া বলিল,—“তা সে অপরাধ কি আমার, না, তোমার ? তুমি দেও কেন তাহাকে দাসীপণা করিতে ?”

কমলা রাগিয়া গেল ; ক্ষুদ্র রক্তাধর প্রসারিত করিয়া দিয়া কহিল,—“অপরাধ ত আমারই সব ! তোমার ত কিছুই নয় ! মেয়েমানুষ কি দাসীপণা করিতে ভয় পায়, যদি তোমরা তাহাকে দাসীপণা করিবার অধিকার দাও ?”

“দাসীপণা করিবার অধিকার ! তার অর্থ ?”—নিখিলের জিজ্ঞাসা করিবার সুর শুনিয়া মনে হইতেছিল, অর্থটা যে কি তাহা বুঝিবার জন্য সে চেষ্টা করিতেছে।

কমলা যখন বুঝিল যে, সে আসল কথাটার বড় কাছাকাছি আসিয়া পড়িয়াছে, তখন সে মন্ত্রপূত না করিয়াই সৈনিকের অস্ত্রক্ষেপের মত, তাহার শেষ কথাটা সোজাসুজি বলিয়া ফেলিতে চাহিল, কিন্তু কথাটা তবু একটু মুখে বাধিয়া গেল। তখন সে দ্রুত, চঞ্চল কণ্ঠে কহিল,—“এই আমাকে যেমন তোমার সংসারের মধ্যে দাসীপণা করিবার অধিকার দিয়াছ।” কথাটা বলিয়াই সে স্বামীর মুখের দিকে চাহিল।

হঠাৎ তীব্র আঘাত পাইলে মানুষ যেমন চমকিয়া উঠে, নিখিল তেমনি চমকিয়া উঠিল ! তাহার মুখের উপর দিয়া শোণিতের একটা দ্রুত উচ্ছ্বাস ক্রীড়া করিয়া গেল ; পরক্ষণেই মুখ কাগজের মত সাদা হইয়া গেল ! সে বেদনাকাতর দৃষ্টিতে কমলার মুখের দিকে একবার চাহিয়া দেখিল। সে মুখে স্থির সঙ্কল্পের চিহ্ন ছাড়া আর কিছুই দেখিল না !

সে বিকৃত কাতরকণ্ঠে ডাকিল,—“কমলা !” কমলা সে কণ্ঠস্বর শুনিয়া ভীত হইয়া উঠিল ; কিন্তু টলিল না ! সে

আজিকার সংগ্রামে যে প্রকারেই হউক জয়লাভ করিবেই। কমলা দৃঢ়স্বরে কহিল,—"কেন ?"—

নিখিল তাহার স্বরের দৃঢ়তা লক্ষ্য করিয়া একটু চঞ্চল হইয়া উঠিল; বুঝিল, কমলা আজি বিদ্রোহের জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত হইয়াই আসিয়াছে! "উপহাস করিয়াছ তুমি আমাকে, কমল, আমি ইহাই মনে করিব!"

কমলা একটু হাসিয়া কহিল,—"না, ঐটাই তোমার মস্ত একটা ভুল! আমি ঠাট্টা করি নাই তোমাকে। অনেক দিন বলিব মনে করিয়াছি, সাহস পাই নাই, কিন্তু আজ বলিব।"

"কমলা! কমলা!—চুপ কর্, থাম্!"

—"শোন, স্বামী, পুরুষ সহজে স্বার্থত্যাগ করিতে পারে বলিয়া বড় বড়াই করে! একটা অসহায় মেয়ে, রূপে গুণে যে লক্ষ্মীর মত, গৃহকার্য্যে সাক্ষাৎ অন্নপূর্ণার মত,—সে দৈববশে তোমার সংসারে আশ্রয় নিতে বাধ্য হইয়াছে; সমাজ তোমার এমনি, যে দুই বৎসরের চেষ্টায় সেই হতভাগিনীর একটা উপায় করা গেল না! তুমি আশ্রয় দিয়াছ, উদারতার কাজ করিয়াছ, কিন্তু যে আশ্রয় নিয়াছে, সে কোন্ অধিকারে তোমার সংসারের দুই মুঠা অন্ন ধ্বংস করিবে? তাহার এই আজীবন দাসীত্ব যদি না ঘুচানই যায়, তাহা হইলে তাহাকে দূর করিয়া দাও, সেও দয়ার কার্য্য হইবে; নতুবা এই অন্নপূর্ণারূপিণীকে আমি চক্ষের উপর দাসীপণা করিতে দেখিতে পারিব না!"—কমলার চক্ষে জল আসিতেছিল, রাগে তাহার খোপা খুলিয়া গিয়াছিল, অবগুণ্ঠনটা সরিয়া গিয়াছিল।

নিখিল অন্যমনস্ক ভাবে কহিল,—"তবে দূর করিয়াই দাও।" —কথাটা বলিয়াই সে বড় সঙ্কুচিত হইয়া পড়িল। এমন একটা কথা ত সে কখনই বলিতে চাহে নাই!

কমলা স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া তীব্রকণ্ঠে কহিল,—"সেই সঙ্গে আর একজনকেও দূর করিতে হইবে, জানিয়া

রাখ!”—মাথার কাপড়টা টানিয়া দিয়া কমলা কক্ষ হইতে দ্রুতবেগে বাহির হইয়া গেল! নিখিল হতবুদ্ধির মত বসিয়া রহিল! যে অদ্ভুত পরীক্ষার মধ্যে কমলা তাহাকে টানিয়া লইয়া যাইতে চাহিতেছে, তাহার কথা মনে করিয়াও সে আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিতেছিল!

৭

কমলা শয্যা লইয়াছিল। তাহার মনে মনে একটা গর্ব্ব ছিল যে, সে সুষমাকে গ্রহণ করিবার জন্য স্বামীকে স্বীকার করাইতে পারিবেই। তাহার সে গর্ব্বে বড় আঘাত লাগিয়াছিল! স্বামী কি তাহাকে এমনি দুর্ব্বলচিত্ত মনে করেন যে, সে সপত্নীকে সহ্য করিতে পারিবে না! তাহার অবিকল প্রেমরাশির প্রতি কি তাহার এতটুকুও আস্থা নাই! ছিঃ! ছিঃ!

এই সঙ্গিনীটিকে একান্ত ভাবে আপন করিয়া লইবার জন্য একটা তীব্র আকাঙ্ক্ষা তাহার অন্তরের মধ্যে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতেছিল। জীবনের সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়তম যিনি, তাঁহার জন্যই যদি এই প্রভাত-পঙ্কজিনী-তুল্য অপূর্ব্ব রূপরাশি, এই প্রাণপণ সেবা, আদর, যত্নকে আহরণ করিতে না পারিল, তাহা হইলে তাহার নারীজীবনের একটা তীব্র সুখপূর্ণ সাধ অসার্থক, অসম্পূর্ণ রহিয়া যায় যে! দানবকরবিচ্যুত অপূর্ব্ব মন্দারমালিকা সে পথের ধূলায় কুড়াইয়া পাইয়াছে; তাহা দ্বারা সে তাহার জীবনদেবতাকে অর্চ্চনা করিতে চাহিয়া কি অপরাধ করিয়াছে?

সুষমা দিদির শিয়রে বসিয়া অযত্নবিন্যস্ত কুন্তলরাশির মধ্যে অঙ্গুলিসঞ্চালন করিতে করিতে মৃদুকণ্ঠে ডাকিল,—“দিদি।”—

কমলা চক্ষু বুজিয়াছিল; উত্তর দিল না! সুষমা আবার ডাকিল,—“দিদি, ওঠ, আজ একটু মাথায় জল দাও, দেখ ত শরীরটা কেমন হইয়াছে!”—

কমলা সজোরে তাহার হাত ঠেলিয়া সরাইয়া দিল, কহিল, 'যা', যা', তুই আমাকে জ্বালাতন করিতে আসিস্ না।"

"দিদি, তোমার পায় ধরিয়াছি, একবারটি ওঠ, দিদি!"—

"দেখ্, সুষি, তুই যদি আমাকে এমন করিয়া বিরক্ত করিস্, যে দিকে দুই চক্ষু যায়, আমি চলিয়া যাইব;—কেন, কে আমি তোর, যে আমার জন্য তুই এমন করিয়া মরিতেছিস্? থাক্ সংসার পড়িয়া, তুই দু'মুঠা খাবি বলিয়াই কি এমন করিয়া খাটিয়া হাড় কালী করিবি!—আমি আর এত জ্বালা সহ্য করিতে পারি না!"

কমলার অন্তরে স্বামীর বিরুদ্ধে একটা দারুণ অভিমান জাগিয়া উঠিয়াছিল! কই, স্বামী ত তাহাকে একটিবার জিজ্ঞাসাও করিতে আইসেন নাই;—সে যে কয়দিন পর্য্যন্ত অনাহারে পড়িয়া রহিয়াছে, তিনি ত একটিবার একটু প্রবোধ দিবার জন্য কাছে আসিলেন না।

সুষমা কোনও কথাই বলিল না; কমলার দুই পা জোর করিয়া ধরিয়া বসিয়া রহিল। কমলা পা টানিয়া লইবার নিষ্ফল চেষ্টা করিয়া কহিল,—"পা ছাড়্ তুই আমার, রাক্ষসী! তুই যে আমাকে জ্বালাইবার জন্যই আসিয়াছিস্ তা' আমি তোকে প্রথম দিন দেখিয়াই বুঝিয়াছি!"—সুষমা পা ছাড়িল না, ধীরে ধীরে কহিল,—"দিদি, তোমার পায়ের উপর মাথা খুঁড়িয়া মরিব আমি, যদি তুমি না ওঠ!—"

কমলাকে উঠিতেই হইল; সুষমার কাছে সে বেশী ক্ষণ কঠিন হইয়া থাকিতে পারিত না; সুষমাকে একটু ঠেলিয়া দিয়া কহিল, "চল্, কোন্ চুলোয় যাবি!" সুষমা মনে মনে ভাবিল, "এমন কি ভাগ্য করিয়াছি যে তোমার সঙ্গে এক চুলোয় যাইতে পারিব!"—একটু হাসিয়া প্রকাশ্যে কহিল, "চুলোটা আমার জন্যই থাক্, দিদি। ওটা তোমার মত ভাগ্যবতীর জন্য নয়।"

কমলা হঠাৎ ফিরিয়া দাঁড়াইয়া সুষমার মুখের দিকে চাহিল,

তারপর দৃঢ়স্বরে কহিল,—"সুষি, বল্ তুই আমাকে, এ ঘর ত্যাগ করিয়া তুই যাবি না, যদি এখানে থাকিবার অধিকার পাস্!"—কমলা সুষমার উপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়া তাহাকে জড়াইয়া ধরিল, তাহার মুখটা মুখের কাছে টানিয়া আনিয়া কহিল, "বল্ তুই আমাকে, না বলিলে আজ আর তোকে ছাড়িব না!—বল্,—বল্!"—

কমলা দস্যুর মত পড়িয়া যাহার কাছ হইতে উত্তরটাকে লুণ্ঠন করিয়া লইতে চাহিতেছেন, সে সঙ্কোচে লজ্জায় এতটুকু হইয়া গেল। এই দৃঢ় আলিঙ্গন হইতে নিজেকে মুক্ত করিয়া লইবার কোনও সম্ভাবনা নাই দেখিয়া সে চক্ষু বুজিয়া দিদির বুকের কাছে মুখ লুকাইল। তাহার দিদির হৃদয়ের প্রত্যেক স্পন্দনটি তাহার কাণের কাছে এক বিপুল সাম্রাজ্যের সংবাদ বহন করিয়া আসিতেছিল, সে সাম্রাজ্য স্নেহের গৌরবে, প্রেমের মহিমায় উজ্জ্বল;—যত্নে, আদরে, প্রীতিতে চিরমহিমান্বিত! কমলা আবার কহিল,—"বল্!" তখন সুষমা ধীরে ধীরে বাষ্পজড়িত কণ্ঠে কহিল, "দিদি, তোমার পায়ের ধূলা হইয়া থাকিতে পারি,—তোমার পায়ের কাঁটা হইব কেন, দিদি!" কমলা তাহাকে আরও দৃঢ়ভাবে বুকের কাছে চাপিয়া ধরিয়া কহিল, "তোকে আমি মাথার মণি করিয়া রাখিব, সুষমা!"

৮

নিখিল কমলার শয্যার কাছে দাঁড়াইয়া একটু তীব্রস্বরে কহিল, "দেখ, তুমি বড় বাড়াবাড়ি আরম্ভ করিলে!—"

"কমলা অন্য দিকে চাহিয়া ধীরে ধীরে কহিল,—"তাহাতে কাহার কি ক্ষতি আমি ত বুঝিতেছি না।"

"কাহারও ক্ষতি আছে কি না, সে কথা, যাহার ক্ষতি হয়, সেই বুঝিবে। কিন্তু তুমি কি চাও আমার কাছে? আমি একটা

মানুষ ত বটি!" কমলা একটু হাসিল। নিখিল কহিল,—"হাসিলে যে?"

"তোমার কথা শুনিয়া।" "কেন?"

"সমাজের ভয়ে একটা অসহায় নিষ্পাপ নারীকে যাহারা পথের মাঝে দাঁড় করাইয়া দিতে পারে, তাহারাও মানুষ বলিয়া গর্ব্ব করে, হাসি তাহাতেই আইসে।"

"তাহাকে আশ্রয় দেওয়া যাইতে পারে, কিন্তু সে জন্য যে তাহাকে গৃহিণী করিয়া লইতে হইবে, এমন কথা কোন্ শাস্ত্রে লেখে জানি না।"

কমলা অত্যন্ত রাগিয়াছিল; সে কহিল, "দোষশূন্য জানিয়াও তাহার জীবনটাকে ব্যর্থ করিতে হইবে, এটাও বড় পৌরুষের কথা নহে।"

নিখিল শান্তভাবে কহিল, "দেখ কমলা, তোমার কল্পনা অদ্ভুত, ত্যাগ স্বীকারও অদ্ভুত, তাহা আমি বুঝি,—কিন্তু সে জন্য আমি তাহাকে বিবাহ করিতে পারি না। আমার যাহা আছে তাহা লইয়াই আমি সুখী সন্তুষ্ট! এই একটা সৃষ্টিছাড়া কথা তুলিয়া তুমিই তাহাকে অতিষ্ঠ করিয়া তুলিতেছ।"

কমলা কহিল, "না, আমি তাহাকে মোটেই অতিষ্ঠ করিয়া তুলিতেছি না; তাহাকে আমি প্রতিষ্ঠিত করিব ইহাই আমার প্রতিজ্ঞা!"

"না, সে প্রতিজ্ঞা তোমার থাকিবে না, কমল! কিন্তু একটা কথা, সতীনের ঘর করিতে তোমার এত সাধ হইয়াছে, কেন, শুনি?"

কমলা তীব্রস্বরে কহিল, "তুমি কি আমাকে সাধারণ স্ত্রীলোকের মত মনে করিয়াছ যে, সতীনকে পর মনে করিব?"

"না, তাহা মনে করি নাই।" "তবে?" "ধর তোমাকে উপেক্ষা করিয়া আমিই যদি কখনও সেইদিকে ঝুঁকিয়া পড়ি?"

"তুমি যদি তাহাতেই সুখী হও, আমি কেন অসুখী হইব ?"

"কিন্তু তোমার প্রতিজ্ঞা রক্ষার কোনও উপায়ই ত আমি দেখিতে পাইতেছি না, কমল !"

কমলা উপেক্ষার হাসি হাসিল ; অধর উল্‌টাইয়া কহিল, "সে আমি বুঝিব !" তারপর একটা ক্ষুদ্র দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া পাশ ফিরিয়া শুইল। নিখিল আর কোনও কথা খুঁজিয়া না পাইয়া অন্যমনস্ক ভাবে একদিকে চাহিয়া রহিল।

দ্রুত চঞ্চল পদে দুয়ারের কাছ পর্য্যন্ত আসিয়াই সুষমা দেখিল, কক্ষমধ্যে নিখিল রহিয়াছে। উভয়ের চক্ষু মিলিত হইতে হইতেই সুষমা চক্ষু মুদ্রিত করিল, এবং মুহূর্ত্তের মধ্যে সেখান হইতে সরিয়া গেল। নিজের কক্ষের মধ্যে প্রবেশ করিয়াই সে দুয়ার বন্ধ করিয়া দিয়া একখানি ক্ষুদ্র শুভ্র শয্যার উপর উবুড় হইয়া পড়িল, এবং অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত বালিশের মধ্যে মুখ গুঁজিয়া রহিল। সংসারের মধ্যে তাহার কথা লইয়াই যে এতটা কাণ্ড ঘটিয়া যাইতেছে, ইহা মনে করিয়া তাহার মাটীর সঙ্গে মিশাইয়া যাইতে ইচ্ছা করিতেছিল। ছিঃ! ছিঃ! দিদির এই বাড়াবাড়ি দেখিয়া তিনিই বা কি মনে করিতেছেন! আজ তাঁহার চোখে চোখ পড়িয়াছে, তিনি যদি কিছু মনে করিয়া থাকেন,—ছিঃ !—লজ্জায় সুষমা মাথা তুলিতে পারিতেছিল না! দুয়ার খুলিয়া সে আবার কেমন করিয়া ঘর হইতে বাহির হইবে! দিদি তাহাকে ইচ্ছা করিয়া এমন একটা বিপদের মধ্যে কেন ফেলিল? এ ব্যাপারটা যেন তাহার নারীত্বের প্রতি একটা বিষম বিদ্রূপের মত বাজিতেছিল। যে অপূর্ব্ব স্নেহাশ্রয় কমলা তাহাকে দিয়াছে, তাহার মত অভাগিনীর পক্ষে তাহাই কি যথেষ্ট নহে? যে একদিন পথের ধূলায় লুটাইতেছিল, তাহাকে আশ্রয় দিয়াছে, যত্নে ও আদরে তাহার সকল দুঃখ ঘুচাইয়াছে তাহাই যথেষ্ট নহে কি? সে কি এমনই অকৃতজ্ঞ, যে শুধু পাওয়াই আশা করিবে, শুধু চাহিবেই!

তোমার দেওয়ার মত অজস্র শক্তি আছে বলিয়াই কি, হে নিষ্ঠুর, যাহাকে দিতেছ, তাহার নেওয়ার মত শক্তি আছে কি না, তাহা দেখিবে না, বিচার করিবে না? হে নিষ্ঠুর! হে নিষ্ঠুর! তুমি ভালবাস রাণীর মত, কিন্তু বিচার কর সম্রাজ্ঞীর মত!

৯

কমলাকে কোনও মতেই শান্ত করিতে না পারিয়া নিখিল নিতান্তই বিব্রত হইয়া পড়িল। কমলা সময়ে আহার করে না, অনাহারে অদ্ধাহারে দিন কাটায়, বেশভূষা ছাড়িয়াছে, সংসারের কাজকর্ম্মও একেবারেই ত্যাগ করিয়াছে তাহার চুলগুলি রুক্ষ; গণ্ডে শোণিতোচ্ছ্বাস আর তেমন করিয়া কথায় কথায় ছুটে না; চোখের কোণে কালী পড়িয়াছে; বান্ধুলীপুষ্পতুল্য অধরপুটে পাণ্ডুর আভা জাগিয়াছে। নিখিল দেখিয়া শুনিয়া প্রথম বুঝাইল, পরে অভিমান করিল, রাগ করিল, কথা বন্ধ করিল;—আবার হাসিয়া কথা কহিল, কাছে আসিয়া আদর করিল, ডাকিয়া ডাকিয়া অস্থির করিয়া তুলিতে চাহিল, চক্ষুতে চক্ষু মিলাইবার জন্য মুখ ধরিয়া টানাটানি করিল;—আবার রাগ করিল। কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। কমলার দারুণ অভিমান নিখিল দূর করিতে পারিল না। তখন নিখিল হাল ছাড়িয়া দিয়া বাহিরের ঘরে আশ্রয় লইল। কমলা তবু অটল রহিল।

যে নিখিল দুই দণ্ড কমলাকে ছাড়িয়া থাকিতে পারে না, সে দুই দিন বাহিরের ঘরে কাটাইল! কমলা ভিতরে ভিতরে ব্যথিত ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল। কিন্তু এ বেদনাকে সে ত বরণ করিয়াই লইয়াছে। সহস্র আঘাত পাইলেও এ সংগ্রামে তাহাকে প্রাণপণ করিয়াও জয়লাভ করিতেই হইবে, তাই সে মুখ গুঁজিয়া তাহার ছোট বিছানাখানির উপর পড়িয়া রহিল; সুষমা তাহাকে সাহস করিয়া ডাকিতেও পারিল না। মধ্যে মধ্যে ছুটিয়া আসিয়া

দিদির পায়ে মাথায় ধীরে ধীরে হাত বুলাইত; চক্ষের পাতা ভিজিয়া আসিলে, উঠিয়া বাহিরে যাইয়া কাঁদিয়া আসিত!

তৃতীয় দিন দুপুরে সুষমা আসিয়া কহিল, "দিদি, তুমি যদি না ওঠ, আমি বিষ খাইয়া মরিব! আমার আর যাওয়ার স্থান নাই বলিয়াই কি তোমরা আমার উপর এমন করিয়া অত্যাচার করিবে?"—সুষমা একসঙ্গে অনেকগুলি কথা বলিয়া একটু সন্তপ্তচিত্তা হইয়া পড়িল এবং দ্রুতপদে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল! এবার কমলা উঠিল; বাহিরে আসিয়া সুষমাকে পাইল না; ধীরে ধীরে তাহার ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখিল, সুষমা দুই হাতে একটা আল্‌নার কাঠ মুঠা করিয়া ধরিয়া দাঁড়াইয়া কাঁদিতেছে! কমলা কাছে আসিয়া সুষমার মাথাটা বুকের কাছে টানিয়া কহিল, "সুষি, ক্ষমা কর্ আমাকে,—আমি আর তোকে কষ্ট দেব না!"

সেই স্নেহস্পর্শ লাভ করিয়া সুষমার অন্তরের সমগ্র আবেগ-রাশি এককালে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল;—সে কমলার বক্ষের মধ্যে মুখ লুকাইয়া ফুঁপাইয়া ফুঁপাইয়া অনেকক্ষণ কাঁদিল; কমলা কথা কহিল না, বাধা দিল না; কথা কহিবার বা বাধা দিবার শক্তিও তাহার ছিল না! সে সুষমার অযত্নবিন্যস্ত ভ্রমর-কৃষ্ণকুন্তলরাজির মধ্যে অঙ্গুলি সঞ্চালন করিতে লাগিল। কমলার চক্ষু ভরিয়া অশ্রু আসিতেছিল, বুকের মধ্যে বড় কেমন করিতেছিল। সে দাঁতে ওষ্ঠ চাপিয়া আসন্ন ক্রন্দনটাকে ফিরাইয়া দিবার জন্য বৃথা চেষ্টা করিতে লাগিল।

১০

পরদিন প্রভাতে কমলা শয্যাত্যাগ করিয়াই সুষমার ঘরের কাছে আসিয়া দেখিল, দুয়ারটা খোলা পড়িয়া রহিয়াছে। একটা অজ্ঞাত আশঙ্কায় তাহার বুক কাঁপিয়া উঠিল, সে দুয়ারের কাছে দাঁড়াইয়া ডাকিল, "সুষমা!"—

অভুক্ত শয্যার উপর একখানি চিঠির কাগজ প্রভাতের মৃদু বাতাসে নড়িতেছিল, কমলা তাহা দেখিয়া কম্পিত হস্তে তুলিয়া লইল। হাতটা বড় কাঁপিতেছিল, ঠিক ভাবে কাগজখানা ধরিয়া পড়িবার শক্তি আর তাহার ছিল না; সে ফুকারিয়া কাঁদিয়া উঠিয়া কক্ষতলেই লুটাইয়া পড়িল। ভিতরের ঘরে কমলার কান্নার চাপা শব্দ নিখিলের কাণে গেল; সে অনেক পূর্ব্বেই উঠিয়াছিল; তাড়াতাড়ি ছুটিয়া আসিয়া ভূলুণ্ঠিতা কমলার কাছে দাঁড়াইল।

স্বামীকে দেখিয়া কমলা কাঁদিতে কাঁদিতে কহিল, "ওগো, কেন তুমি তাকে রাস্তার পাশ থেকে কুড়িয়ে এনেছিলে?" নিখিল প্রথমটা কিছু হতবুদ্ধি হইয়া পড়িয়াছিল; কমলার হাতের কাগজখানার উপরে হঠাৎ দৃষ্টি পড়িল। কাগজ টানিয়া লইয়া নিখিল পড়িল,—

"দিদি, তোমার আদর ও যত্ন আমার সহ্য করিবার শক্তি নাই, তাই চলিয়া গেলাম। আশীর্ব্বাদ করিও, যে দিন মরিতে দরকার হইবে, সে দিন যেন তোমার কোলের কাছে আসিয়া মরিতে পারি!—

ইতি তোমার ছোট বোনটি।"

পত্র পড়িয়া নিখিলের বুকের মধ্যে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতেছিল; নিখিল সেই বিদ্রোহী নিঃশ্বাসটাকে চাপিয়া ফিরাইয়া দিয়া কহিল,—"পত্র পড়িয়াছ তুমি?" কমলা পত্র পড়ে নাই; পত্র দেখিয়াই মনে করিয়াছিল, সুষমা মরিয়াছে,—কারণ, পূর্ব্বদিনের বিষ খাওয়ার কথাটা তাহার মনে পড়িয়াছিল। কমলা স্বামীর মুখের দিকে অর্থশূন্য দৃষ্টিতে একবার চাহিল। নিখিল কহিল,—"কোথায় তার যাওয়া সম্ভব মনে কর?"

কমলা বুঝিল, সুষমা মরে নাই, কোথাও চলিয়া গিয়াছে। তখন সে উঠিয়া বসিল, কহিল, "দেখি চিঠিখানা।" পড়িয়া চিঠি

ফেলিয়া দিয়া কমলা কহিল, "এক যমের বাড়ী ছাড়া তার যাওয়ার আর স্থান নাই ত!"

কমলার নয়নপ্রান্তে আবার দুই বিন্দু অশ্রু দেখা দিল, কপোল বাহিয়া সে অশ্রু নামিয়া আসিল; তারপর আবার তাহার অশ্রুর বাঁধ ভাঙ্গিয়া গেল। কমলা দুই হাতে স্বামীর পা জড়াইয়া ধরিল, দুই পায়ের মধ্যে মুখ লুকাইয়া কাঁদিয়া উঠিল, কহিল,—"সুষমাকে আনিয়া দাও; তাহাকে ছাড়িয়া আমি বাঁচিব না; সে যে কত বড় ব্যথা পাইয়া চলিয়াছে, তাহা আমি মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝিতেছি, তাহাকে আনিয়া দাও, ওগো, তাহাকে দাও!"

নিখিল কমলার হৃদয় পূর্ব্বেই চিনিয়াছিল, কিন্তু আজ যেন তাহার কাছে এই শোকবিধুরা স্নেহশালিনী নারীর অন্তর সৌন্দর্য্যসম্পূর্ণ এক অভিনব গরিমায় উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। নিখিল সে সৌন্দর্য্য দেখিয়া স্তম্ভিত হইল, বিস্মিত হইল! সে প্রেমজড়িত কণ্ঠে ডাকিল,—"কমলা!"—তারপর সেই কক্ষতলে নতজানু হইয়া কমলাকে বুকের কাছে তুলিয়া লইল!

১১

হেমাঙ্গিনীর একটু বেশী বেলা হইলে শয্যাত্যাগ করা অভ্যাস ছিল। দুয়ার খুলিয়াই সে দেখিল, বারান্দার কোণে কেহ বসিয়া রহিয়াছে। যে বসিয়াছিল, সে স্ত্রীলোক; তাহার মুখ দেখা যাইতেছিল না। হেমাঙ্গিনী বুঝিল, নূতন মানুষ কেহ। জিজ্ঞাসা করিল, "কে বসিয়া?"

সুষমা মুখ ফিরাইল; হেমাঙ্গিনীকে দেখিয়া ধীরে ধীরে কাছে আসিয়া প্রণাম করিল; হেমাঙ্গিনীর বিস্ময় সীমা অতিক্রম করিয়াছিল! সে ক্ষণকালের মধ্যে নিজেকে সামলাইয়া লইয়া দ্রুত কর্কশ কণ্ঠে কহিল, "তোমার সাহসকে ধন্যি। কোন্ মুখে এ বাড়ী ঢুকেছ?"

সুষমা একবার হেমাঙ্গিনীর মুখের দিকে চাহিল। সে দিনকার বালিকা বধূ আজ মুখরা গৃহকর্ত্রীরূপে তাহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে; সুষমা তাহার প্রথম সম্ভাষণ শুনিয়াই শিহরিয়া উঠিল! "কথা কচ্চ না যে! এখানে তোমার পোষাবে না কিন্তু বলে রাখ্‌ছি! লজ্জাও নেই!"

হেমাঙ্গিনীর উচ্চকণ্ঠ শুনিয়া কালীদয়াল বাবু বাহির বাড়ী হইতে ভিতরে আসিলেন। তিনিও সুষমাকে দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়াছিলেন! সুষমা কালীদয়াল বাবুকে দেখিয়াই কাছে যাইয়া প্রণাম করিল, এবং তিনি কোনও কথা বলিবার পূর্ব্বেই দৃঢ়স্বরে বলিল—"কাকাবাবু, মা মরে যাওয়ার পর একবার আপনিই আশ্রয় দিয়েছিলেন; আমি সেই আশ্রয় আবার চাইতে এসেছি; সংসারে কারু কাছ থেকে যদি আশ্রয় দাবী করে নেওয়ার থাকে, সে আপনার কাছেই আছে! ঝি ছাড়িয়ে দিন্, আমিই সেবা কর্‌ব আপনাদের!"

"সে হচ্ছে না, আমি বলে রাখ্‌ছি, আমি এমন কাউকে আমার সংসারের মধ্যে রাখ্‌তে পার্‌ব না, যার জন্যে আমার মাথা হেঁট হতে পারে।" হেমাঙ্গিনী কথাগুলি বলিয়াই দ্রুতপদে সেখান হইতে চলিয়া গেল!

দ্বিতীয় পক্ষের প্রখরা স্ত্রীর কাছে কালীদয়াল বাবু এতটুকু হইয়া গিয়াছিলেন, সাহস করিয়া কোনও কথা বলিতে পারেন, এমন শক্তি তাঁহার ছিল না। হেমাঙ্গিনী চলিয়া গেল দেখিয়া তাঁহার মনে হইল, সুষমাকে বিদায় করিবার ভারটা আপাততঃ তাঁহার উপরেই পড়িল। সুষমাকে বলিবার মত কোনও কথাই গুছাইয়া আনিতে না পারিয়া বলিলেন, "তা, দেখ, বুঝ্‌লে কিনা; কথাটা কি জান এই,"—

বাধা দিয়া সুষমা বলিল, "কথাটা যে কি তা' আমি বেশ ভাল করিয়াই জানি, কাকাবাবু,—কিন্তু তা' বলে আপনি

আমাকে দূর করে দিতে পাচ্ছেন কই ? একদিন আপনার সংসারের সমস্ত ভারই ত আমার উপরে ছেড়ে দিয়েছিলেন। আজ সেই জোরে আপনার সেই সংসারের পাশেই এতটুকু একটু স্থান করে নিতে চাইতেছি, এতে কারো ক্ষতি নেই ত !" সুষমা এমন দৃঢ় মিনতিপূর্ণ স্বরে কথাগুলি বলিয়া গেল, যে কালীদয়াল বাবু কোনও উত্তরই খুঁজিয়া পাইলেন না।

এমন সময়ে সেখানে আর একজন আসিল, সে হেমাঙ্গিনীর ভাই, বলাই। বলাই অতি সন্তর্পণে আসিয়াছিল ; সুষমা তাহাকে দেখিতে পায় নাই। বলাই দেখিল, নূতন মানুষ; তাহার পরিপূর্ণ যৌবনশ্রীবিমণ্ডিত দেহখানি পুষ্পিতা লতিকার মত সুন্দর। সে লুব্ধের মত লোলুপ দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া রহিল।

সুষমা বলিল, "কাকাবাবু, আমি."—হঠাৎ তাহার দৃষ্টি বলাইয়ের উপর পড়িল। বলাইর অসম্ভ্রমময় লুব্ধ দৃষ্টি তাহাকে সঙ্কুচিত করিয়া তুলিল। সে মাথার কাপড়টা টানিয়া দিয়া সেখান হইতে সরিয়া গেল। কালীদয়াল বাবু চাহিয়া দেখিলেন, বলাইয়ের দৃষ্টি সুষমার গমনপথের দিকেই নিবদ্ধ রহিয়াছে। তিনি রূঢ়স্বরে ডাকিলেন,—"বলাই !"—

বলাই ফিরিয়া কহিল, "বলুন।"—কালীদয়াল বাবু বিরক্তিপূর্ণ স্বরে কহিলেন, "কি চাও তুমি ?" বলাই স্থিরভাবে বলিল, "কিছু না।" তারপর শিষ দিতে দিতে চলিয়া গেল।

কালীদয়াল বাবুর ইচ্ছা হইতেছিল, তখনই বলাইকে দুই ঘা দিয়া সোজা করিয়া দেন, কিন্তু হেমাঙ্গিনীর রণরাঙ্গিণী মূর্ত্তি মনে পড়িয়া গেল !

"কি আপদেই পড়া গেছে,"—বলিয়া সেখান হইতে চিন্তিত-ভাবে বাহির বাড়ীর দিকে চলিয়া গেলেন।

হেমাঙ্গিনীর সহস্র তাড়না সহ্য করিয়াও সুষমা রহিয়া গেল।

কালীদয়াল বাবু সুষমাকে একটু স্নেহের চক্ষেই দেখিতেন ; বিগত দুর্ঘটনার পরেও তাহাকে আশ্রয় প্রদান করিবার ইচ্ছা তাঁহার একটু যে না ছিল, এমন নহে। কিন্তু হেমাঙ্গিনীর ভয়ে পারিয়া উঠেন নাই। সুষমা যে দোষ-সংস্পর্শশূন্যা, সে বিষয়ে তাঁহার নিজের বিন্দুমাত্র সন্দেহই ছিল না। এবার যখন সুষমা আশ্রয় ভিক্ষা করিয়া নিজেই আসিয়া দাঁড়াইল, তখন কালীদয়াল বাবু ভাল মন্দ কিছুই বলিলেন না। সুষমা রহিয়া গেল বলিয়া তিনি কোনও অসন্তোষও প্রকাশ করিলেন না। এ প্রকার ব্যবহারের আরও একটা গূঢ় কারণ ছিল। কালীদয়াল বাবু বলাইকে মোটেই সহ্য করিতে পারিতেন না। কিন্তু তাহাকে বিদায় করিয়া দিবার মত ক্ষমতাও তাঁহার ছিল না। হেমাঙ্গিনী জানিত, কালীদয়াল বাবু বলাইকে দেখিতে পারেন না ; শুধু সেই জন্যই সে তাহাকে প্রশ্রয় দিয়া সংসারের মধ্যে রাখিল। উদ্দেশ্য, অন্ততঃ বলাইকে উপলক্ষ করিয়াও সে নিজের গৃহিণীপণা যখন তখন প্রচার করিবার সুবিধা পাইবে, এবং স্বামী বেচারীকেও তটস্থ করিয়া রাখিতে পারিবে ; কারণ কুটুম্বের ছেলেকে, হাজার অপরাধ পাইলেও, একেবারে স্পষ্ট কথায় বিদায় করা চলে না ত !

তাই, এবার যখন সুষমা আসিল, তখন কালীদয়াল বাবু তাহাকে তাড়াইবার জন্য কোনও ব্যবস্থা না করিয়া একেবারে চুপ করিয়া গেলেন ! হেমাঙ্গিনী যে সুষমার উপস্থিতিটাকে কোনক্রমেই সহ্য করিয়া উঠিতে পারিবে না, কালীদয়াল বাবু তাহা জানিতেন। বলাইকে তিনি সহ্য করিতে পারেন না, তবু সে সংসারের মধ্যে আছে ; সুষমাকেও হেমাঙ্গিনী দেখিতে পারে না, সেও যদি অন্ততঃ কিছুদিনের জন্য থাকিয়া যায়, কালীদয়াল বাবু তাহাতে আপত্তি করিবার বেশী কিছু দেখিলেন না !

এক কথা সমাজ, তা' সমাজ যখন আপত্তি তুলিবে, তখন না

হয় দেখা যাইবে। সমাজকে যদি বুঝান না যায়ই, সুষমাকে বিদায় করিয়া দিলেই চলিবে। সুতরাং সেই মূহূর্ত্তেই তাহাকে বিদায় করিবার জন্য কোন তাড়া কালীদয়াল বাবুর পক্ষ হইতে দেখা গেল না।

সুষমা রহিয়া গেল; হেমাঙ্গিনী বুঝিল, স্বামীর মৌন সম্মতি লাভ করিয়াই সে থাকিতে সাহস করিল। তখন সে তাহাকে কেমন করিয়া তাড়াইবে, মনে মনে তাহারই কল্পনা আটিতে লাগিল। বলাই সময়ে অসময়ে শিষ দিতে লাগিল, এবং দিদির বাক্স হাতড়াইয়া টাকা নিয়া, এসেন্স কিনিল। কালীদয়াল বাবু শ্যালকের মুণ্ডপাত করিয়া বিষয়কর্ম্মে মন দিলেন।

১২

সুষমা চলিয়া গেল। সে যে কেন চলিয়া গেল, তাহা কমলা যেমন বুঝিয়াছিল, নিখিলও ঠিক্ তেমনি বুঝিয়াছিল। বুঝিয়া কাঁদিয়া আকুল হইল। নিখিল আরও কমলাকে বুকের কাছে আঁকড়িয়া ধরিয়া একটা শান্ত, সহজ নিঃশ্বাস ফেলিবার অবসর খুঁজিতে লাগিল।

কিন্তু যে চলিয়া গিয়াছে, সে যাইবার পূর্ব্বে যতটুকু নিকট ছিল, দূরে যাইয়া যেন তার অপেক্ষা আরও নিকট হইয়া পড়িতেছিল। সংসারের মধ্যে সে যে স্থানটুকু পরিপূর্ণ করিয়া রাখিয়াছিল, আজ তাহা শূন্য দেখিয়া উভয়েরই হৃদয় হাহাকার করিয়া উঠিল। যে দূরে চলিয়া যায়, সে যাইবার সময় কতটুকু লইয়া যায়, তাহা তাহার যাইবার সময় ঠিক্ উপলব্ধি করা যায় না। বিদায়কালে একটা তীব্র বিচ্ছেদাশঙ্কাই হৃদয় জুড়িয়া থাকে; তারপর যখন সে চলিয়া যায়, তখন দিনে দিনে, পলে পলে, প্রত্যেক খুঁটিনাটির মধ্যে, তাহাকে মনে পড়ে; তাহার বিরহ, তাহার স্মৃতি সমগ্র অন্তরদেশকে আচ্ছন্ন করিয়া ধূমায়িত হইতে থাকে।

সুষমা যখন কাছে ছিল, তখন তাহাকে সংসারের মধ্যে আপনার জন করিয়া লইবার জন্য একটা প্রবল আকাঙ্ক্ষা কমলার হৃদয়ে জাগিয়া উঠিয়াছিল। নিখিলের সহিত আঁটিয়া উঠিতে না পারিয়া, সে অভিমান করিয়াছিল, কাঁদিয়াছিল, দুঃখে শয্যা লইয়াছিল, তখন সুষমা কাছে ছিল। স্বামী স্ত্রীর এই মান অভিমানের মধ্যে সে মৌন মলিন মুখে সংসারের সমস্ত কার্য্য করিয়াছে। কতবার ঘুরিয়া ফিরিয়া সে দিদির শয্যার কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। অশ্রু যখন চক্ষু ছাপাইয়া উঠিয়াছে, তখন দ্রুতবেগে স্থানান্তরে চলিয়া গিয়াছে। একবার সে মুখ ফুটিয়া বলে নাই, কতখানি তাহার অন্তরের বেদনা; কেমন করিয়া তাহার হৃৎপিণ্ড মুস্‌ড়িয়া গিয়াছে! তাহার ব্যথিত, শোণিতলিপ্ত হৃদয়তটে, আঘাতের পর আঘাত লাগিয়া কেমন করিয়া তাহাকে ক্ষতবিক্ষত করিয়া তুলিয়াছে,—তাহা ত সে একদিন ইঙ্গিতেও বুঝাইতে চাহে নাই!

সে যে কর্ম্মের ব্যস্ততার মধ্যে তাহার হৃদয়ের তীব্র দহনকে, দারুণ বেদনাকে গোপন করিতে চাহিয়াছে;—কমলার নারীহৃদয় তাহা অনুভব করিয়াছে, বুঝিতে পারিয়াছে।

আজ কমলার মনে হইতেছিল, সে যদি মান অভিমানে দিন না কাটাইয়া সুষমাকে বুকের কাছে নিশিদিন টানিয়া রাখিত, তাহাকে যত্ন করিত, আদর করিত, তাহা হইলে বোধ হয় আজ তাহাকে এমন করিয়া অশ্রুজলের সহিত অতীত দিনের ব্যর্থ মুহূর্ত্তগুলিকে স্মরণ করিয়া কষ্ট পাইতে হইত না। আজ কত কথা তার মনে হইতে লাগিল! সে আহার করে নাই বলিয়া সুষমা কতদিন অনাহারে রহিয়াছে! সে স্নান করে নাই বলিয়া কতদিন সে অস্নাত রহিয়াছে! তাহার রুক্ষ চূর্ণকুন্তলগুলি তায় তাহার ম্লান মুখখানির উপর উড়িয়া পড়িয়াছে! কি সেই সুন্দর মুখখানি—স্নেহে, করুণায়, প্রীতিতে কত উজ্জ্বল! সে ত সেই মুখখানির

দিকে একবার ভাল করিয়া চাহিয়াও দেখে নাই! যখনই সে সেই মুখখানির দিকে চাহিতে গিয়াছে, তখনই বেদনায় তাহার অন্তর পরিপূর্ণ হইয়াছে!—হায়, আর কি তাহাকে কাছে ফিরিয়া পাওয়া যায় না? যে দিন চলিয়া গিয়াছে, সে দিন কি আবার ফিরিয়া আইসে না? কমলা সেই অতীত দিনগুলিকে ফিরাইয়া পাইবার জন্য কি না করিতে পারে! আহা, বুক চিরিয়া মা কালীর দুয়ারে রক্ত দিয়াও যদি তাহাকে ফিরিয়া পাওয়া যাইত!

তাহার দীর্ণ হৃদয়ের মধ্যে নিশিদিন কেবলই সেই একটি নাম ধ্বনিত হইতেছিল—"সুষমা! সুষমা!"

এ তাহার কি অন্তরবেগ! এ যে মানুষকে বলিয়া বুঝান চলে না! কি নিষ্ঠুর দহন এই!—তাহার মর্ম্মে শিরায় কি তীব্র জ্বালা এই!

নিখিল প্রথম মনে করিয়াছিল, কিছুদিন পরে সুষমার বিরহের তীব্রতা কমিয়া গেলে কমলা একটু স্থির হইতে পারিবে। কিন্তু শীঘ্রই তাহার সে ভুল ভাঙ্গিয়া গেল। কমলা কিছুদিন পর্য্যন্ত খুব কাঁদিল, তারপর চুপ করিল। নিখিল লক্ষ্য করিত, সর্ব্বদাই সে উন্মনা। তখন নিখিলের সর্ব্বপ্রথমে মনে হইত, বুঝি কমলার ইচ্ছা পূর্ণ করিলে এমনটা হইত না! কমলার উপরেও তাহার একটু রাগ হইল। সে এমন একটা সৃষ্টিছাড়া আবদার করিয়া বসিল কেন?

বহুকাল পূর্ব্বের একদিনকার কথা তাহার মনে পড়িল। কমলা কাব্য পড়িতে পড়িতে শ্রীকৃষ্ণপ্রিয়া রুক্মিণী ও সত্যভামার চরিত্রভাগ নিখিলের কাছে ধরিয়া বলিয়াছিল,—"কি সুন্দর মানুষ কেন সতীনকে হিংসা করে, আমি বুঝিতে পারি না! এ আদর্শ কেন সে গ্রহণ করে না?"

নিখিল হাসিয়াছিল, বলিয়াছিল,—"শ্রীকৃষ্ণপ্রিয়ার পক্ষে যাহা সম্ভব, সাধারণ মানুষের কাছে তাহা আশা করাটা ত চলে না,

কমল!" কমলা হাসিল না। ধীরে ধীরে কহিল,—"যে স্বামীর ভালবাসা পাইয়াছে, তাহার পক্ষে কি অসম্ভব তাহা আমি বুঝিতে পারি না।"

নিখিল সে দিন বিস্মিত নেত্রে চাহিয়া দেখিয়াছিল, সেই সাধ্বী নারীর কোমল দৃষ্টিটুকুর মধ্যে কি গভীর প্রেমরাশি উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছে! এ ত সেই একই কমলা। সেই স্নেহে কোমল, প্রীতিতে স্নিগ্ধ, করুণায় বিগলিত কমলা!

আজ নিখিল বুঝিল, সত্যই সে ভুল করিয়াছে!

১৩

সংসারে এমন অনেক ব্যাপার ঘটে, যাহার মধ্যে এক-খানি অদৃশ্য হস্তের কার্য্যকারিতা বড় সুস্পষ্টরূপে অনুভব করা যায়।

গ্রীষ্মের অপরাহ্ন। কমলা কক্ষতলে অঞ্চল বিছাইয়া শুইয়াছিল। নিখিল কাছারিতে গিয়াছে। কমলা শূন্যদৃষ্টিতে দেওয়ালের গায়ে একখানি ছবির দিকে চাহিয়াছিল এবং সুষমার কথা ভাবিতেছিল। যে জীবনে কোনদিন আঘাত পায় নাই, তাহার কাছে যে কোনও প্রকারের প্রথম আঘাতই বড় তীব্র বলিয়া মনে হয়। কমলাও ভাবিতেছিল, সে যে আঘাত, যে বেদনা পাইয়াছে, তার অপেক্ষা তীব্র আর কি হইতে পারে?

এমন সময়ে বাহিরের দরজার কাছে কয়েকজন লোকের অস্পষ্ট কথা শুনা গেল। কমলা প্রথম কাণ দিল না, যখন দুয়ারে মৃদু করাঘাত শুনা গেল, তখন কমলা শঙ্কিত চিত্তে উঠিয়া বসিল। জানালার কাছে গিয়া একটা পাখি টানিয়া তুলিয়া দেখিল, একখানি পাল্‌কী; ভিতরে কেহ শায়িত। কমলার হৃদ্‌পিণ্ডের কাছে কে যেন খুব জোরে একটা ধাক্কা দিল; তাহার নিশ্বাস

যেন বন্ধ হইয়া আসিতেছিল; হাত পা আড়ষ্ট হইয়া আসিল! একটু সাম্‌লাইয়া লইয়া সে দুয়ার খুলিয়া দিয়া কবাটের আড়ালে দাঁড়াইল।

নিখিল অতি কষ্টে পাল্‌কী হইতে বাহির হইয়া ভিতরে প্রবেশ করিতেই দু'খানি চিরপরিচিত বাঁহুর বেষ্টনীর মধ্যে আশ্রয় পাইল।

নিখিল পীড়িত হইয়া কাছারী হইতে ফিরিয়া আসিয়াছিল। কমলা আহার নিদ্রা ভুলিয়া স্বামীর শয্যাপার্শ্বে বসিয়া রহিল। পীড়া বাড়িয়া চলিল; বিরাম নাই, কমলা কলের পুতুলের মত রোগীর সেবার জন্য যাহা কিছু দরকার সমস্তই নিপুণ হস্তে সম্পন্ন করিতেছে। আজ সে তাহার মান, অভিমান, ব্যথা, বেদনা, সব ভুলিয়াছে!

তবু সুষমাকে মনে পড়িতেছিল! সে যদি কাছে থাকিত, দুই জনের মিলিত সেবা দ্বারা পীড়াকাতর স্বামীকে আর একটু বেশী আরামও ত প্রদান করা যাইত! আজ তার চেয়ে বেশী কাম্য কমলার কাছে ত আর কিছুই ছিল না! সুষমা সব কাজই কেমন সুন্দর গুছাইয়া করিতে পারিত, তার কোনও কাজের মধ্যেই এতটুকু ত্রুটি, এতটুকু বিশৃঙ্খলা থাকিত না! কমলা যে তেমন করিয়া কিছুই করিতে পারে না! সে যে তাহার তুলনায় কত অপটু, কত অপারগ!

স্বামীর রোগপাণ্ডুর মুখখানির দিকে চাহিয়া চাহিয়া কমলার চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিত; তাহার অন্তর মধ্যে শুধু একটি প্রার্থনা নিশিদিন ধ্বনিত হইতে থাকিত;—'হে ঠাকুর! হে অন্তর্যামী! এ রোগযাতনা বহন করিতে আমাকেই দাও,—আমাকেই দাও!'

১৪

কমলা ঠাকুরের দুয়ারে মাথা কপাল খুঁড়িয়া, বুকের রক্ত মানত করিয়াও ফল পাইল না। নিখিলের পীড়া বাড়িয়াই চলিল!

কমলার মনে হইতেছিল, যেন তাহার চক্ষের সম্মুখে একখানি বিয়োগান্ত নাটক অভিনীত হইতেছে! বাঁশী বাজিয়া বাজিয়া থামিয়া গিয়াছে, তবু যেন বাঁশীর সুরের মধুর রেশটুকু কাণের কাছে ভাসিয়া আসিতেছে! সেই সুর না মিলাইয়া যাইতেই তাহার দৃষ্টির কাছে শেষ দৃশ্যপট উত্তোলিত হইয়াছে! সাধ মিটে নাই, আশা পূর্ণ হয় নাই, তবু এখানেই অভিনয়ের শেষ হইবে! উপরে দুর্ভেদ্য নিষ্ঠুর কৃষ্ণ যবনিকাখানি রহিয়া রহিয়া দুলিতেছে, কাহার নির্মম সঙ্কেত পাইলেই উহা নামিয়া আসিবে, তাহাকে রঙ্গমঞ্চ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দিবে!—তার পর?—তার পর, এক দীর্ঘ জীবনব্যাপী বিরহের, দহনের আরম্ভ! শুধু স্মৃতি, শুধু হাহাকার, শুধু অশ্রু!

নিখিল মৃদুকণ্ঠে একবার ডাকিল, "কমলা!"—কমলা মুখের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া কহিল, "ডাকিলে?"—নিখিল যাহা উত্তর দিল, তাহা অসম্বদ্ধ প্রলাপ মাত্র!—ক্ষীণ, অস্পষ্ট স্বরে উচ্চারিত! মধ্যে মধ্যে কমলার নাম তাহার মুখ হইতে বাহির হইতেছিল! তাহার অর্থশূন্য ব্যাকুল দৃষ্টি কমলার মুখের উপর স্থাপিত করিয়া নিখিল যখন কিছু বলিবার জন্য ব্যর্থ চেষ্টা করিতেছিল, তখন কমলার অশ্রুপ্রবাহ কোনও মতেই বাধা মানিতেছিল না! একবার সে উন্মাদের মত স্বামীর মুখের কাছে মুখ দিয়া, অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে কহিল,—"কি বলিতে চাও তোমার কমলাকে?—বল, ওগো, বল!"

কমলার ইচ্ছা হইতেছিল, সেই রোগক্লিষ্ট দেহখানি জড়াইয়া

ধরিয়া, স্বামীর বুকে মুখ লুকাইয়া বলিয়া উঠে, "হে দয়িত; হে প্রিয়তম! হে জীবনসর্ব্বস্ব! তোমার কমলাকে ক্ষমা কর! শুধু একটিবার আদর করিয়া, গলা জড়াইয়া ধরিয়া আমার কমল বলিয়া ডাক! ওগো, আবার তেমনই প্রেমপূর্ণ দৃষ্টি উৎসারিত করিয়া মুখের পানে চাও! চাও!"—

নিখিলের পাণ্ডুর ললাটে হাত বুলাইয়া বুলাইয়া সে ভাবিতে লাগিল, হায়, অভাগিনী সে কেন অভিমান করিয়াছিল?—কেন সে স্বামীর অবাধ্য হইয়াছিল? কে সেই সুষমা, যাহার জন্য সে স্বামীকেও ব্যথা দিয়াছিল? হায়, কেন তাহার এমন দুর্ম্মতি হইয়াছিল?

দুয়ারে একটু মৃদু শব্দ হইল; তার পর কেহ মৃদুকণ্ঠে ডাকিল, "দিদি!"—কমলা চমকিয়া উঠিল! কাহার কণ্ঠস্বর এই? স্নেহে, মমতায়, করুণায় উচ্ছ্বসিত এমন আহ্বান সে ত শুধু একজনের কণ্ঠেই শুনিয়াছে!—স্বপ্ন এ কি!

আবার আহ্বান আসিল, "দিদি!"—কমলা বিদ্যুদ্বেগে উঠিয়া দাঁড়াইল। কে আসিয়াছে? সুষমা! কোথা হইতে আসিল সুষমা? কেমন করিয়া আসিল সুষমা?

অস্থির পদে কমলা অগ্রসর হইয়া গেল; দুয়ার খুলিয়া দিতেই কেহ ছুটিয়া আসিয়া তাহাকে জড়াইয়া ধরিল! কমলা অধীর কণ্ঠে কহিল,—"সত্যি কি তুই, সুষমা?"

সুষমা দিদির বুকের মধ্যে মুখ লুকাইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে কহিল, "হাঁ দিদি, আমি; এখনও তোমার অভাগিনী বোন্‌কে ভোল নাই তুমি?"

কমলা কথা কহিল না; সুষমাকে টানিয়া নিখিলের শয্যাপার্শ্বে লইয়া গেল, কহিল,—সুষি, দেখ্ আমার দুর্দ্দশা; আশীর্ব্বাদ কর্ আমি যেন মরিবার অবসর পাই!"

কমলা কাঁদিতে লাগিল; সুষমা নিখিলকে দেখিয়া শিহরিয়া উঠিল!—তাহার চক্ষু অশ্রুপ্লাবিত হইয়া উঠিল!

কমলা কহিল, "সুষি, বড় ভাগ্যি, তোর অদৃষ্টটা আমার অদৃষ্টের সঙ্গে এক করে বাঁধি নাই! মা কালী আমাকে যে কত বড় অনুতাপের হাত থেকে রক্ষা করেছেন, তাই মনে করে কৃতজ্ঞতায় আমার বুক ভরে ওঠে, সুষমা!"—কমলা চক্ষু তুলিয়া সুষমার মুখের দিকে চাহিল, দেখিল, তাহার নয়নে অশ্রু, কিন্তু অধরপ্রান্তে জলদান্তর্ব্বর্তী বিলীয়মান বিদ্যুৎস্ফুরণের ন্যায়, অতি মৃদু মধুর হাসির রেখা!

কমলা সুষমার মুখের সেই হাসির রেখাটুকু দেখিয়া ভীত হইয়া উঠিল, তাহাকে বুকের কাছে টানিয়া লইয়া ডাকিল, "সুষি!"— "দিদি!"—

"তোর মুখে প্রলয়ের সময়েও এ হাসি দেখ্‌লাম কেন রে, সুষি?" "এ হাস্‌বার অধিকার ত তুমিই দিয়েছ, দিদি!"

"সে অধিকার কি তুই আজ সাব্যস্ত করে নিতে এলি রে, অভাগী!" "দিদি, কে বলিল আমি অভাগী?"—একটা দ্রুত, উজ্জ্বল শোণিতোচ্ছ্বাস সুষমার সুগৌর মুখখানিকে রঞ্জিত করিয়া তুলিল; সে কমলার বুকে মুখ লুকাইল!

কমলা মুখরা সুষমার মুখটা দুই হাতে তুলিয়া ধরিয়া তাহার মুখের উপর তীক্ষ্ণদৃষ্টি স্থাপিত করিল! দেখিল, সে মুখ আয়ুষ্মতীর সকল চিহ্নে উজ্জ্বল গরিমাময়!

কমলা তখন দৃঢ় কণ্ঠে কহিল, "তবে চল্ ভাগ্যবতী, স্বামীর সেবা কর্‌বি! তোর পুণ্যে এবার স্বামী ফিরে পাব! আয় তুই বোন্, সাবিত্রীর শক্তি নিয়ে স্বামীকে বাঁচা, আমার মুখ রক্ষা কর্!"—

কমলা সুষমাকে নিখিলের পাদমূলে টানিয়া লইয়া গেল; উভয়ে একযোগে তাহার চরণ স্পর্শ করিয়া পায়ের ধূলা মাথায় তুলিয়া লইল!—

তিনদিন পরে কমলা ও সুষমা নিখিলের শয্যানিম্নে বসিয়াছিল। রোগী নিদ্রিত; তাহার নিঃশ্বাস সহজভাবে প্রবাহিত হইতেছিল। প্রবল ঝটিকান্তে প্রকৃতি শান্তভাব ধারণ করিয়াছে;—কোথাও আর এতটুকু মেঘ নাই, বায়ুর উচ্ছৃঙ্খল প্রবাহ নাই!

কমলা মৃদুস্বরে কহিল, "তুই এমন হঠাৎ এলি কেন রে, সুষি? হাজার চেষ্টা করেও তোকে যখন সেখান থেকে ফিরিয়ে আনতে পারি নাই, তখন মনে হয়, কত বড় আঘাত পেয়ে তুই যে আবার ফিরে তোর দিদির কাছে এসেছিস্, তা' বোধ হয় আমি কল্পনাও করতে পারছি না!"

সুষমার চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিল। কিছুক্ষণ দিদির চুলের মধ্যে অঙ্গুলি চালনা করিয়া ধীরে ধীরে কহিল,—

"সে অনেক দুঃখের কাহিনী, দিদি! কষ্টকে কষ্ট বলে জ্ঞান করিনি, যতদিন সম্মানের ভয় ছিল না! যখন বুঝ্লাম, তুমি ছাড়া আমার মান রক্ষা করতে পৃথিবীতে আর কেউই নাই, আর অপমান হ'লে সে অপমানটা আমাকে ছাড়িয়ে তোমাদের গায়েও এসে লাগ্‌তে পারে, তখনই পাশের বাড়ীর একটা ছোট ছেলেকে নিয়ে নৌকা করে চলে এলাম!—আর এক উপায় ছিল—মরণ, কিন্তু মর্‌লে তুমি আমায় কিছুতেই ক্ষমা করতে না, দিদি!"

নিখিল ডাকিল, "কমলা!"

কমলা সুষমার মুখ চুম্বন করিয়া উঠিয়া স্বামীর শয্যাপার্শ্বে গিয়া দাঁড়াইল। নিখিল চক্ষু খুলিয়াই দেখিল,—সুষমার হাস্য বিরঞ্জিত মুখখানি! সে আবার চক্ষু মুদ্রিত করিল!

পণের টাকা

১

ইতিহাস বলে রাজপুত সূতিকাগৃহেই কন্যা হত্যা করিত। সমগ্র রাজপুত জাতির পক্ষে ইহা একটা বিষম কলঙ্কের কথা। ইংরাজ তাঁহার শাসনদণ্ড দেখাইয়া এই কন্যাহত্যা রোধ করিয়াছেন।

বাঙ্গালী কন্যা হত্যা করে না। কিন্তু বাঙ্গালীর কন্যা তাহার জন্মদিনে আত্মীয়স্বজনের নিকট হইতে যে অভিনন্দন প্রাপ্ত হয়, তাহা সকল ক্ষেত্রেই যে বিশেষ প্রীতিপ্রদ হয়, এমন কথা বলিতে পারি না।

ইহার হেতু 'পণপ্রথা!'

তবে বাঙ্গালী জাতি স্নেহশীল, সর্ব্বস্ব ব্যয় করিয়াও কন্যার বিবাহ দিয়া থাকে। কিন্তু যে সর্ব্বস্ব ব্যয় করে, তাহাকে বহু অসুবিধার সহিত সারা জীবনব্যাপী সংগ্রাম চালাইতে হয়।

তাই কন্যার জন্মে বাঙ্গালীর গৃহে নিরানন্দের আঁধার ছায়া পড়ে।

ক্ষিতীশের স্ত্রী সুকুমারী কন্যা প্রসব করিলেন। বাহিরে ক্ষিতীশের কনিষ্ঠ সতীশ, ভগিনী লক্ষ্মী ও কমলা এবং বাড়ীর অন্যান্য ছেলেমেয়েরা শঙ্খ, ঘণ্টা ও কাঁসর সাজাইয়া রাখিয়াছিল। আশা ছিল, ছেলে হইলে বাজাইবে।

সূতিকাগৃহের মধ্যে নবাগত শিশুটীর করুণ অস্ফুট কাকলী

যখন তাহার আগমনবার্ত্তা ঘোষণা করিল, তখন বাহিরে সকলেই উৎকর্ণ হইয়া অপেক্ষা করিতেছিল; মুহূর্ত্তের নীরবতার পর কমলা জিজ্ঞাসা করিল—"কি হইল—ছেলে, না"—'মেয়ে' কথা তাহার মুখে বাধিয়া আসিতেছিল।

সূতিকাগৃহ হইতে উত্তর আসিল, একটু বিলম্বে,—"ওগো—মেয়ে হইয়াছে,—মেয়ে,—তা' বাঁচিয়া থাকুক্!—"

উত্তর দিতেছিল ধাত্রী; তাহার স্বরও একটু রুক্ষ, মাত্রাটা রসশূন্য! কারণ কন্যা হওয়াতে তাহার প্রাপ্যের দাবীও কমিয়া গিয়াছে!

কমলার মুখ মলিন হইয়া গেল,—তাহার উৎসাহ নিভিয়া গেল; লক্ষ্মী কহিল,—"মেয়ে হইয়াছে—এঃ—" হাতের কাঁসর ঠাকুর ঘরের বারান্দায় রাখিয়া কমলা সরিয়া দাঁড়াইল!

সতীশ তাহার হাতের শঙ্খ তুলিয়া ধরিয়া ফুঁ দিল। শঙ্খ বাজিয়া উঠিল। শঙ্খধ্বনি থামিতেই আবার শিশুর অস্ফুট ক্রন্দন শোনা গেল। সতীশ শঙ্খ নামাইয়া কহিল, "মেয়ে হইয়াছে—বেশ! আমি বিবাহ দিব। তোরা শঙ্খ বাজাইলি না কেন, কমলা দি'—বিবাহ কি তোরা দিবি?"

লক্ষ্মী হাসিল; কহিল, "তা' মণিদা, মেয়ে হইয়াছে বলিয়া সত্যই কি তোমার দুঃখ হয় নাই? যদি ছেলে হইত বেশী সুখী হইতে কি না?"

"ইঃ—একটুও না;—আমি কি তোদের মত স্বার্থপর?"—সতীশ পুনরায় মুখের কাছে শঙ্খ তুলিয়া লইয়া বাজাইল। তারপর কহিল,—"আমি মেয়ের নাম রাখিলাম,—খুব ভাল একটা নাম অবশ্য,—এই",—সতীশ একটু চিন্তা করিতে লাগিল।

"কি সে নাম, মণিদা?" লক্ষ্মী সতীশের দিকে একটু অগ্রসর হইয়া জিজ্ঞাসা করিল।

"নাম?—আচ্ছা,—আমি নাম রাখিলাম",—সতীশের মনের

মধ্যে অনেক নাম আসিতেছিল। কোন্‌টা স্থির করিবে তাহাই পছন্দ করিতেছিল।

কমলা কহিল,—"আমি এতক্ষণে দশটা নাম রাখিতে পারিতাম,—"

"কিন্তু তাহার একটাও চলিত না;—আমিই নাম রাখিলাম,—'শতদল'—"

লক্ষ্মী নাম শুনিয়া প্রফুল্ল হইয়া উঠিল, কহিল, "বেশ নাম—'শতদল',—মণিদা' কবি কিনা,—তাই এমন সুন্দর নামটা রাখিতে পারিল!"

কমলা একটু হাসিয়া কহিল, "সতুর মেয়ে হইলে আমি তার নাম রাখিব,—'সন্ধ্যা'!"

"গাছে না উঠিতেই এক কাঁদি; আগে বিয়েই হউক,"—

লক্ষ্মী তাহার ক্ষুদ্র রক্তপুষ্পপুটতুল্য অধর উল্‌টাইয়া কহিল,—"ই-রে! মণিদা'টার মোটেই লজ্জা নাই"—সতীশ তাড়াতাড়ি শঙ্খধ্বনি করিয়া লক্ষ্মীর কথাটা ডুবাইয়া দিতে চাহিল!

৩

ক্ষিতীশ বি, এ, পাশ করিয়া কলিকাতায় চাকরীর চেষ্টা করিতেছিল। সে দিনকার ডাকে তাহার কাছে দুইখানি এন্‌ভেলপ আসিল। ক্ষিতীশ বাড়ীর চিঠিখানি খুলিয়া পড়িল,—"দাদা, তোমার কন্যারত্ন হইয়াছে; কাল সকালে ৮-১৫ মিনিটের সময়। মণিদা' তাহার নাম রাখিয়াছে 'শতদল'। ভারি সুন্দরী হইয়াছে সে!"

অন্য খানি মীরপুর স্কুলের সম্পাদকের চিঠি। ক্ষিতীশ সেখানকার হেড্‌মাষ্টারীর জন্য আবেদন করিয়াছিল, তাহারই নিয়োগ পত্র।

ক্ষিতীশ আজ প্রায় তিন মাস পর্য্যন্ত চাকরীর চেষ্টা করিতে-

ছিল ; আজ এই নবীন অতিথিটির আগমনের সঙ্গে সঙ্গেই যে এমনি করিয়া ঈপ্সিত অর্থাগমের পথও তাহার কাছে মুক্ত হইয়া যাইবে, সে তাহা একটিবার মনে করিতে পারে নাই।

কন্যার জন্মের সঙ্গে সঙ্গে এই যে সার্থকতার রজতোজ্জ্বল হাস্যময়ী ক্ষীণ ধারাটি তাহাকে আজই সর্ব্বপ্রথম অভিনন্দন করিল, পূত জাহ্নবীধারার মত, এই ধারাটিকে তাহার দিকে যেন এই নবাগত শিশুটিই পথ দেখাইয়া লইয়া আসিয়াছে !

ক্ষিতীশ প্রভাতসূর্য্যকিরণদীপ্ত আকাশের দিকে চাহিয়া তাহার দুইপাণি যুক্ত করিল, তারপর ধীরে ধীরে যুক্তকরে ললাট স্পর্শ করিল !

জননীর কাছে চিঠি লিখিয়া, লক্ষ্মী ও কমলাকে প্রত্যুত্তর দিয়া, একদিন সন্ধ্যার গাড়ীতে ক্ষিতীশ কলিকাতা হইতে মীরপুরাভিমুখে রওয়ানা হইল।

মীরপুর আসিয়া দুইদিন পরে সতীশের একটু ক্ষুদ্র চিঠি ক্ষিতীশ পাইল। সতীশ লিখিয়াছে, "কমলাদি' ও লক্ষ্মী, শতদল হইলে কাঁসর ও ঘণ্টা বাজায় নাই ! মেয়ে ও ছেলে নাকি সমান নহে ! শতদলের কল্যাণেই আপনি চাকরী পাইয়াছেন, তাহার বিবাহের জন্য এখন হইতেই প্রতিমাসে টাকা রাখিবেন, আমরা খুব ঘটা করিয়া তাহার বিবাহ দিব।"

সতীশের অভিযোগ ও পরামর্শ শুনিয়া ক্ষিতীশ একটু হাসিল।

বরপণের জন্য কন্যার পিতাকে যে বিষম লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হয়, ক্ষিতীশের তাহা অবিদিত ছিল না। ক্ষিতীশ সঙ্কল্প করিল, প্রতিমাসে তাহার এই সামান্য আয় হইতেও কিছু সে শতদলের বিবাহের জন্য সঞ্চয় করিবে। শতদলের বিবাহের সময় যেন তাহাকে কোনও মতেই মনে না করিতে হয় যে, কন্যাকে পাত্রস্থ করিতে তাহাকে এতটা বেগ পাইতে হইল !

সুতরাং প্রথম মাসের বেতন পাইয়াই জননীর কাছে খরচ পাঠাইয়া দিয়া, একখানি দশটাকার নোট, সে তাহার হাতবাক্সের মধ্যে একখানি পুরু কাগজের নীচে খামে ভরিয়া ফেলিয়া রাখিল। খামখানির উপর শতদলের জন্মতারিখ প্রভৃতি লালকালী দিয়া মোটা মোটা অক্ষরে লিখিয়া রাখিতে ভুলিল না।

৪

সুখে ও দুঃখে প্রায় দুই বৎসর কাটিয়া গেল। ক্ষিতীশ পূজার ছুটির পর বাড়ীর সকলকে মীরপুরের বাসায় নিয়া আসিল।

কমলা শ্বশুরালয়ে চলিয়া গিয়াছে। লক্ষ্মী পূজার সময় মার কাছে আসিয়াছে। শ্বশ্রূমাতার অনুমতি পাইয়া দাদার সঙ্গে মীরপুরের বাসায় কয়েকদিনের জন্য আসিল। সতীশ দাদার কাছে থাকিয়াই পড়াশুনা করিত। পাঠ্যপুস্তকের সংখ্যাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাহার ঘুড়ি ও লাটীমের প্রতি অনাদর বাড়িয়া উঠিতেছিল। সে এখন ঘুড়ির রঙ্গিন কাগজ ভাঁজ করিয়া কাটা অপেক্ষা, ঘুড়ি কেন বাতাসে উড়ে, তাহারই একটি নির্দ্দিষ্ট মীমাংসায় উপনীত হইবার জন্যই বেশী আগ্রহ প্রকাশ করে।

শতদল বাসার সর্ব্বত্র অবাধ গতিতে ছুটাছুটি করিয়া বেড়ায়; আর কবিতার বিচ্ছিন্নাংশ, নানাপ্রকার গানের ভাঙ্গা ভাঙ্গা পদ, অনর্গল বকিয়া যাইতে থাকে। একটি ক্ষুদ্র শুভ্র যূথিকাপুষ্প-কোরকের মত সেই ছোট বালিকাটি বড় সুন্দর,—বড় কোমল! শরতের নির্ম্মল নীলাকাশে শুভ্র মেঘখণ্ড টুকুর মত সে নিরন্তরই আনন্দ-চঞ্চল! তাহার স্বপ্নময় দৃষ্টিটুকুর দিকে চাহিয়া ক্ষিতীশের মনে হইত, দেবলোকের পুণ্যছায়া যেন সেই দৃষ্টির মধ্যে ফুটিয়া রহিয়াছে! সে যেন ঠাকুরের পূত আশীষ নির্ম্মাল্যটুকু! তাহাকে বুকের কাছে চাপিয়া ধরিয়া, তাহার কুঞ্চিত কেশরাজির মধ্যে অঙ্গুলি সঞ্চালন করিয়া, তাহার ললাটে ও কপোলে সস্নেহ চুম্বন

প্রদান করিয়া, তাহার লীলাচঞ্চল গতিভঙ্গি নিরীক্ষণ করিয়া, নিশিদিন তাহার অস্ফুট কাকলী শ্রবণ করিয়া, ক্ষিতীশের হৃদয় স্নেহে, মমতায়-উদ্বেলিত হইয়া উঠিত!

ক্ষিতীশ ভাবিত, প্রথম বিবাহিত জীবনে, যখন নারায়ণ শতদলকে না দিয়াছিলেন, তখন কেমন করিয়া তাহার দিন কাটিত! আজিকার দিনগুলির তুলনায় তখনকার দিনগুলি কি বৈচিত্র্যবিহীন, কি নিরানন্দই ছিল! আজি আর শতদলকে কাছে না পাইলে এক মুহূর্ত্তও কাটিতে চাহে না!

সংসারের সর্ব্বপ্রকারের সুখ দুঃখ, আনন্দ ও বিরামের মধ্যে ঐ স্নেহপুত্তলিকাটি এমন একটি স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে, যে উহাকে কিছুতেই ভুলিয়া যাওয়া চলে না; নিশিদিন সে সকলের হৃদয়ের মধ্যে একটি কোমল সুখ-স্মৃতির মত লাগিয়া রহিয়াছে!

সে যখন তাহার অবাধ লীলাচঞ্চল গতিতে সর্ব্বত্র ছুটাছুটি করিতে থাকে, তখন কেবলই মনে হয় তাহাকে একবার একটু স্পর্শ করিয়া, একটু বুকের কাছে চাপিয়া ধরিয়া, একটু সজোরে উপরের দিকে উৎক্ষিপ্ত করিয়া দিয়া, বুঝি অন্তর তৃপ্ত হইবে! সে যখন প্রশ্নের উপর প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া ব্যতিব্যস্ত করিয়া তোলে, যখন আর উত্তর দিয়া তাহার কৌতূহলকে নিবৃত্ত করা চলে না, তখন মনে হয়, সেই বক্ষলগ্ন অবোধ শিশুটীকে চুম্বনে চুম্বনে অস্থির করিয়া তুলিলেই সেই প্রশ্নস্রোত রুদ্ধ হইয়া যাইবে!

এমনি করিয়া একটি বিরামহীন স্নেহ ও আনন্দানুভূতির মধ্যে ক্ষিতীশের পারিবারিক জীবন কাটিতেছিল! সেই পারিবারিক জীবনের কেন্দ্র ঐ দুই বৎসরের ক্ষুদ্র শিশুটি!

৫

কিন্তু বৎসর পরে এমন একটি মুহূর্ত্ত আসিল, যে মুহূর্ত্তটিকে ক্ষিতীশ কোনও দিন স্বপ্নেও আশা করে নাই! সেই নিষ্ঠুর

মুহূর্তটি দেবতার বজ্রের মতই কঠিন, অমোঘ, অকরুণ! দেবতার বজ্রের মতই অতর্কিতে সেই কালমুহূর্তটি একদিন গ্রীষ্মাবকাশের সন্ধ্যায় আসিয়া উপস্থিত হইল, এবং এই ক্ষুদ্র পরিবারের সুখ ও শান্তি একপলকের মধ্যে বিধ্বস্ত, বিনষ্ট করিয়া দিয়া গেল!

তিনদিনের প্রবল জ্বরে, সূর্য্যাতপম্লান যূথিকাপুষ্পটির মত, কুসুমাধিক পেলবা বালিকা শতদল একেবারে শুকাইয়া উঠিল! যে ক্ষুদ্র বালিকা সংসারের আনন্দস্বরূপিণী ছিল, যে প্রফুল্ল কুন্দকলিকাটির মত দিন দিন বাড়িয়া উঠিতেছিল, মৃত্যুর তুষার-শীতল স্পর্শ তাহাকে মুহূর্ত্ত মধ্যে অসাড় কালিমাময় করিয়া রাখিয়া গেল! অন্ধকার গৃহে—সোনার দেউটি জ্বলিয়া উঠিয়াছিল, তাহা কাহার নির্ম্মম ফুৎকারে চিরদিনের তরে নিভিয়া গেল!

ক্ষিতীশ ভাবিল, এ কোন্ নির্ম্মম দেবতার দারুণ অভিশাপ! তাহার হৃদয়ের মধ্যে শোণিতস্রোত যেন একেবারে রুদ্ধ, স্তম্ভিত হইয়া গেল! কে যেন তাহার হৃৎপিণ্ডটা কঠিন হস্তে টানিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিল! এমন করিয়া অন্তরে আঘাত লাগিতে পারে সে ত তাহা কোনও কালেই মনে করিতে পারে নাই!

একি দারুণ বেদনা! একি রুদ্ধ যাতনার অগ্নিস্রাবী দহন! শোকের নিমেষহীন তীব্র শিখা নিশিদিন তাহার অন্তরদেশকে দগ্ধ করিতে লাগিল। কেমন করিয়া এ দহনকে সে নির্ব্বাপিত করিবে,—শান্ত করিবে? হায়! তবু সংসার আছে, সংসারের শত কার্য্য আছে! যে গিয়াছে সে কিছুই ত লইয়া যায় নাই! তেমনি দিনের পর দিন কাটিয়া যাইতেছে; তেমনি প্রত্যহ কর্ম্মকোলাহল বিশ্বময় জাগিয়া উঠিতেছে! সবই ত ফিরিয়া আইসে, কিন্তু যে কয়টী দিনের জন্য তার সমস্ত সংসারকে আনন্দে, পুলকে, চঞ্চল সচেতন করিয়া তুলিয়াছিল, সে যে চলিয়া গেল, আর ত ফিরিয়া আসিল না! হায়, কোথায় গেল সে! কোথায় সেই চির রহস্যময় আনন্দলোক,—যেখানে ব্যথা নাই, বিচ্ছেদ

নাই, দহন নাই? হে বিশ্বেশ্বর! তুমি আজি যে কঠিন নির্ম্মম বেদনা প্রদান করিয়াছ, তুমিই সেই বেদনাকে বহন করিবার, বরণ করিয়া লইবার, শক্তি প্রদান কর!

৬

ছুটীর পর ক্ষিতীশ কর্ম্মস্থলে ফিরিয়া আসিল। মাসান্তে বেতন পাইয়া যখন সে বাসায় ফিরিয়া আসিতেছিল, তখন সে তাহার অশ্রুজড়িত দৃষ্টিতে ভাল করিয়া পথ দেখিতে পাইতেছিল না। ছোট শয্যাখানির উপর অবসন্ন ভাবে উবুড় হইয়া পড়িয়া সে একটা ক্ষুদ্র উপাধান বুকের কাছে দুই হাতে আঁকড়িয়া ধরিল! বুকের মধ্যে একটা প্রকাণ্ড শূন্যতা সে অনুভব করিতেছিল। একটা কিছু সজোরে বুকের কাছে চাপিয়া ধরিতে পারিলেও যেন কতকটা আরাম পাওয়া যাইবে! আজ সে বেতন পাইয়াছে। কর্ম্মারম্ভের প্রথম মাস হইতেই এপর্য্যন্ত প্রত্যেক মাসান্তে সর্ব্ব প্রথমেই সে যে শতদলের বিবাহের জন্য একখানি করিয়া নোট সযত্নে তুলিয়া রাখিয়া থাকে! আজ শতদল নাই, কিন্তু সে ত বেতন পাইয়াছে! কাহার বিবাহের জন্য আজ সে নোট তুলিয়া রাখিবে? স্নেহ-লালিতা আদরিণী কন্যার বিবাহের পণের জন্য আজি আর নোট তুলিয়া রাখিবার বিন্দুমাত্র প্রয়োজনও নাই! কেন প্রয়োজন নাই?

শতদল যে চলিয়া গিয়াছে! তাহার বিবাহের জন্য ত আর তাহাকে ভাবিতে হইবে না! বাঙ্গালীর সংসারে কন্যা আসিলেই নিরানন্দ জাগিয়া উঠে;—সে ত ঐ বিবাহের ব্যয়ের জন্য—ঐ পণের জন্য! তাহার স্নেহপুত্তলি, নয়নামৃতরূপিণী কন্যা!—কোথায় গেল সে—কেন গেল সে? শতদল যে নাই,—সে যে চিরদিনের জন্য চলিয়া গিয়াছে, তাহার বিবাহের জন্য আর যে তাহাকে চিন্তা করিতে হইবে না, আজ তাহা নোট তুলিয়া না রাখিয়া এমন

নির্ম্মমভাবে তাহাকে স্বীকার করিতে হইবে। আজ তিন বৎসর পর্য্যন্ত সে যে নোটগুলি সংগ্রহ করিয়াছে, সে গুলিরও ত আর কোনও প্রয়োজনই নাই! সে সেই নোটগুলি লইয়া কি করিবে? শতদলের বিবাহের জন্য সঞ্চিত অর্থ সে ত কোনও মতেই কার্য্যান্তরে ব্যয় করিতে পারিবে না! তাহার বুকের মধ্যে সে কেমন একটা তীব্র, অব্যক্ত বেদনা অনুভব করিতে লাগিল! তাহার দীর্ণ হৃদয় একটা নিষ্ঠুর আঘাত পাইয়া বড় পীড়িত, কাতর হইয়া উঠিল!

তখন ক্ষিতীশ অশ্রু মুছিয়া ধীরে ধীরে উঠিয়া বসিল। শিয়রের দিকে একটা ছোট হাত বাক্স ছিল, ধীরে ধীরে শিথিল হস্তে তাহা খুলিল। বাক্সের নীচে একটা ছোট সুদৃশ্য শ্বেতপাথরের কৌটা ছিল; তাহার মধ্য হইতে একটি মূল্যবান্ 'নোটকেশ্' বাহির করিয়া আনিল। 'নোটকেশটির' উপরে ক্ষুদ্র কাগজখণ্ড লাগান ছিল। সেই কাগজের উপর সুন্দর সাজান অক্ষরে শতদলের নাম, জন্মতারিখ প্রভৃতি লিখিত ছিল। এই নোটকেশ্‌টির একাংশ হইতে ক্ষিতীশ একটু কাগজে জড়ান কুঞ্চিত ভ্রমরকৃষ্ণ কেশগুচ্ছ বাহির করিল!

সে এই ক্ষুদ্র চিহ্নটুকু একবার বুকের কাছে কম্পিত হস্তে চাপিয়া ধরিল; তখন অশ্রু তাহার দুই গণ্ড প্লাবিত করিয়া নামিয়া আসিতেছিল!—"ঠাকুর! যাহাকে বুকের কাছে চাপিয়া রাখিয়া তৃপ্তি পায় নাই,—আজি এই ক্ষুদ্র কুন্তলগুচ্ছ, যাহা একদিন তাহার ললাটের উপর লুণ্ঠিত হইত,—এই ক্ষুদ্র চিহ্নটুকুই কি আমার সান্ত্বনার জন্য একমাত্র অবশেষ রূপে রাখিলে!"

ক্ষিতীশ সাবধান হস্তে সেই কেশগুচ্ছ 'নোটকেশের' মধ্যে তুলিয়া রাখিল। তারপর পকেট হইতে রুমাল বাহির করিয়া আনিল। রুমালের মধ্যে জড়ান সেই দিনকার প্রাপ্ত নোট ও টাকাগুলি ছিল। একখানি নোট লইয়া ধীরে ধীরে সেই

'নোটকেশের' মধ্যে রক্ষা করিল। এমন সময়ে দ্বার খুলিয়া সুকুমারী কম্পিত পদে কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। ক্ষিতীশ সুকুমারীর মুখের দিকে চাহিল; তাহার দৃষ্টির মধ্যে কেমন একটা অস্বাভাবিক জ্যোতিঃ ফুটিয়া উঠিল। ক্ষিতীশ উচ্চ অবিকৃতস্বরে কহিয়া উঠিল,—"শতদলের বিবাহের ব্যয় সংগ্রহ করিতেছি, সুকু!" সুকুমারীর চেতনা বিলুপ্তপ্রায় হইয়া আসিতেছিল, সে শয্যার উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া স্বামীকে বুকের কাছে টানিয়া লইল।

৭

দিন কাটে, দিন কাহারও মুখের দিকে চাহিয়া বসিয়া থাকে না। ক্ষিতীশের দিনও কাটিতেছিল। আট বৎসর পূর্ব্বে একদিন জ্যৈষ্ঠের সন্ধ্যায় সে যে তীব্র আঘাত পাইয়াছিল, তাহার বেদনাকে সে এই সুদীর্ঘ কালের অবসরের মধ্যেও একেবারে নিঃশেষ করিয়া মুছিয়া ফেলিতে পারে নাই, অন্তরের কোন্ এক নিভৃত প্রদেশে এতটুকু একটু স্থান নিশিদিন বেদনায় আতুর হইয়াছিল! তাহার সমগ্র অনুভূতিটুকু অনুক্ষণ সেই বেদনাতুর স্থানটুকুকে বেষ্টন করিয়া পাহারা দিতেছিল! এ শোকের বেদনাটুকু চিরন্তন শাশ্বত; সে কোনও মতেই এই বেদনাকে, এই স্মৃতিকে অস্বীকার করিতে পারিবে না! যে একদিন সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় ছিল, তাহার স্মৃতিটুকুকে সে কেমন করিয়া হৃদয় হইতে মুছিয়া ফেলিবে? সেই স্নেহপুত্তলি, স্বর্গে অথবা মর্ত্ত্যে, যেখানেই থাকুক, সে তাহার স্নেহরাজ্য চিরদিন সমভাবেই অধিকার করিয়া থাকিবে! মৃত্যু যে নিষ্ঠুর ব্যবধান রচনা করিয়া দিয়াছে, সেই ব্যবধানের মধ্য দিয়া সে কখনই তাহাকে ভুলিয়া যাইবে না।

জামার ভিতরের দিকে বিশেষ ভাবে একটা পকেট প্রস্তুত

করাইয়া ক্ষিতীশ কেশগুচ্ছসহ নোটকেশটি সেই পকেটের মধ্যেই সযত্নে রক্ষা করিত। সমস্ত দিনের কর্ম্মকোলাহলের মধ্যেও বুকের কাছে রক্ষিত সেই নোটকেশটির মৃদুস্পর্শ তাহাকে তাহার স্বর্গগতা শিশুর পুণ্যস্মৃতিটুকু মনে করাইয়া দিত। তাহার অন্তরে, সমগ্র চিন্তাস্রোতের নিম্নে, আর একটি সম্পূর্ণ বিভিন্ন প্রকৃতির চিন্তার ধারা অনুক্ষণ প্রবাহিত হইত; সেই ধারাটি তাহার ভাবপ্রবণ হৃদয়ের সমস্ত স্নেহটুকুকে তাহার মৃতা কন্যার অভিমুখেই প্রবাহিত করিয়া লইয়া যাইত।

৮

গ্রীষ্মের ছুটীতে ক্ষিতীশ বাড়ী আসিয়াছে। সেদিন সকালের ডাকে ক্ষিতীশ একখানি রঙ্গিন চিঠি পাইল; খামখানির উপরে এক পাশে লেখা ছিল "শুভবিবাহ!" যিনি নিমন্ত্রণ করিয়াছেন,—সতীশ বাবু,—তিনি ক্ষিতীশের নিকট-আত্মীয় কেহ নহেন; কলেজে পড়িবার সময় এই সহোদরতুল্য সতীশের সহিত ক্ষিতীশ এক মেসে এক ঘরে থাকিত; এজন্য উভয়ের মধ্যে যথেষ্ট বান্ধবতা জন্মিয়াছিল। ক্ষিতীশ চিঠি পড়িয়া ভাবিল, "ছুটিতে কাজকর্ম্মও কিছু নাই, দুই একদিনের জন্য কলিকাতা ঘুরিয়া আসিলে মন্দ কি?"—ক্ষিতীশ যাওয়া স্থির করিয়া বাড়ীর ভিতরে গেল। সুকুমারীকে কলিকাতা যাওয়ার সঙ্কল্প জানাইয়া বিকালের গাড়ীতেই রওনা হইবার বন্দোবস্ত করিতে লাগিল।

বিকালের এক্‌সপ্রেশ্‌ গাড়ী ধরিবার জন্য ক্ষিতীশ যখন রওনা হইল, তখন সুকুমারী তাহার হাতে ছোট একখানি ভাজকরা কাগজ আনিয়া দিল। সে সুকুমারীর মুখের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"কি, এ?—" "কয়েকটা জিনিস আনিবে, লিখিয়া দিলাম।"—ক্ষিতীশ যদি লক্ষ্য করিত, তাহা হইলে দেখিতে পাইত, সুকুমারীর চক্ষু অশ্রুসিক্ত হইয়া উঠিয়াছে।

সে কাগজখানি পকেটে রাখিয়া সুকুমারীকে বুকের কাছে টানিয়া আনিল; একবার তাহার ক্ষুদ্র ললাটে অধর স্পর্শ করিল; তারপর গভীর স্নেহে সুকুমারীর প্রেমপূর্ণ দৃষ্টির সহিত দৃষ্টি মিলাইল! সুকুমারী একটু চাহিয়া থাকিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিল। ক্ষিতীশ হাসিয়া কহিল,—"এখনও সেই এক রকমই আছ!" "কি রকম?"—"সেই ছেলেবেলার মত!"—সুকুমারী আর কথা কহিল না; একটু হাসিয়া স্বামীর বক্ষে মুখ লুকাইল।

ক্ষিতীশ যখন চলিয়া গেল, তখন অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত সুকুমারী পথের দিকে চাহিয়া রহিল! তাহার চক্ষু অশ্রুতে ভরিয়া উঠিল! আট বৎসর কাটিয়া গিয়াছে; সুকুমারীর আর কোনও সন্তানাদি হয় নাই! হে ঠাকুর! আবার কবে তাহার বিজন নিরানন্দ সংসারে মায়ালোকের 'সোণার দেউটি' জ্বলিয়া উঠিয়া তাহার সকল কামনাকে নিঃশেষ করিয়া দিবে?

৯

বাঙ্গালী সর্ব্বস্ব নষ্ট করিয়াও কন্যার বিবাহ দিতে চাহে। আধুনিক বাঙ্গালী বিলাসরঙ্গের মধ্য দিয়া জীবনকে টানিয়া লইয়া চলিয়াছে; কোথায় এ বিলাসিতার পরিণাম, তাহা সে আজিও হিসাব করিয়া দেখে নাই। বাহুল্য ব্যয় তাহার মজ্জাগত হইয়া উঠিয়াছে। আয়ের হিসাব ও ব্যয়ের হিসাব খতাইয়া দেখিবার সাহস তাহার নাই। কারণ আয় অপেক্ষা ব্যয়ের মাত্রা ছাড়াইয়া উঠিতেছে। বাঙ্গালী যেন একদিন হঠাৎ একটা 'আলাদিনের প্রদীপ' কুড়াইয়া পাইয়া বসিয়াছে! প্রদীপের দৈত্যটা এই অনুকরণপ্রিয় অতি বুদ্ধিমান্ জাতিটাকে একটা বিলাসরঙ্গে পরিপূর্ণ পরীরাজ্যের মধ্য দিয়া টানিয়া লইয়া চলিয়াছে! খেয়ালবশে হঠাৎ একদিন সে এই জাতিটাকে কোথায় নামাইয়া

দিয়া যাইবে, বাঙ্গালী তাহা এখন পর্য্যন্ত ভাবিয়া দেখিবার অবসর পায় নাই!

উজ্জ্বল আলোকমালাপরিশোভিত বিবাহ সভা;—বাহুল্য ব্যয়ের বহু চিহ্ন চারিদিকে ফুটিয়া উঠিয়াছে; বিচিত্র পতাকা-সমূহ মৃদু পবনান্দোলিত হইয়া উৎসবসঙ্কেত প্রকাশ করিতেছে। পত্ররচনার মধ্যে মধ্যে চিত্রসমূহ শোভা পাইতেছে। সুবেশ-পরিহিত বালকবালিকা, কিশোরকিশোরী, তরুণতরুণী, বৃদ্ধবৃদ্ধা, চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। কেহ কর্ম্মে ব্যস্ত, কেহ সমালোচনায় ব্যস্ত; কেহ গল্প করিতেছে, হাসিতেছে।

বর আসিল। বিবাহসভা জনসমাগমে, মৃদুগুঞ্জনে মুখরিত হইয়া উঠিল। লগ্ন সমাগত; কেহ বরের পিতার নিকট শুভ কার্য্যারম্ভের অনুমতি আনিতে ছুটিয়া গেল। উভয় পক্ষ হইতে 'প্রীতি-উপহারের' ছড়াছড়ি আরম্ভ হইল। উপহার কেহ পড়িল, কেহ ভাজ করিয়া পকেটে রাখিল, কেহ মুঠা করিয়া কিছুক্ষণ হাতে রাখিয়া ফেলিয়া দিল। এই প্রীতি-উপহার প্রদান বর্ত্তমানে বাঙ্গালীর বিবাহের একটি প্রধান অঙ্গ হইয়া উঠিয়াছে!

ক্ষিতীশ একখানি চেয়ারের উপর বসিয়া অন্যমনস্ক ভাবে বিবাহ-সভার দিকে চাহিয়াছিল। হঠাৎ পকেটের ভিতর হাত প্রবেশ করাইয়া দিতেই সুকুমারীর দেওয়া কাগজখণ্ড তাহার হাতে ঠেকিল। কাগজখানি টানিয়া বাহির করিয়া ক্ষিতীশ পড়িয়া গেল;—কতকগুলি ফলের নাম। একটা আকস্মিক আঘাত পাইলে মানুষ যেমন আর্ত্ত হইয়া উঠে, ক্ষিতীশ কাগজটুকু পড়িয়া তেমনি ব্যথিত হইয়া উঠিল! শতদল ফল ভালবাসিত, তাই প্রতি বৎসর শতদলের মৃত্যুতিথিতে সুকুমারী ফলসংগ্রহ করিত। কয়েকজন ব্রাহ্মণকে নিমন্ত্রণ করিয়া পরিতোষরূপে সেই ফলগুলি ভোজন করানই তাহার জীবনের প্রধান কার্য্য হইয়া পড়িয়াছিল! হায়, জননীর স্নেহপূর্ণ হৃদয়! ক্ষিতীশের চক্ষে জল আসিল।

বুকের কাছে নোটকেশটির মধ্যে শতদলের কেশগুচ্ছ ছিল; সে নোটকেশটি দুইহাতে বক্ষের সঙ্গে চাপিয়া ধরিল! কি বেদনাপূর্ণ শোকের ইতিহাস তখন তাহার অন্তর মধ্যে জাগিয়া উঠিয়াছে! সহসা বাহিরে একটা গোল উঠিল! একজন ছুটিয়া আসিয়া কহিল,—"উঠিয়া আয় নরেন, বিবাহ হইবে না!"—

তখন বিবাহের অনুষ্ঠান কেবল আরম্ভ হইতেছিল। পট্টবস্ত্রপরিহিতা সুষমাকে কয়েকজন যুবক শঙ্খ ও উলুধ্বনির মধ্যে বিবাহ সভায় লইয়া আসিতেছিল। বর আসনের উপর উঠিয়া দাঁড়াইল। একটি কন্যাপক্ষীয় যুবক অদূরে দণ্ডায়মান ছিল; সে ছুটিয়া আসিয়া বরের দুই হাত চাপিয়া ধরিল। বর হাত ছাড়াইয়া লইবার চেষ্টা করিল,—চেষ্টা করিয়া বুঝিল, যে ধরিয়াছে সে মহাশক্তিশালী। যুবক একটু মৃদু হাসিয়া কহিল, "ছিঃ ভায়া, ভারি অরসিক তুমি,—বিবাহ না করিয়া কোথায় যাইবে?"—বর বিরক্তিপূর্ণস্বরে কহিল, "ছাড়ুন, ব্যাপার কি দেখিয়া আসি—" "তা' কি হয়, আসন যে ত্যাগ করিতে নাই,"— এমন সময়ে বরপক্ষের দুই একজন সেখানে ছুটিয়া আসিল। ব্যাপার কি কেহ ভাল করিয়া না বুঝিলেও সকলেই উদ্বিগ্নভাবে ছুটাছুটি করিতে লাগিল।

সতীশ বাহির বাড়ীর দিক্ হইতে ভিতর বাড়ীর বিবাহ সভার দিকে আসিতেছিল, ক্ষিতীশ তাহাকে দেখিয়া তাহার কাছে গেল। "ব্যাপার কি সতীশ?—" সতীশ ক্ষিতীশকে একপাশে টানিয়া লইয়া গেল, কহিল,—"সর্ব্বনাশ হইয়াছে, জাতিরক্ষার আর উপায় দেখি না, কি হইবে উপায়, ক্ষিতীশ?"—"ব্যাপারটা খুলিয়া বল ত?"—"দুই হাজার টাকা পণ দিবার কথা, বাড়ী বিক্রয় করিয়া মেয়েদের গহনা বন্ধক দিয়া টাকা সংগ্রহ করিয়াছি, মাত্র আটশত টাকা পণ এ পর্য্যন্ত দেওয়া হইয়াছে। বাকী

টাকাটা সন্ধ্যার সময় বাহির করিয়া ড্রয়ারের মধ্যে রাখিয়াছিলাম ; এখন আনিতে যাইয়া দেখিলাম, সেখানে কিছুই নাই।”

ক্ষিতীশ চমকিয়া উঠিল, “কি সর্ব্বনাশ, ভাল করিয়া দেখিয়াছ ত, সতীশ?”—“পাঁতি পাঁতি করিয়া খুঁজিয়াছি”—সতীশ হতাশভাবে সেইখানে মাটির উপর বসিয়া পড়িল, “কি করিব ভাই? সর্ব্বস্ব খুয়াইয়া টাকা সংগ্রহ করিয়াছিলাম,—এ কি বিপদে পড়িলাম!”—“চল, আর একবার ভাল করিয়া খুঁজিয়া আসি,”—“কোথায় যাইব, অন্বেষণ করিতে কিছুই বাকী রাখি নাই ; নারায়ণ, এ কি করিলে!”—ক্ষিতীশ সতীশের হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া চলিল। বাড়ীর মধ্যে যে ঘরে ড্রয়ার ছিল, সেখানে গেল। ড্রয়ারের অবস্থা দেখিয়া ক্ষিতীশ বুঝিল, অন্বেষণ বৃথা! তবুও একবার আশে পাশে খুঁজিল।

সতীশ একটা চেয়ারের উপর উন্মাদের মত বসিয়া পড়িল ; তাহার দৃষ্টির মধ্যে একটা উদাসভাব ফুটিয়া উঠিয়াছিল! কি ঘটিয়াছে সে যেন তাহা সব ভুলিয়া গিয়াছে ; তাহার মস্তিষ্কের মধ্যে যেন বড় কেমন করিতেছিল! সে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া চেয়ারের সাম্‌নের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িল ; তারপর মাটীতে উবুড় হইয়া পড়িয়া গেল! সতীশের স্ত্রী নীরদা দরজার আড়ালে ছিল, সে অস্ফুটস্বরে কাঁদিয়া উঠিল। ক্ষিতীশ সতীশকে জড়াইয়া ধরিয়া নিকটবর্ত্তী শয্যার উপরে লইয়া গেল। সতীশের পত্নীর দিকে ফিরিয়া কহিল, “আপনি একটু জল লইয়া আসুন, বৌদিদি—” নীরদা ছুটিয়া জল লইয়া আসিল। নীরদা ইতিপূর্ব্বে ক্ষিতীশকে তাহাদের বাড়ীতেই দুইএকবার দেখিয়াছে। ক্ষিতীশের জীবনের করুণ ইতিহাসটুকু সে সতীশের নিকট শুনিয়াছিল। সে উদারপ্রাণ ক্ষিতীশকে চিরদিন শ্রদ্ধা করে।

চোখে মুখে সজোরে জলের ঝাপটা দিতে দিতে সতীশের জ্ঞানসঞ্চার হইল। সে তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিল। ক্ষিতীশ

কহিল, "ভাই, তুমি একটু সুস্থ হও, আমি বরকর্ত্তাকে সমস্ত অবস্থা বুঝাইয়া আসি"—সতীশ কাতরস্বরে বলিয়া উঠিল, "আমি সে চেষ্টা করিয়া আসিয়াছি; সেখান হইতে 'মিথ্যাবাদী', 'জুয়াচোর' প্রভৃতি আখ্যা পাইয়া আসিয়াছি;—ক্ষিতীশ, এ অপমান, এ গ্লানি আর আমি সহ্য করিতে পারিতেছি না;—ভাই, এমন আর কিছুই অবশিষ্ট রাখি নাই, যাহা বিক্রয় করিয়া এই পণের টাকা এখনি সংগ্রহ করিতে পারি!—কি করিব?—না, কোনও উপায়ই নাই!"—সতীশ চুপ করিয়া কি ভাবিতে লাগিল, তাহার দীপ্ত দুইচক্ষে আবার কেমন একটা অস্বাভাবিক জ্যোতিঃ ফুটিয়া উঠিল!

ক্ষিতীশ কি ভাবিতেছিল। কক্ষে চতুর্থ ব্যক্তি আর কেহ ছিল না। সকলেই বাহিরের গোলের কারণ অনুসন্ধানে ব্যস্ত। ক্ষিতীশ তাহার দুইবাহু বক্ষসম্বদ্ধ করিয়া একবার উপরের দিকে চাহিল। তারপর দেখিল, অদূরে নীরদা দাঁড়াইয়া কাঁপিতেছে। ক্ষিতীশের হৃদয় বেদনায়, সহানুভূতিতে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। বক্ষসম্বদ্ধ বাহুর কাছে এমন একটা কিছু ছিল যাহা তাহার বাহুতে স্পৃষ্ট হইয়া তাহাকে তাহার মৃতা কন্যার কথা মনে করাইয়া দিল!

তখন ক্ষিতীশ নীরদার দিকে ফিরিয়া ধীরে ধীরে কহিল, "বৌদি, দরজাটা বন্ধ করিয়া আসুন ত!"—নীরদা দুয়ার বন্ধ করিয়া আসিল; যাহা তাহার বাহুতে স্পৃষ্ট হইয়াছিল, ক্ষিতীশ তাহা টানিয়া বাহির করিল। কি সে?—সেই নোটকেশটি! ধীরে ধীরে নোটকেশটি খুলিতে খুলিতে ক্ষিতীশ কহিল, "সতীশ, ভাই, আমার জীবনের সমস্ত ইতিহাসই ত তুমি জান; আজ একটু পূর্ব্বে বিবাহসভায় বসিয়া আমার স্বর্গীয়া কন্যার কথা চিন্তা করিতেছিলাম; আমি উন্মাদের মত এই নোটগুলি তাহার বিবাহব্যয়ের জন্য সংগ্রহ করিতাম,—আজ হইতে তোমার কন্যা সুষমাকেই আমি 'শতদল' বলিয়া মনে করিব।" ক্ষিতীশ

আর কথা বলিতে পারিল না ; তাহার বাষ্পবিকল কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হইয়া গেল। সতীশ দুইহাতে তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া কহিল, "ক্ষিতীশ! ভাই, ভাই! আমি সমস্ত জীবন ধরিয়া তোমার এই ঋণ পরিশোধ করিব!"—

এইবার নীরদা কথা কহিল, "ছিঃ! অমন কথা বলিও না, এ ঋণ শোধ করা যায় না ; অর্থের প্রতিদানে কি এই ঋণ পরিশোধ হয়?" ক্ষিতীশ একেবারে অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিল। সে ধীরে ধীরে কহিল, "না সতীশ, তুমি কাহারও কাছে আজিকার কথা প্রকাশও করিতে পারিবে না,—মনে থাকে যেন!" এমন সময়ে দুয়ারে আঘাত পড়িল।

সতীশের কনিষ্ঠ সুরেশ ডাকিল, "দাদা"—নীরদা তাহার অর্দ্ধাবগুণ্ঠনের মধ্য দিয়া ক্ষিতীশের মুখের দিকে চাহিল। ক্ষিতীশ কহিল, "দুয়ার খুলিয়া দাও, দিদি।" সুরেশ প্রবেশ করিয়া ব্যস্তভাবে কহিল, "দাদা, তুমি এখানে, ওদিকে যে মহাগোল বাধিয়াছে!"

ক্ষিতীশ ত্রস্তহস্তে নোটকেশটার মধ্য হইতে নোটগুলি বাহির করিল। তারপর সুরেশকে কহিল, "সুরেশ, এই নোটগুলির মধ্য হইতে প্রাপ্য পণ বারশত টাকা দিয়া আইস।" বিস্মিত সুরেশের তখন আর কৌতূহল নিবৃত্তি করিবার অবসর ছিল না ; সে নোট গণিয়া লইয়া ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল।

ক্ষিতীশ বাকী কয়েকখানি নোট টেবিলের উপর রাখিয়া নীরদার দিকে সরাইয়া দিয়া কহিল, "এই নোট কয়েকখানিও তুলিয়া রাখ, লক্ষ্মী দিদিটি আমার! কাল বাসীবিবাহের সময় বরকর্ত্তাকে আরও কিছু দক্ষিণা দিতে হইতে পারে!"

"আপনি কি দেবতা?" মৃদুকৃতজ্ঞতাপূর্ণ কণ্ঠে নীরদা কহিল। তারপর সে ভূতলে জানু পাতিয়া ক্ষিতীশের পায়ের কাছে প্রণাম

করিতে গেল,—ক্ষিতীশ ত্রস্তভাবে সরিয়া গেল! সতীশ রুদ্ধকণ্ঠে ডাকিল, "ক্ষিতীশ!"

তখন বাহিরে শঙ্খ ও উলুধ্বনি শুনা যাইতেছিল; আর ক্ষিতীশ সেই উজ্জ্বল বিবাহ সভার একপার্শ্বে দাঁড়াইয়া অন্য-মনস্কভাবে একদিকে চাহিয়াছিল। পুনরায় বুকের কাছ হইতে সে সেই নোটকেশটী বাহির করিয়া আনিয়াছিল; তারপর শতদলের কেশগুচ্ছ মুঠা করিয়া বুকের কাছে চাপিয়া ধরিয়া সে নিমেষশূন্য নয়নে কন্যাসম্প্রদান দেখিতেছিল। পুরোহিত জিজ্ঞাসা করিলেন, "কন্যার কোন্ নামে কার্য্য হইবে?" ভিতরবাড়ী হইতে বাহিরে আসিতে আসিতে কেহ উচ্চ কম্পিত কণ্ঠে কহিল,—"শতদল"—সকলে চাহিয়া দেখিল, সে সতীশ!

একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ক্ষিতীশের বক্ষপঞ্জর ভেদ করিয়া বাহির হইয়া আসিল। অন্তরের বিপুল আবেগে সে কাঁপিতেছিল।

* * * *

তিনদিন পরে নানাজাতীয় ফলে পরিপূর্ণ একটা চুব্‌ড়ি হাতে করিয়া ক্ষিতীশ নিজের গৃহে প্রবেশ করিল। দরজার পাশে সুকুমারী দণ্ডায়মানা ছিল। ক্ষিতীশ রুদ্ধ বাষ্পাকুল কণ্ঠে কহিল,—"সুকু, কন্যার বিবাহ দিয়া আসিলাম।" উভয়ে উভয়ের দিকে পূর্ণদৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিল, কাহারই চক্ষের জল শতচেষ্টা সত্ত্বেও বাধা মানিতেছে না।

কালো

১

নরেশ দুয়ারের কাছে আসিয়া একটু ইতস্ততঃ করিয়া ডাকিল, "কালো!"—কক্ষের মধ্য হইতে একজন দ্রুতপদে দুয়ারের কাছে আসিল।

যে আসিল, তাহার বয়স পনের বৎসরের কম নহে। পরিপুষ্ট দেহলতা যৌবন-শ্রীতে ভরিয়া উঠিয়াছে। মুখ খানি বড় সুন্দর; চক্ষু দুইটি বুদ্ধিতে উজ্জ্বল; হাসিলে কপোলে টোল খায়; ক্ষুদ্র ললাটের উপর অযত্ন-বিন্যস্ত চূর্ণ কুন্তলগুলি লতাইয়া নামিয়াছে।

কিন্তু তবু সে কালো; গৌরী নহে, উজ্জ্বল শ্যামাঙ্গী নহে,—কালো! মা ডাকিতেন, 'কালো'; বাবা ডাকিতেন, 'শ্যামা'। বিবাহের পর নরেশ কিন্তু 'কালো' নামটাই বজায় রাখিল। তবু তাহার একটা পোষাকী নাম ছিল, সেটা হইতেছে, 'উৎপল।'—কেহ বলিত, 'নীলোৎপল',—কিন্তু সে নাম একমাত্র বিবাহের মন্ত্রপাঠের সময় কাজে লাগিয়াছিল। ক্বচিৎ চিঠিপত্রের শিরোনামায়ও লেখা থাকিত।

নরেশ পত্নীকে দেখিয়া মৃদুস্বরে কহিল,—"এই, কি কচ্ছিস্ রে!"—

কালো একটু হাসিল; "ঘরে এসনা! কেউ শুনবে!"

নরেশ কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিল; কালো দুয়ার বন্ধ করিয়া কহিল, "কলেজ পালিয়েছ বুঝি?"

"যাঃ—পালাতে গেলাম কেন, একঘণ্টা ছুটী ছিল যে!"

কালো অবিশ্বাসের হাসি হাসিল। একটু অগ্রসর হইয়া

স্বামীর কণ্ঠবেষ্টন করিয়া মুখ তুলিয়া তাহার মুখের দিকে চাহিল, কহিল,—“কেন কলেজ পালিয়ে এসেছ, বল না ?”

নরেশ মধ্যে মধ্যে কলেজ হইতে চলিয়া আসিত,—কেন আসিত, তাহা কালো যেমন জানিত, তেমন আর কেহই জানিত না। নরেশ দুই আঙ্গুল দিয়া পত্নীর অধরোষ্ঠ টিপিয়া ধরিয়া একটু নাড়িয়া দিয়া কহিল, “সে আমার ইচ্ছে, তোর তা'তে কিরে রাক্ষসী !”

“আমি ‘কালো,’ রাক্ষসী নই !”

“বটে !”—নরেশ দুই হাতে কালোর মুখ তুলিয়া ধরিয়া তাহার ক্ষুদ্র ললাটে ওষ্ঠ স্পর্শ করিল ; কালো চক্ষু মুদ্রিত করিয়া সেই তপ্ত স্পর্শটুকু সম্পূর্ণরূপে অনুভব করিয়া লইল।

“চক্ষু বুজ্‌লি কেন রে কালো ?” ধরা পড়িয়া কালোর একটু লজ্জা করিতেছিল ; তাড়াতাড়ি বলিল,—

“কই !” তারপর ধীরে স্বামীর মুখের কাছে মুখ লইয়া গিয়া তাহার কপোলে ললাট স্পর্শ করাইল।

কালোর এই সরম-কুণ্ঠিত ভাবটুকু নরেশের বড় ভাল লাগিত। সে কোনও দিনই তাহার কাছ হইতে কিছু লুণ্ঠন করিয়া লইতে চাহে নাই। কালো তাহার নব-বধূ-সুলভ লজ্জার মধ্য দিয়া কুণ্ঠিত ভাবে তাহাকে যেটুকু প্রদান করিত, নরেশ তাহাই পাইয়া সুখী ও তৃপ্ত হইত। নরেশের বিশ্বাস ছিল, লজ্জার কুণ্ঠাটুকুই প্রেমকে নবীনতা প্রদান করে, সরস করিয়া তুলে।

“আজ কে এসেছে জান ?”

“কে ?”—কে আসিয়াছে, নরেশ জানিত না।

“দেখ্‌বে ?”

“কে আগে শুনি, দেখ্‌ব কিনা সে বিচার পরে কর্‌ব।”

“ভারি সুন্দর সে,—তেমন সুন্দর তুমি দেখনি !”

“কি জ্বালা ! সুন্দর কি কুৎসিত তা' ত আমি জান্‌তে চাইনি ! কে তাই‌ই জান্‌তে চাই !”

"যাও,—বল্‌ব না আমি!"—নরেশের কৌতূহল বাড়াইবার জন্য কালো প্রায়ই এমন করিত। নরেশ ইহার ঔষধ জানিত। সে অত্যন্ত উদাসীন ভাবে কহিল,—"মরুক্‌গে যে হোক্‌। ক্লাসের সময় হ'ল, যাই আমি এখন।" পকেট হইতে ঘড়ি টানিয়া তুলিয়া সময় দেখিয়া নরেশ উঠিতে গেল। কালো তাহাকে টানিয়া ধরিয়া কহিল, "না শোন তবে।" "না, আমার সময় নাই এখন।" কালো নরেশের উপর এক চাল দিয়া কহিল,—"তবে থাক্‌, সময় যখন হয়, শুন্‌বে!"

"তা বল না,—আমি কি নিষেধ কচ্ছি বল্‌তে?" এবার কালো হাসিয়া উঠিল,—কহিল, "তবে নাকি তুমি শুন্‌বে না?"—ধরা পড়িয়া নরেশও হাসিয়া উঠিল।

তখন কালো নরেশের গলা জড়াইয়া ধরিয়া কহিল, "তা খবরটা বল্‌লে তুমি কি দেবে আমায়?"

নরেশ দেখিল মুস্কিল, সে জোর করিয়া কালোকে কাছে টানিয়া আনিয়া বলিল,—"বল্‌, নইলে এখনি,—" "একটা চুমু খাব!" "না, খুন কর্‌ব!"

"ইঃ,—এমনি করে বুঝি খুন করে?"—নরেশের দৃঢ় আলিঙ্গনের মধ্যে কালো একেবারে আত্মসমর্পণ করিল। কি কথা হইতেছিল, উভয়ে ভুলিয়া গেল। কালোর বুকে মাথা রাখিয়া নরেশ তাহার বক্ষের গুরু স্পন্দন শুনিতেছিল, বুকের মধ্যে বুঝি সমুদ্র উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতেছিল। নরেশ আপনাকে সেই সমুদ্রমধ্যে ডুবাইয়া দিতে চাহিল।

হঠাৎ নরেশ কহিল,—"দূর ছাই, কলেজে যেতে হবে সেটা যে একেবারেই ভুলে গেছি।" নরেশ কালোর মুখের দিকে চাহিয়া একটু হাসিল, তারপর কলেজে চলিয়া গেল। কালো জানালার কাছে আসিয়া একটা পাখি টানিয়া তুলিয়া যতক্ষণ দেখা যায় নরেশকে দেখিতে লাগিল। যখন আর দেখা গেল না, তখন

একটা চাপা নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া ফিরিয়া আসিল, এবং বাপের বাড়ী চিঠি লিখিতে বসিল।

২

সন্ধ্যার সময় নরেশ ফিরিয়া আসিয়া দেখিল, সত্যই বাড়ীতে কাহারা আসিয়াছে। নরেশ মার কাছে যাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কে, মা?" মা হাসিয়া কহিলেন, "কপাল আমার, চিনিস্‌নে তুই? তা চিন্‌বিই বা কেমন ক'রে? তোর মাসিমা যে!"

"সঙ্গের মেয়েটি?"

"ও তোর মাসিমার সইয়ের মেয়ে; ওর মা ম'রে যাবার সময় ওকে তোর মাসিমার হাতে সঁপে দিয়ে যায়; কেউ নাই ওর। আহা ভারি ভাল মেয়েটি।"

নরেশ একটু অন্যমনস্কভাবে কহিল, "তা মাসিমা হঠাৎ কি মনে করে এখানে এলেন মা?"

"আমিই ওকে কত ক'রে লিখে লিখে আনিয়েছি, শরীরটা ওর কিছুদিন থেকে বড় খারাপ হয়ে পড়েছে; মার পেটের পাঁচটি বোনের মধ্যে ত আমরা দু'জনেই শুধু আছি; তা ওর শরীরটাও যেমন খারাপ দেখ্‌ছি, কবে কি করে কে জানে? এবার ওকে আর একটু সুস্থ না হয়ে এখান থেকে যেতে দিচ্ছিনে।" নরেশ দেখিল, জননীর চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে।

সে তাড়াতাড়ি কহিল, "তা বেশ ত! এখানে কিছুদিন থেকে ওষুধ টষুদ খেলে ভাল হয়ে যাবেন।"—পদশব্দ পাইয়া নরেশ ফিরিয়া দেখিল, মাসিমা আসিতেছেন, সে তাঁহাকে তাড়াতাড়ি প্রণাম করিয়া পায়ের ধূলা গ্রহণ করিল।

মাসিমা স্মিতমুখে কহিলেন,—"এই যে নরু! তোমাকে সেবার এসে এই এতটুকু দেখে গেছি। তুমি ত বাবা, মাসিমাকে ভুলেই গেছ, বোধ হয়। তা মনে থাকবেই বা কেমন ক'রে!

কম দিন ত নয়,—তোমার দিদির বিয়ের সময় সেই যে এসেছিলাম, আর ত আসিনি! সে প্রায় ১৫।১৬ বৎসরের কথা হবে তখন তুমি পাঁচ বছরেরটি ছিলে!”

নরেশ একটু কুণ্ঠিত ভাবে হাসিতে হাসিতে কহিল,—“তা সত্যি মাসিমা, আমি তোমাকে মোটেই চিন্‌তে পারিনি—মার কাছে পরিচয় নিচ্ছিলাম তোমার!”

মাসিমা হাসিয়া স্নেহপূর্ণ স্বরে কহিলেন,—“তখন কিন্তু তুই মোটেই আমার কাছ ছাড়া হতিস্‌নে, আমি চলে যাবার দিন তোকে কিছুতেই ভুলাতে না পেরে, ঘুম পাড়িয়ে রেখে তবে পালিয়ে যাই!” অতীত দিনের কথাগুলি মনে করিয়া সেই স্নেহশালিনী নারীর চক্ষু অশ্রুসিক্ত হইয়া উঠিল!

দুয়ারের কাছ হইতে কেহ মৃদুকণ্ঠে ডাকিল—“মা”—

মাসিমা ডাকিলেন, “আয় প্রভা, তোর নরেশদাকে প্রণাম ক’রে যা!”

প্রভা ডাকিবার পূর্ব্বেই ঘরে ঢুকিয়া পড়িয়াছিল। নরেশকে সে লক্ষ্য করে নাই। মাসিমার কথা শুনিয়া চকিত ভাবে চাহিয়া নরেশকে দেখিল, একটু অপ্রতিভ ভাবে সে থমকিয়া দাঁড়াইল, একবার মনে করিল ফিরিয়া চলিয়া যাইবে।

কিন্তু সেটা ভারি বিশ্রী হইবে মনে করিয়া ধীরে ধীরে অগ্রসর হইল; নরেশকে প্রণাম করিয়া সে যখন পদধূলি গ্রহণ করিবার জন্য হাত বাড়াইল, তখন নরেশ একটু সরিয়া গেল। সে দেখিল, কালোর কথা সত্য; সত্যই প্রভা বড় সুন্দরী,—এমন সুন্দরী সে কখনও দেখে নাই। সে আর একবার প্রভার দিকে চাহিয়া মাসিমার মুখের দিকে চাহিল। মাসিমা চক্ষু টিপিয়া ইসারা করিলেন—অর্থাৎ প্রভা যে তাঁহার গর্ভজাত কন্যা নয়, এ পরিচয়টি প্রভার সম্মুখেই দিতে তিনি একটা বেদনা বোধ করিতেছিলেন।

"প্রভা, তোর বৌদির সঙ্গে আলাপ হ'ল?"

প্রভার সুন্দর মুখখানি উজ্জ্বল হইয়া উঠিল;—কালোর সঙ্গে যে তাহার শুধু আলাপই হয় নাই, তাহারা দুজনে নিজেদের মধ্যে এই কয়েক দণ্ডের আলাপেই যে একটা নিবিড় আন্তরিক সম্বন্ধ সুসংস্থাপিত করিয়া লইয়াছে, তাহা মনে করিয়া প্রভার ললাট, কপোল, অধর মৃদুহাস্যবিরঞ্জিত হইয়া উঠিল! সে ছোট একটি কথায় উত্তর দিল, "হাঁ, তাঁর কাছেই যাব আমি!"—

"তা' যাও; কিন্তু কি বল্‌তে এসেছিলে আমাকে?"—প্রভা বড় বিপদে পড়িল! সে ইতিমধ্যেই কালোর সহিত যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কটা পাতাইয়া লইয়াছে, তাহাই বলিবার জন্য যে সে মার কাছে আসিয়াছে, একথাটা নরেশের সাক্ষাতে কেমন করিয়া বলিবে? সে মাথা নীচু করিয়া ধীরে ধীরে কহিল,—"এমন কিছু নয় মা!"—মেয়ে ভারি বিপদে পড়িয়াছে, দেখিয়া তিনি একটু হাসিয়া কহিলেন, "আচ্ছা, যাও তুমি তোমার বৌদির কাছে!"—প্রভা চলিয়া গেল।

তখন তিনি নরেশের দিকে চাহিয়া কহিলেন, "ছেলেবেলা ওর মা আমার হাতে হাতে ওকে সঁপে দিয়ে স্বর্গে চলে যায়। আমি যে ওর মা নই, তাও ও ভাল ক'রে জানে না! মেয়েটা বড় ভাল; আনন্দ প্রতিমাখানির মত আমার সংসার উজ্জ্বল ক'রে রয়েছে!" কথা বলিতে বলিতে তাঁহার চক্ষু স্নেহাশ্রুতে পূর্ণ হইয়া উঠিল!

নরেশ কহিল, "তা' মাসিমা—তুমি যার মা,—সে ভাল না হবে কেন?" নরেশের মা কহিলেন, "ও নরেশ, তুই ত কিছু খাস্‌নি কলেজ থেকে এসে। হাত মুখ ধুয়ে আয়; আমি খাবার নিয়ে আসি; তোর মাসিমার সঙ্গে খেতে খেতে গল্প কর্‌বি এখন।"

নরেশ হাত মুখ ধুইতে চলিয়া গেল। মা কহিলেন, "ছেলে এত বড় হয়েছে, তবু আমি খাবার না দিলে ওর খাওয়া হয় না! বৌ দিতে এলেও মনঃপূত হয় না।" নরেশের মাসিমা হাসিতে

লাগিলেন। কহিলেন, "তা ছেলে তোমার ভাল হবে না কেন, দিদি? তোমারই ত রক্তমাংস, ওকি মন্দ হ'তে পারে?"

৩

প্রায় দুই মাস কাটিয়া গেল। স্রোত যতক্ষণ বাধা না পায় ততক্ষণ পর্য্যন্ত কোনও প্রকার আবর্ত্ত রচনা না করিয়া সহজ সরল গতিতে প্রবাহিত হইয়া থাকে। কিন্তু যখনই স্রোতের গমন-পথের সম্মুখে একটা বাধা আসিয়া পড়ে, তখনই সে উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠে, আবর্ত্ত রচনা করে; তাহার ফেনিল, কলমুখরিত জলকণারাশি একটা অন্ধ আবেগে ছুটিয়া বাহির হইতে চাহে; কিন্তু প্রতিহত হইয়া আবার সেই বাধাটার কাছেই ফিরিয়া আইসে। নরেশ কালোকে ভালবাসিত। তাহার প্রেমপ্রবাহ এতদিন কালোর দিকেই সহজ, সরল গতিতে ছুটিতেছিল। কালো, কালো;—তাহার কালোরূপ এতদিন নরেশের হৃদয় আলো করিয়াছিল। নরেশ বিচার করিয়া ভালবাসে নাই। তাই আজ যখন প্রভাতশুক্রতারা-রূপিণী প্রভা তাহার অনন্ত রূপরাশি লইয়া নরেশের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল, যেন তাহার অন্তরস্থিত সুপ্ত-রূপতৃষ্ণা একটু সাড়া দিয়া জাগিয়া উঠিতে চাহিল।

রূপ ও গুণ দুইটাকেই মানুষ-প্রকৃতি অন্তরে অন্তরে আকাঙ্ক্ষা করে। শুধু রূপ মানুষকে তৃপ্ত করিতে পারে না, সঙ্গে গুণও চাই। শুধু গুণ মানুষকে সুখী করিতে পারে; কিন্তু গুণের সহিত রূপকে সংযুক্ত করিয়া পাইবার আকাঙ্ক্ষাটাকে একেবারেই নষ্ট করিয়া দিতে পারে না। রূপটাই আগে চোখে পড়ে; রূপকে কাছে পাইলে ধীরে ধীরে গুণের দিকে দৃষ্টি পড়ে। গুণ চাই-ই; কিন্তু রূপও চাই। তাই রূপ ও গুণের একত্র সংযোগ হইলে সোণায় সোহাগা হয়। কালোর গুণ ছিল; কিন্তু যে রূপের স্নিগ্ধ-জ্যোতিঃ রূপতৃষ্ণাকে শান্ত করিতে পারে, সে ত তাহার ছিল না!

নরেশ বুঝিল, তাহার রূপতৃষ্ণা অতৃপ্ত রহিয়াছে; একথাটা সে এতদিন বুঝে নাই। আজ ভিতরে ভিতরে সে অনুভব করিল, নারীর সৌন্দর্য্য পুরুষের প্রকৃতির উপর কতটুকু প্রভাব বিস্তার করিতে পারে। তাহার অন্তরের মধ্যে একটা তীব্র অভাব-বোধ জাগিয়া উঠিতেছিল· সেই অভাব-বোধটাকে সে কোনও মতেই চাপিয়া রাখিতে পারিতেছিল না।

নরেশ কালোকে ভালবাসে;—সে তাহার গুণমুগ্ধ! রূপের খাতিরে সে তাহার প্রেমকে অপমান করিতে পারে না;—ক্ষুব্ধ করিতে পারে না। কালো তাহার ঘরের মধ্যে কি কাজে ব্যাপৃত ছিল। দ্রুত চঞ্চলপদে নরেশ কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া ডাকিল, "কালো"!—

কালো নরেশের বিকৃত কণ্ঠস্বর শুনিয়া চমকিয়া উঠিল। সে ফিরিয়া স্বামীর মুখের দিকে চক্ষু তুলিয়া চাহিল, কহিল,—"কি ও, তোমাকে অমন দেখাচ্ছে কেন?" কালো কাছে আসিল। স্বামীর হাত নিজের হাতের মধ্যে তুলিয়া লইয়া স্নেহ-পূর্ণস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "কি হয়েছে তোমার?"

ছাই রূপ! কালোর এমন নিবিড়, কোমল স্পর্শ যে লাভ করে, এমন একখানি সঙ্কোচব্যাকুল হৃদয় যাহাকে বেষ্টন করিয়া সকল আপদ হইতে দূরে রক্ষা করিতে চাহে, কি তুচ্ছ তাহার কাছে রূপের মোহ! নরেশ কালোকে আকর্ষণ করিয়া কাছে টানিয়া আনিল।

"আমার উপর তোর অভিমান হ'তে পারে এমন কিছু যদি তুই আমার মধ্যে পাস্, দেখিস্, তা'হলে অভিমান কর্‌বার আগে আমাকে একবার জিজ্ঞাসা ক'রে নিস্ কালো!" কথাটা বলিয়াই নরেশ কেমন অস্থিরভাবে দৃঢ় হস্তে কালোকে বুকের কাছে চাপিয়া ধরিল। কালো নরেশের কোনও কথাই বুঝিতে পারিল না। সে তাহার শঙ্কাচকিত দৃষ্টিটুকু মুহূর্ত্তের জন্য স্বামীর মুখের উপর স্থাপন

করিল, তারপর ধীরে ধীরে কহিল, "অসুখ করেছে তোমার? একটু বিশ্রাম করবে?—ইঃ কপালটা ভারি গরম হয়েছে যে!"—কালো ভারি ব্যস্ত হইয়া উঠিল। সে স্বামীকে এক প্রকার টানিয়াই শয্যার কাছে লইয়া গেল, কহিল, "শোও তুমি, তোমার মাথাটায় একটু হাত বুলিয়ে দি'।" নরেশ নিতান্ত অসহায় ভাবে শয্যার উপর শুইয়া পড়িল। কালো তাঁহার ললাটে ও চুলের মধ্যে হাত বুলাইয়া দিতে লাগিল।

২

আরও কিছুদিন কাটিল। নরেশের বুকের মধ্যে জোয়ার ভাঁটা চলিতেছিল। ভাঁটার টানে যখন তাহার অন্তরের পঙ্কিল দৈন্য ও দুর্ব্বলতার দাগগুলি বাহির হইয়া পড়িতে চাহিত, তখন সে একান্ত অস্থির হইয়া উঠিত। নিজের উপর কি কঠিন শাস্তির প্রয়োগ করিলে, অন্তরকে রূপতৃষ্ণা-বিমুখ করিয়া তুলিতে পারিবে, তাহাই সে অহরহ খুঁজিত। ফলে ভাঁটার টান ফিরিয়া দাঁড়াইত। তখন সে হঠাৎ উদ্দামবেগে কালোর উপর ঝাঁপাইয়া পড়িত। তাহাকে সময়ে অসময়ে তাহার দৃঢ় বাহুবেষ্টনীর মধ্যে টানিয়া লইয়া চুম্বনে চুম্বনে অস্থির করিয়া তুলিত! যত্নে, আদরে, সোহাগে কালোকে প্লাবিত করিয়া দিয়া অনুতপ্ত হৃদয়কে শান্ত করিতে চাহিত। স্বামীর এই উচ্ছ্বসিত আবেগ লক্ষ্য করিয়া সময়ে সময়ে একটা অনির্দ্দিষ্ট আশঙ্কায় কালোর অন্তর পীড়িত—ব্যথিত হইয়া উঠিত। সে আশঙ্কাটা যে কি, তাহা সে নিজেই ভাল করিয়া বুঝিতে পারিত না। নরেশকে জিজ্ঞাসা করিতে সাহস পাইত না।

সে দিন সন্ধ্যার পূর্ব্বে নরেশ খোলা বারান্দার উপর দিয়া নিজের কক্ষে প্রবেশ করিতেছিল; প্রভা আসিতেছিল, নরেশের সম্মুখে পড়িয়া সে কেমন সঙ্কুচিত হইয়া উঠিল। নরেশ তীব্র চঞ্চল দৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিল। রূপ দেখিবার মোহ লইয়া

মানুষ যেমন করিয়া চাহে, নরেশের দৃষ্টি তেমনি মুগ্ধ, তীব্র, চঞ্চল। সঙ্কুচিতা প্রভা মাথা নীচু করিয়া মাটির দিকে চাহিয়া থাকিয়াও অনুভব করিতেছিল, যে নরেশের তীব্রদৃষ্টি তাহার উপরেই নিবিষ্ট রহিয়াছে। প্রভা পাশ কাটাইয়া ধীরে ধীরে চলিয়া গেল। যন্ত্র-চালিতবৎ নরেশ মুখ ফিরাইয়া তাহার দিকে চাহিল; একটা মৃদু বায়ুপ্রবাহ প্রভার অঙ্গসুরভি-স্নিগ্ধ হইয়া নরেশের কাছ দিয়া ফিরিয়া গেল! নরেশের বুকের মধ্য হইতে একটা দ্রুত শোণিতোচ্ছ্বাস উঠিয়া আসিয়া বিদ্যুতের বেগে শিরায় শিরায় পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িল, তাহার সর্ব্বশরীর জলোচ্ছ্বাসের মত কাঁপাইয়া তুলিল। কম্পিত-পদে কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়াই নরেশ দেখিল, কালো তাহার টেবিল সাজাইতেছে! নরেশকে প্রবেশ করিতে দেখিয়া কালো তাহার মুখের দিকে চাহিল; নরেশের চক্ষুর সহিত চক্ষু মিলিত হইতেই চিরদিন যে হাসিটুকু তাহার মুখে ফুটিয়া উঠে, সেই মধুর হাসিটুকু কালোর মুখে ফুটিয়া উঠিল। তাহার নিবিড় দৃষ্টিটুকু বিশ্বাসে স্নিগ্ধ প্রীতিতে নন্দিত।

কিন্তু কালো নরেশের কাছ হইতে সেই হাসির প্রত্যুত্তর ত পাইল না! নরেশ হাসিতে পারিল না। এই মাত্র সে মুগ্ধ দৃষ্টিতে প্রভার উজ্জ্বল রূপ দেখিয়া আসিয়াছে; প্রভার অঙ্গ-সুরভিস্নিগ্ধ বায়ুপ্রবাহ এখনও তাহার কাছে কাছে ফিরিতেছিল; তাহার বক্ষের দ্রুত শোণিতোচ্ছ্বাস তখনও থামিয়া যায় নাই, সে কেমন করিয়া হাসিবে? কালোর অজ্ঞাতে সে কালোকে কেমন করিয়া এমন একটা অপমান করিবে? কালো দেখিল, নিমিষের মধ্যে নরেশের মুখ বেদনাতুরের মত কাতর হইয়া উঠিয়াছে, নরেশ একটা কিছু অবলম্বন করিয়া আশ্রয় পাইবার জন্য হাত বাড়াইয়া দিয়া দুই তিন পা অগ্রসর হইয়া গেল। কালো হাতের কাজ ফেলিয়া ছুটিয়া আসিল, আর কিছু হাতের কাছে পাইবার বহু পূর্ব্বেই নরেশ কালোর বুকের কাছেই আশ্রয় পাইল, এবং

তাহার উন্মাদ বাহুবেষ্টনীর মধ্যে সেই শঙ্কাচকিত নারীকেই টানিয়া লইল!

কালো জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি মাঝে মাঝে এমন হ'য়ে পড় কেন, তা' আজ আমাকে বল্‌তেই হবে! তোমার নিশ্চয়ই একটা ভারি অসুখ করেছে!"

নরেশ একটু চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল,—"না কালো, কিছু অসুখ করে নাই আমার"—

"না, অসুখ করেনি!—আমি ও কথা মোটেই মানিনা!—তোমার অসুখ হ'লে তোমার আগে আমি বুঝ্‌তে পারি! আমার মাথা খাও। তুমি একটু ওষুধ খাও!"—কালোর চোখে জল আসিতেছিল!

এবার নরেশ হাসিল, কহিল, "না, চুল সমেত তোমার অতবড় মাথাটা খাওয়া ত আমার কাজ নয়, কালো!"—একটু হাসিতে পারিয়া নরেশ বাঁচিয়া গেল!—

হাসি মানুষকে নির্ম্মল করে, পবিত্র করে! কালোও হাসিল। তাহার বুকের মধ্যে যেন একটা গুরুভার চাপিয়াছিল, তাহা কতকটা পাতলা হইয়া গেল! নরেশ না বুঝিতে পারে, এমন ভাবে ধীরে ধীরে নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া কহিল, "তা তোমার যদি অসুখ না করেছে, তা' হলে মাঝে মাঝে অমন হ'য়ে পড় কেন?"—

এ প্রশ্নের উত্তর নরেশ কি দিবে? একটি সরলা বালিকা, শিশুর বিশ্বাস ও নির্ভরশীলতা লইয়া, তাহার কণ্ঠলগ্ন থাকিয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া প্রশ্ন করিতেছে;—সে প্রশ্নের উত্তর সে কি দিবে? রূপের মোহ যে তাহাকে পলে পলে দণ্ডে দণ্ডে পুড়াইতেছে, তাহা সেই একান্ত নির্ভরশালিনী নারীকে কেমন করিয়া সে ভাঙ্গিয়া বলিবে? যে নারী সুখে ও দুঃখে, সমভাবেই তাহার মুখের দিকে নিশি-দিন তাহার শান্ত, প্রেমপূর্ণ

দৃষ্টিটুকু উৎসারিত* করিয়া রাখিয়াছে,—যে নারী তাহার কুসুমপেলব বাহুদ্বারা তাহারই কণ্ঠবেষ্টন করিয়া থাকিতে পাইলে, তাহার নারীজীবন সার্থক মনে করে,— বিপদে, সম্পদে যাহার স্নেহ-দৃষ্টি, ধ্রুবজ্যোতির মত তাহাকে চিরদিন অনুসরণ করিয়া আসিতেছে,—সেই নারীকে নরেশ কি উত্তর দিয়া বুঝাইবে?

অন্তরের মধ্যে একটা দুর্দ্দমনীয় আবেগ জাগিয়া উঠিতেছিল। মনে হইতেছিল, বিশ্ব-সংসারের মধ্যে শুধু এই একটি নারীই আছে, যাহার কাছে সে তাহার সমস্ত দৈন্য, দুর্ব্বলতা প্রকাশ করিয়া দেখাইতে পারে! এই নারীই তাহার সহধর্ম্মিণী; তাহার মর্ম্ম-ক্ষতের উপর শুধু এই নারীর স্নেহই প্রলেপের মত লাগিয়া থাকিতে পারে! ইহার কাছেই যদি আজ এই মুহূর্ত্তে সে তাহার অন্তরের গোপন দ্বারটি উদ্‌ঘাটিত করিয়া, তাহার বেদনাতুর মর্ম্মস্থল দেখাইয়া দিতে পারে;—সে যদি আজ ইহাকেই বুঝাইয়া বলিতে পারে যে, কি মোহ তাহাকে পাইয়া বসিয়াছে এবং কি জন্য সে নিশিদিন তাহার হৃদয়ের মধ্যে একটা বিপুল সংগ্রামকে জাগাইয়া রাখিয়াছে; বোধ হয়, তাহা হইলে সে এতটুকুও শান্তি পাইতে পারিত!

নরেশ কালোর মুখের দিকে চাহিল,—তাহার দৃষ্টি অন্তর বেদনায় ম্লান হইয়া উঠিয়াছে। কালোর নির্ম্মল, সুন্দর বিশ্বাস-দীপ্ত মুখখানির দিকে চাহিয়া নরেশ একটু দমিয়া গেল। যে কথাটা প্রকাশ করিয়া বলিয়া ফেলিবার জন্য সে নিজকে এতখানি প্রস্তুত করিয়া আনিতেছিল, সেই নিষ্ঠুর কথাটা, এই সরলা বালিকাকে যে একটা কত বড় আঘাত প্রদান করিবে, তাহাই মনে করিয়া নরেশ শিহরিয়া উঠিল, তারপর একটু অন্যমনস্ক ভাবে ধীরে ধীরে কহিল,—"না কালো, সত্যিই আমার কোন অসুখ করে নাই; মাঝে মাঝে আমি যেন কেমন হয়ে যাই, বুকটার মধ্যে বড় অস্থির হয়ে ওঠে,—শুধু এইটুকু,—এর বেশী আর কিছু নয়!

কালোর মুখ আবার মলিন হইয়া গেল,—সে কহিল, "এ বুঝি তোমার এইটুকু! আমি তোমার কোন কথাই শুন্‌চিনে! প্রভা ঠাকুরঝিকে দিয়ে আজই আমি মাকে বল্‌ব। আর আমি তোমায় এমন করে অসুখ চেপে রাখ্‌তে দেব না।"

কালোর মুখে প্রভার নাম শুনিয়া নরেশ চমকিয়া উঠিল। বুকের কাছে একটা অতর্কিত নিষ্ঠুর আঘাত পাইয়া তাহার মুখ একেবারে বিবর্ণ হইয়া গেল; সে অসহায় ভাবে বলিয়া উঠিল—"না কালো, কোন ওষুধই লাগ্‌বে না। তোমার নিরবচ্ছিন্ন সঙ্গ আমায় দিও, তা' হলেই আমি ভাল হয়ে উঠ্‌ব।"

দ্বারের কাছে প্রভা আসিয়া ডাকিল, "সই!"—

নরেশ যে কক্ষের মধ্যে আছে, প্রভা তাহা লক্ষ্য করে নাই। হঠাৎ দৃষ্টি পড়ায় সে সরিয়া যাইতেছিল, নরেশ অন্যদ্বার দিয়া দ্রুতপদে কক্ষ হইতে বাহির হইয়া গেল। নরেশ চলিয়া গেল দেখিয়া প্রভা আবার দুয়ারের কাছে আসিয়া হাসি মুখে ডাকিল,—"সই!"

কালোর কাণের কাছে স্বামীর কথাগুলি তখনও ব্যথিতের আর্ত্তনাদের মত বাজিতেছিল। সে কোনও উত্তর করিল না। শূন্য দৃষ্টিতে প্রভার মুখের দিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া রহিল! তারপর প্রভার হাত ধরিয়া টানিয়া তাহাকে কাছে বসাইয়া কহিল,—"ব'স্‌ কথা আছে!"

৫

সপ্তাহ পরে একদিন কালোর পিত্রালয় হইতে একজন প্রৌঢ় ভদ্রলোক কালোর পিতার গুরুতর পীড়ার সংবাদ লইয়া আসিলেন। কালোর পিত্রালয় পূর্ব্ববাঙ্গালার কোনও বর্দ্ধিষ্ণু গ্রামে। পীড়া গুরুতর; কালোকে পিতা দেখিতে চাহিয়াছেন। সুতরাং শাশুড়ীকে প্রণাম করিয়া, প্রভার নিকট হইতে সাশ্রু

নয়নে বিদায় লইয়া, কালো চলিয়া গেল। নরেশের কাছে বিদায় লইবার সময় সে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত তাহার বুকের কাছে মুখ লুকাইয়া কাঁদিল। কিছুদিনের জন্যও নরেশের সঙ্গ হইতে সে বিচ্ছিন্ন হইতে চলিয়াছে, তাই কালো বড় কাঁদিল। পিতার গুরুতর অসুখ মনে করিয়াও কাঁদিল। নরেশের কণ্ঠ আলিঙ্গন করিয়া সে কতবার বলিয়া গেল, "আমি যদি লিখি, তুমি কিন্তু একবার যেও সেখানে। তোমাকে দেখ্‌লে মা কত সুখী হবেন!"

নরেশের বুকের মধ্যে যে বিপুল সংগ্রাম চলিতেছিল, কালো তাহার কিছুই ত জানিত না। আজি কালোর সঙ্গ হইতে বিচ্ছিন্ন হইতে সে ভয় পাইতেছিল! কালোর বিরহ আজ আর তাহার কাছে শুধু বিরহই নহে!—কালোর যাওয়াটাকে সে যদি কোনও মতে রোধ করিতে পারিত, তাহা হইলে সে বোধ হয় বাঁচিয়া যাইত! কিন্তু তাহা ত সম্ভব নহে! নিজের মনটাকে একবার ভাল করিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিবার সাহসও আর তাহার ছিল না। মনটার মধ্যে ভারি বিশ্রী লাগিতেছিল। যতক্ষণ কালোর যাওয়ার আয়োজন হইতেছিল, ততক্ষণ সে অনাবশ্যক ভাবে একাজ ওকাজ করিতে লাগিল। একবার নিজের দেরাজটার মধ্য হইতে কতগুলি খাতা, কয়েকখানি ফটো বাহির করিয়া কালোর বাক্সের মধ্যে রাখিয়া আসিল। একটা পাথরের কৌটার মধ্যে কতকগুলি টাকা ও নোট, একটা আংটী রাখিল; তারপর কালোর অজ্ঞাতে তাহা তাহার ট্রাঙ্কের মধ্যে কাপড়ের ভাঁজের নীচে রাখিয়া আসিল। বাপের বাড়ী গেলে তাহার যে সব খুঁটিনাটি দ্রব্যের অভাব হইতে পারে, নরেশ তাহা মনে করিয়া একটা প্রকাণ্ড তালিকা করিল; তারপর বাজার হইতে সেগুলি কিনিয়া আনিয়া কালোর হাতবাক্সটা পূর্ণ করিয়া ফেলিল! দেখিয়া শুনিয়া কালোর চক্ষে জল আসিতেছিল, সে হাসিতে চেষ্টা করিয়া

কহিল, "কি হবে অত সব? তুমি যে ছ'মাসের চা'ল চিড়া বাঁধিয়া দিতেছ!"

নরেশ হাসিতে পারিল না। ম্লান মুখে কহিল, "কি জানি, কখন কি দরকার হয়! গ্রামে সব সময় সব পাওয়া যায় না ত!"—বলিয়াই মুখ ফিরাইয়া নরেশ চলিয়া গেল।

সর্ব্বশেষ মুহূর্ত্তে কালো যখন গাড়ীতে উঠিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া একবার ফাঁক খুঁজিয়া নরেশের কাছে তাহার কক্ষমধ্যে আসিল, তখন দেখিল, নরেশ ঊর্দ্ধমুখে ছাদের একটা কড়ির দিকে অন্যমনস্ক ভাবে চাহিয়া রহিয়াছে, তাহার চক্ষুর কোণে অশ্রু। ঈষৎযুক্ত হাত দুইখানা টেবিলের উপর শ্লথ ভাবে বিন্যস্ত রহিয়াছে! কালো কাছে আসিতেই সে একটু চমকিয়া উঠিয়া তাহার হাত ধরিয়া কাছে টানিয়া আনিল! তখন ম্লানস্বরে নরেশ কহিল, "তোমার যাওয়া বন্ধ করার সঙ্গত উপায় থাক্‌লে আমি তোমায় যেতে দিতাম না, কালো!"—একটু চুপ করিয়া থাকিয়া অপেক্ষাকৃত অস্পষ্ট স্বরে আবার কহিল,—"তুমি আমায় চিঠি লিখো কালো—রোজ একখানা,—নইলে, মনে হয় যেন আমি বড় দুর্ব্বল হ'য়ে পড়্‌ব!" চক্ষের জল মুছিয়া কালো যখন কক্ষ হইতে বাহির হইয়া আসিল, তখন তাহার পিত্রালয়ে যাওয়ার ইচ্ছা ও উৎসাহ আর এতটুকুও ছিল না। কিন্তু তবু তাহাকে যাইতে হইল। যখন কালোর গাড়ী দৃষ্টির বহির্ভূত হইয়া চলিয়া গেল, নরেশ স্বীয় নির্ম্মল শয্যার উপর লুটাইয়া পড়িল।

৬

কয়েক দিন কাটিয়া গেল। কালো চলিয়া যাইবার পর হইতে কিছুদিন পর্য্যন্ত নরেশ অত্যন্ত উন্মনা হইয়া রহিল। সে সময়ে স্নান করেনা, আহার করেনা। বাড়ীর মধ্যে সব সময় থাকে না। কলেজের কাজ বাড়িয়াছে, বলিয়া সময়ে অসময়ে বাড়ী হইতে

বাহির হইয়া পড়ে। যখন ফিরিয়া আসে, তখন তাহার মুখ শুষ্ক, দৃষ্টি চঞ্চল ও বেদনা-কাতর বলিয়া মনে হয়। বেশের পারিপাট্য আর নাই, চুলগুলি উচ্ছৃঙ্খল, ময়লা সার্টের উপর পরিষ্কার উড়ানী টানিয়া নিয়াও সময়ে অসময়ে রাস্তায় বাহির হইয়া পড়ে। পূর্ব্বে অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত জাগিয়া পড়াশুনা করিত, এখন সন্ধ্যার পর গৃহে ফিরিয়া আসিয়াই কোন দিন কিছু খাইয়া, কোন দিন কিছু না খাইয়া, শুইয়া পড়ে।

জননী দেখিয়া শুনিয়া উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলেন। সিদ্ধান্ত করিলেন, বধূ কাছে নাই বলিয়াই ছেলে এমন উন্মনা হইয়া উঠিয়াছে। কালো যখন এখানে থাকিত, তখন সেই নরেশের শুইবার ঘরটী সাজাইত গুছাইত; তাহার প্রত্যেক খুঁটিনাটি কাজগুলি কালো যেমন গুছাইয়া করিতে পারে, জননী মনে করিতেন, এমন আর কেহই পারে না! এক খাওয়ান ছাড়া ছেলের অন্যান্য কাজগুলি একে একে বধূর হাতেই ছাড়িয়া দিয়া তিনি নিশ্চিন্ত হইয়াছিলেন। কালো চলিয়া যাওয়ার পর হইতে ছেলের উন্মনা ভাব লক্ষ্য করিয়া জননী ব্যথিত হইয়া উঠিলেন।

কি করিলে ছেলে কষ্ট না পায়, ইহাই তাঁহার একমাত্র কর্ত্তব্য হইয়া পড়িল। সব কাজ গুলিই তিনি স্বহস্তে গুছাইয়া করিতে চাহিতেন; কিন্তু তবু মনে করিতেন, তেমনটি হইতেছে না। বধূ যেমন করিয়া নিপুণ হস্তে নরেশের সেবা যত্ন করিতে পারিত, তিনি সহস্র চেষ্টা করিয়াও যেন তেমনটি পারিতেছেন না। ছেলের শুষ্কমুখ ও উন্মনা ভাব দূর হইল না।

একদিন প্রভাকে ডাকিয়া কহিলেন, "দেখ মা! বৌর মত আমি ত ছেলের যত্ন করিতে পারি না; ছেলের মুখের দিকে যে আর চাওয়া যায় না! ওর বোধ হয় খুব কষ্ট হচ্ছে, আহা বাছা আমার বৌ ছেড়ে কোনও দিন থাকেনা ত! তা' মা, তোরা যেমনটি গুছাইয়া পারিস্, আমি বুড়ো মানুষ কেমন করে তা

পার্‌ব ? বৌ যতদিন না আসে তুই নরেশকে একটু দেখিস্‌, আমার ছেলের ভাবনায় ঘুম হয় না মা ! এই কয় দিনেই বাছার আমার চেহারা কেমন হয়ে গেছে !”

প্রভা নতমুখে টিপি টিপি হাসিতেছিল। নরেশের মার কথা শেষ হইলে কহিল, “তা মাসিমা, সইয়ের মত গুছিয়ে কাজ কর্ত্তে কে পার্‌বে মাসিমা ?”

মাসিমা স্নেহরুদ্ধ কণ্ঠে কহিলেন, “সত্যি মা, কালোর গুণের অন্ত নাই, অমন লক্ষ্মী বউ অনেক তপস্যার ফলে ঘরে আসে।” এমন সময় নরেশের মাসিমা কাছে আসিলেন, কহিলেন, “কি কথা হচ্ছে তোমাদের দিদি ?”

“বৌ চলে যাওয়ার পর থেকে নরেশ বড় কেমন হয়ে পড়্‌ছে ; বোধ হয়, ওর তেমন যত্ন হয় না ; আমি বুড়ো মানুষ সব কি বুঝ্‌তে পারি ? তাই প্রভাকে বল্‌ছিলাম, নরেশের খুঁটিনাটি কাজ গুলো ও করে রাখে।”

“দিদির যে কথা, যত্ন কম হচ্ছে বলে কি ছেলে অমন হচ্ছে ? তুমি যা কর, ছেলের জন্য কর,—বৌ হাজার কর্‌লেও তেমনটী হতেই পারে না। তোমার ছেলে বৌয়ের মধ্যে বিয়ের পর থেকে ত আর তেমন ছাড়াছাড়ি হয় নাই, বৌ চলে যাওয়াতেই ও অমন হয়েছে। তা কিছুদিন পরেই শুধরে যাবে।”

“না সুখু, ওর তেমন যত্ন হচ্ছে না।” ভগিনী সুখদা হাসিতে লাগিলেন, “ছেলের টানে দিদির বুদ্ধি লোপ পেয়েছে, তা প্রভা, তুই নরেশের কাজগুলি সব বুঝে করে রাখিস্‌ ত ! বৌকে ত কতদিন কাজ কর্ত্তে দেখেছিস্‌ ; পার্‌বি ত ?”

প্রভা মৃদু হাসিয়া কহিল, “তা পার্‌ব কিনা কে জানে ? সইয়ের মত অমন সুন্দর করে কাজ করা কি সকলের কাজ মা ?”

নরেশের মা বধূর প্রশংসা শুনিয়া কহিলেন, “সত্যি, বউ

যেন দশহাতে কাজ করে, আমি অমনটি আর দেখিনি। এখন শীগ্‌গীর বাড়ী এলেই বেঁচে যাই! বাপের অসুখ না হয়ে পড়্‌লে আমি ওকে কখনই ছেলের কাছ ছাড়া কর্‌তাম না।”

৭

পরদিন কলেজ হইতে ফিরিয়া আসিয়া নরেশ দেখিল তাহার ঘরটি সাজান গুছান রহিয়াছে। যেখানে যে জিনিষটী কালো যেমন করিয়া রাখিত, সেই জিনিষটি সেখানে ঠিক তেমনই করিয়া রক্ষিত হইয়াছে। কালো চলিয়া যাওয়ার পর সে চেয়ারটা টেবিলের কাছ হইতে টানিয়া নিয়া জানালার কাছে রাখিয়াছিল, সে চেয়ারটা পুনরায় টেবিলের কাছে আনিয়া রাখা হইয়াছে। জানালার কাছে অন্য আর একখানি স্থাপন করা হইয়াছে। টেবিলের উপরের বইগুলি, খাটের নীচের জুতাগুলি, দেওয়ালের গায়ের আয়নাখানি, চিরুণীখানি, চিঠির কাগজগুলি, খামগুলি যথাস্থানে রক্ষিত হইয়াছে। ছবিগুলি ঝাড়িয়া, আল্‌নায় কাপড়গুলি গুছাইয়া, ওয়ালল্যাম্পের চিম্‌নীর কালিটা মুছিয়া ঠিক করিয়া কে রাখিয়াছে।

নরেশ চাহিয়া চাহিয়া দেখিল, যে এ কাজগুলি করিয়াছে তাহার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি কিছুই এড়ায় নাই। তাহার প্রথম মনে হইল, কালো বুঝি দুপুরের গাড়ীতে ফিরিয়া আসিয়াছে। কিন্তু তাহা তাহার সম্ভব মনে হইল না। কালো যদি আসিত, তাহা হইলে সে তাহার কলেজ হইতে ফিরিবার সময় কক্ষ হইতে অন্যস্থানে থাকিত না। নরেশের বুকের মধ্যে কালো আসিয়াছে মনে করিয়া যে একটা চঞ্চল শোণিতোচ্ছ্বাস তালে তালে নাচিয়া উঠিয়াছিল, তাহা মৃদুতর হইয়া আসিল।

এমন সময়ে দরজার কাছে একটু শব্দ হইল। নরেশ চমকিয়া উঠিয়া চাহিয়া দেখিল। সে ভাবিয়াছিল, বুঝি কালো

আসিল। কিন্তু শব্দটা বড় মৃদু, কালো আসিলে ত ছুটিয়া আসিত! এ তবে কে? নরেশ চকিত নয়নে চাহিয়া দেখিল —কালো নহে,—প্রভা!

শোণিতোচ্ছ্বাসটা বুকের মধ্যে আবার দ্রুততর তালে নাচিয়া উঠিল! টেবিলের কাছে সরিয়া দাঁড়াইয়া সে একখানা মোটা বই টানিয়া লইয়া দু' একটা পাতা উল্টাইয়া সেই দিকেই চাহিয়া রহিল।

প্রভা নরেশকে দেখে নাই; টেবিলের দিকে না চাহিয়া সে বিছানার কাছে চলিয়া গেল; একখানা ছোট "টিপয়" টানিয়া আনিয়া তাহার উপর একটা পানের ডিবা ও একগ্লাস জল রাখিল। তারপর টেবিলের দিকে ফিরিয়াই দেখিল, নরেশ অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। তখন সে তাড়াতাড়ি কক্ষ হইতে বাহির হইয়া গেল। পদশব্দ পাইয়া চক্ষু তুলিয়া চাহিতেই নরেশ দেখিল, প্রভা চলিয়া যাইতেছে। তাহার লজ্জারাগ-রঞ্জিত সুগৌর মুখখানির উপর খোলা জানালার পথে মায়াতুলিকার স্পর্শের মত সূর্য্যের শেষ রশ্মি আসিয়া লাগিয়াছে। পুষ্পস্তবক-নম্র লতিকাটির মত তাহার রূপ! জ্যোৎস্নাপরিস্নাত-স্ফুটনোন্মুখ-পঙ্কজিনী-কোরক-তুল্য তাহার লাবণ্য!

প্রভা চলিয়া গেলে পরও নরেশ সেই টেবিলের কাছেই অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত দাঁড়াইয়া কাঁপিতে লাগিল। তারপর চেয়ার টানিয়া বসিতে যাইয়াই টেবিলের উপরস্থিত একখানি ছবির উপর তাহার দৃষ্টি পড়িল। সে কম্পিতহস্তে ছবিখানি টানিয়া আনিল। একখানি ছুরির বাঁটের আঘাতে কাঁচখানা চূর্ণ করিয়া ফেলিয়া ছবিখানা মুখের উপর চাপিয়া ধরিয়া উন্মাদের মত চুম্বনে চুম্বনে আচ্ছন্ন করিয়া দিল। ছবিখনি কালোর! প্রভা দেরাজের মধ্য হইতে বাহির করিয়া আনিয়া টেবিলের উপর বসাইয়া রাখিয়াছিল।

তার পর নরেশ কি ভাবিয়া কালি কলম ও কাগজ লইয়া কালোর কাছে চিঠি লিখিতে বসিল। কয়েক লাইন লিখিয়া কাটিল,—আবার লিখিল; লিখিয়া পড়িল, তারপর ছিঁড়িয়া ফেলিল। আবার নূতন কাগজ লইয়া লিখিল। লিখিয়া মনোমত হইল না বলিয়া আবার ছিঁড়িয়া ফেলিল। তখন কলম ফেলিয়া দিয়া দুই হাতের মধ্যে মুখ ঢাকিয়া অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত কাঁদিল। তারপর আবার কালোর ছবি টানিয়া লইয়া দুইহাতে বুকের কাছে জড়াইয়া ধরিল। নরেশের বুকের মধ্যে বড় কেমন করিতেছিল। প্রভা তাহার হৃদয়ে কতখানি স্থান অধিকার করিয়াছে, তাহা বুঝিয়া সে শিহরিয়া উঠিল! সে যে কতদিন কালোর কাণে কাণে বলিয়াছে, যে সে তাহাকে কত ভালবাসে, সে কি নরেশ তাহাকে মিথ্যা কথা বলিয়াছে? কত-দিন তাহার চক্ষুতে চক্ষু মিলাইয়া সে তাহার অন্তর পাঠ করিতে চাহিয়াছে; কালো বেশীক্ষণ চাহিতে পারে নাই, সে হঠাৎ চক্ষু মুদ্রিত করিয়াছে, অথবা কণ্ঠলগ্ন হইয়া কপোলে সিন্দূর-শোভিত ললাটস্পর্শ দিয়া তাহাকে অস্থির করিয়া তুলিতে চাহিয়াছে। হায় এত প্রেম, এই আকর্ষণ, এই আগ্রহ—সব কি মিথ্যা? না, —কেন মিথ্যা হইবে?—কি সেই প্রভা, যাহার রূপ কালোর প্রেমকেও প্লাবিত করিয়া ডুবাইয়া দিতে পারে? তুচ্ছ প্রভা,—তুচ্ছ তাহার রূপ! নরেশ আবার চিঠির কাগজ টানিয়া লইল, আবার খুঁজিয়া কলম তুলিয়া লইল। আবার লিখিল,—

"কালো তুমি আমারই,—তুমি আমারই! আর কেহই আমার কাছে তোমার চেয়ে বড় নয়। তোমাকে ছাড়া আর আমার দিন কাটে না। তুমি এস, হে আমার অন্তরের লক্ষ্মী হে আমার প্রিয়তমা, তুমি, এস, এস"!—

চিঠি শেষ হইল, তখন রাত্রি নয়টা,—তখনই ট্রাম ধরিয়া নরেশ ষ্টেশনে আসিল, এবং লেট ফি দিয়া গাড়ীতে চিঠি দিয়া

গেল! চিঠি দিবার পূর্ব্বে গাড়ীর পাশের অন্ধকারে মুখ সরাইয়া আনিয়া চিঠির শিরোনামটির উপর একবার তাহার উষ্ণ কম্পিতাধর স্থাপন করিল।

৮

সপ্তাহ পরে একদিন শনিবারের সন্ধ্যায় নরেশ গৃহে ফিরিতেছিল। সেদিন একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখকের একখানি নূতন বহি বাহির হইয়াছে। বড় বড় অক্ষরে ছাপান বিজ্ঞাপনগুলি ক্রমাগতই তাহার দৃষ্টির সম্মুখে পড়িতেছিল। হঠাৎ একটা বহির দোকানের কাছে আসিয়া নরেশ একটু কি ভাবিল। তারপর দোকানের মধ্যে প্রবেশ করিয়া একখানি বহি কিনিয়া আবার রাস্তায় বাহির হইয়া পড়িল। কলিকাতার রাস্তায় বিপুল জনতারাশি ভেদ করিয়া সে যখন দ্রুতবেগে গৃহে ফিরিয়া আসিতেছিল, তখন তাহার আর কোনও দিকেই লক্ষ্য ছিল না! প্রভাকে একটা কিছু উপহার প্রদান করিবার জন্য একটা অদম্য আকাঙ্ক্ষা অনেক দিন হইতে তাহার অন্তর মধ্যে জাগিয়া উঠিতেছিল!

রূপকথার রাজকন্যার মত অলক্ষ্যে থাকিয়া, প্রভা যে তাহার সকল কাজই করিয়া রাখে, তাহার ঘরখানিকে গুছাইয়া সাজাইয়া রাখে, এজন্য নরেশের মনে হইত, যেন, প্রভার কাছে তাহার একটা কৃতজ্ঞতার ঋণ আছে। সে ঋণটা কোনও প্রকারে শোধ করাও চলে না; অথচ সে যে সেই ঋণটাকে অন্তরে অন্তরে স্বীকার করিয়া লইয়াছে, একথাটাও না জানাইতে পারিয়া সে কোনও মতেই শান্তি পাইতেছিল না। দিনের পর দিন এই ঋণভারটা বাড়িয়া উঠিয়া যেন তাহাকে একেবারে চাপিয়া ধরিতেছিল!

আজ বহিখানি কিনিয়া বাসায় ফিরিয়া আসিয়া সে যখন টেবিলের কাছে বসিল, তখন একটা অতি মৃদুল পুলকাবেগে তাহার বুকটা একটু স্পন্দিত হইয়া উঠিতেছিল! উপহার পৃষ্ঠার উপর

সে যখন প্রভার নামাক্ষরগুলি সযত্নে লিখিয়া শেষ করিল, তখন লেখাটার দিকে চাহিয়া চাহিয়া, তাহার কেবলই মনে হইতে লাগিল, যে নামটি যেন উপহার পৃষ্ঠাটিকে আলোকিত করিয়া রহিয়াছে। হায়, সমস্ত হৃদয় ঢালিয়া দিয়াও সে ঐ নামাক্ষর-গুলিকে যদি সচেতন করিয়া তুলিতে পারিত!

টেবিলের উপরের আলোটা টিপয়ের উপর আনিয়া রাখিয়া নরেশ যখন শুইয়া পড়িল, তখন রাত্রি প্রায় একটা। কলিকাতার কর্ম্মকোলাহল প্রায় থামিয়া গিয়াছ। ক্বচিৎ দুই একটা মাতালের উচ্চ অসম্বদ্ধ চীৎকার শুনা যাইতেছে। মধ্যে মধ্যে দু একখানা ঘোড়ার গাড়ী আসিতেছে, যাইতেছে। দূরের একটা বাড়ীতে কে হার্ম্মোনিয়াম বাজাইতেছিল,—এখন তাহা থামিয়া গিয়াছে। নাট্যশালা-প্রত্যাগত যুবকদলের উচ্চহাস্য মধ্যে মধ্যে শুনা যাইতে-ছিল। নরেশের কাণের কাছে শব্দগুলি অর্থহীন ভাবে ভাসিয়া বেড়াইতেছিল!

চিন্তার সীমা নাই; সেই চিন্তার কেন্দ্রে প্রভা তাহার অনন্ত-রূপ লইয়া যেন নিমেষশূন্য নয়নে তাহারই মুখের দিকে চাহিয়া রহিয়াছে। রূপমুগ্ধ নরেশ চক্ষু মুদ্রিত করিয়া সেই রূপ ধ্যান করিতেছিল;—কি সেই মুখখানি!—চূর্ণ কুন্তলগুলি ললাটের উপর উড়িয়া উড়িয়া পড়িয়াছে; যেন একটি প্রফুল্ল পঙ্কজের উপর শ্যাম শৈবালদল জড়াইয়া রহিয়াছে। ফুল্লরক্তপুষ্প-পুটতুল্য স্ফুরিতা-ধর যেন তাহার দিকেই উদ্যত হইয়া রহিয়াছে;—না,—প্রভার মুখের ছায়ায় ছায়ায় এ যে বড় সুন্দর আর একখানি মুখ—কখন তাহার মুখের কাছে সরিয়া আসিয়াছে; চিরপরিচিত একটি সূক্ষ্ম রসপূর্ণ অধর তাহার ওষ্ঠ ছুঁইয়া, একটু মৃদু হাসিয়া গভীর প্রেমপূর্ণ দৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া প্রভার মুখখানির পাশ দিয়া পিছনের ছায়ায় মিশাইয়া গেল! স্বপ্নে, জাগরণে, এমনই নিবিড়, কোমল প্রেমস্পর্শ নরেশকে আর কে দিতে পারিয়াছে!

হঠাৎ নরেশ উন্মাদের মত শয্যার উপর উঠিয়া বসিয়া ডাকিল —"কালো—কালো !"—

নরেশ চক্ষু খুলিয়া দেখিল, অনেকক্ষণ রাত্রি প্রভাত হইয়াছে। প্রভাত-সূর্য্যের খানিকটা আলো খোলা জানালার পথে ঘরের মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছে। নরেশ যে কখন ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল, তাহা তাহার মনে নাই! নিদ্রাভঙ্গের পর মনটা সে বড় ক্লান্ত বোধ করিতেছিল। প্রভার মুখখানি তখনও মনে পড়িতেছিল;— কালোর সেই চুম্বনস্পর্শ-লোলুপ ওষ্ঠপুট তাহার অন্তরের উপর দিয়া একটা বেদনাময় দাগ কাটিয়া দিয়া গিয়াছিল! তাহার স্বপ্নাভিসারমুগ্ধ অন্তরের কাছে কালোর সেই চুম্বনোন্মত ওষ্ঠপুট, সেই গভীর দৃষ্টি, সেই বিশ্বাসস্নিগ্ধ হাসিটুকু, কখন আসিয়া পড়িয়া এমনি একটি আঘাত করিয়া গিয়াছে, যাহার বেদনার অনুভূতি আজিকার এই তরুণ প্রভাতের কোমল আলোক-লেখার মধ্যেও তাহার সমগ্র হৃদয়খানিকে আচ্ছন্ন করিয়া তুলিতেছিল!

এমন সময়ে পিওন চিঠি দিয়া গেল। কালোর চিঠি আসিয়াছিল, নরেশ চিঠি লইয়া তাহার ঘরে প্রবেশ করিল। খুলিয়া পড়িল, কালো লিখিয়াছে,—

"হে আমার প্রিয়তম! 'কালো যে তোমারই'—এটা এমন কিছু নূতন খবর নয় ত! কালোর কাছে এইটাই সব চেয়ে বড় সত্যকথা যে, কালো তোমারি;—আর তুমি, হে প্রিয়, হে প্রিয়তম,—তুমি কালোরই!"

নরেশ চেয়ারের উপর বসিয়া পড়িয়া দুইহাতে মুখ ঢাকিয়া কাঁদিতে লাগিল। অশ্রু তাহার অন্তরের দহনকে কতটুকু শান্ত করিতে পারিবে, নরেশ জানিত না! কালোর চিঠিখানি নরেশের চোখের জলে ভিজিয়া গেল। কতক্ষণ পরে একবার মুখ তুলিতেই তাহার দৃষ্টি গত রজনীর পুস্তকখানির উপর পড়িল। তখন নরেশ দ্রুতহস্তে পুস্তকখানি টানিয়া লইয়া তাহার উপহার পৃষ্ঠাটা ছিঁড়িয়া

ফেলিল ;—এবং পৃষ্ঠাটা মুঠা করিয়া পাকাইয়া ঘরের এক কোণে ফেলিয়া দিল !

সেই দিনই বিকালের গাড়ীতে নরেশ পূর্ব্বাঞ্চলে কালোর পিত্রালয়ের উদ্দেশে যাত্রা করিল ! আজ আর সে নিজেকে কোনমতেই বিশ্বাস করিতে পারিতেছিল না। নরেশ ভাবিল —সংসারের সব চেয়ে কালোই তাহার নিকটতর। দিনে দিনে, পলে পলে, সে যে আগুনে পুড়িয়া ছাই হইতেছে, শুধু কালোই সে আগুন নিভাইবার শক্তি রাখে ! সে মরিবে, তবু কালোর কাছে অন্তরেও অবিশ্বাসী হইতে পারিবে না !

৯

নরেশ সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে শ্বশুরালয়ে আসিয়া পৌঁছিল।

শ্বশুর হরিহর বাবুর অসুখ এক ভাবেই আছে ; ডাক্তার কবিরাজ সর্ব্বদা দেখিতেছেন, কিন্তু তিনি যে এ যাত্রা সারিয়া উঠিবেন, এমন আশা নাই।

রাত্রি প্রায় এগারটা ; ছোট একটি কক্ষের মধ্যে নরেশ একখানা চেয়ারের উপর অন্যমনস্কভাবে বসিয়াছিল ; এমন সময়ে কালোর বৌঠান্ চারু কালোকে দরজার কাছ পর্য্যন্ত পৌছাইয়া দিতে আসিল। নরেশকে অন্যমনস্কভাবে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া মৃদুস্বরে চারু কহিল, "কি ধ্যানমগ্ন নাকি ?"

নরেশ একটু চমকাইয়া উঠিল ; সে ইহাদের প্রবেশ লক্ষ্য করে নাই—ধীরে ধীরে কহিল, "তা আর কি করা যায় বৌদি ! ধ্যান না কর্‌লে তো আর দেবীর সাক্ষাৎ মেলে না।" চারু হাসিয়া কহিল, "তা এই যে দেবী একেবারে সাক্ষাৎ উপস্থিত, এখন বর প্রার্থনা করুন।"

" ও ত দেবীর সঙ্গিনী, জয়া কি বিজয়া একটা কিছু"—

"ডাকিনী যোগিনী নয় ত, দেখ্‌বেন সাবধান"—

"তা স্বয়ং দেবী যদি অভয় দিয়ে যান, ডাকিনী যোগিনীকে ভয় করি নে"—

চারু কালোকে টিপিয়া কহিল, "কি ঠাকুরঝি, তবে যে বলিস্, উনি সাত চড়ে কথা কন্ না!"—

কালো মুখ টিপিয়া টিপিয়া হাসিতেছিল; কহিল,—"বটে, কবে আমি তোকে এমন কথা বলেছিরে!"

"তা তুই তো এখন তোর কর্ত্তার পক্ষই টান্‌বি;—কাল হ'বে কাল,—ওগো মশাই,—এ জয়া নয়, বিজয়া নয়, এ ম'শায়েরই কালো,—রইলেন এখানে, এখন বুঝে পড়ে নিন্।"—

"তা আপনি চল্‌লেন নাকি?"—

"যাবনা ত দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মহাশয়ের মুন্নি কুড়ুব?"—

"কোথায় যাচ্ছেন,—চোর ধর্‌তে নাকি?"

"না চোর আটকে রেখে যাচ্ছি; ঠাকুরঝি সাবধানে থাকিস্, চোর যেন হাতছাড়া না হয়, পালাতে চায় তো জড়িয়ে ধরিস্! শিকল টানিয়া দিয়া চারু হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেল।

কালো ভিতর হইতে দরজায় খিল আঁটিয়া দিয়া নরেশের কাছে আসিয়া সাদরে তাহার কণ্ঠবেষ্টন করিয়া কহিল,—

"কি ভাব্‌ছ?"—

"ভারি দুষ্টু কিন্তু তোমার বৌঠান্‌টী!" কালো স্নেহ-তরলকণ্ঠে কহিল, "কপাল ভাল তাই অমন বৌঠান্ পেয়েছি! এমন করে ভালবাস্‌তে আর কেউ পারে না! ওকে ছেড়ে যেতে আমার ভারি কষ্ট হবে কিন্তু!"—কালোর দৃষ্টি ব্যথায় ম্লান হইয়া আসিল! নরেশ তাহাকে কি বলিয়া সান্ত্বনা দিবে বুঝিতে পারিল না; কালোর চুলের একটা গুচ্ছা লইয়া আঙ্গুলে জড়াইতে লাগিল! হঠাৎ কালোর দৃষ্টি টেবিলের উপরিস্থিত একখানি বইয়ের উপর পড়িল। "কি বই ওখানা?"—কালো জিজ্ঞাসা করিয়াই হাত বাড়াইয়া বইখানি টানিয়া আনিল।

কালোকে কাছে-পাইয়া নরেশ সব ভুলিয়া গিয়াছিল। সে প্রভার কথা ভুলিয়াছিল,—তাহার অন্তর বেদনা, নিমেষহীন দহন ভুলিয়াছিল! তন্দ্রার প্রথমাবস্থায় সে যেন একটা বড় সুখময় স্বপ্ন দেখিতে আরম্ভ করিয়াছিল। কালোর প্রশ্ন শুনিয়া হঠাৎ সে স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল! নরেশ একটু চমকিয়া উঠিয়া কালোর দিকে চাহিল; কালো ততক্ষণ বহির পাতা উল্টাইতে আরম্ভ করিয়াছিল। অর্থহীন দৃষ্টিতে নরেশ তাহার মুখের দিকে চাহিল। কালো দেখিল, মলাটের পরের প্রথম পাতাটাই কে ছিঁড়িয়া ফেলিয়াছে,—তাহার পর পৃষ্ঠাতেই এক কোণে ক্ষুদ্র দু'টি অক্ষরে "কালো"র নামটি লিখিত, এবং তাহার নীচে তারিখ দেওয়া রহিয়াছে।

কালোর মুখখানা একটু উজ্জ্বল হইয়া উঠিল,—"বই খানার এমন দুর্দ্দশা কে করেছে?"

দুর্দ্দশা কে করিয়াছে! প্রশ্নটার উত্তর পাওয়ার পরই যে আর একটা প্রশ্ন হইবে, নরেশ সেই দ্বিতীয় প্রশ্নটির উত্তর কি দিবে ঠিক করিতে পারিল না! কালোর দিকে একটু ঝুঁকিয়া পড়িয়া নরেশ বই খানার চারি পাঁচটা পাতা উল্টাইয়া গেল; একটা ছোট কবিতা বাহির করিয়া দেখাইয়া কহিল, "এই কবিতাটা আমার ভারি ভাল লেগেছে, পড় ত, তুমি!"

কালো স্বামীর ব্যস্ততাটুকু লক্ষ্য করিতে পারিল না। কবিতাটি পড়িয়া শেষ করিল! বই বন্ধ করিয়া কালো কহিল, "বেশ কবিতাটি।"

নরেশ কালোর অঞ্চলের একটা খুঁট আঙ্গুলে জড়াইতে জড়াইতে এক একবার অন্যমনস্কভাবে তাহার মুখের দিকে চাহিতেছিল! শিশিরস্নিগ্ধ অপরাজিতাটির মত নির্ম্মল, সুন্দর মুখখানি! মুখের দিকে চাহিলেই সেই মুখখানির অধিকারীকে ভাল না বাসিয়া পারা যায় না। বিশ্বাসস্নিগ্ধ শান্ত দৃষ্টিটুকুর মধ্যে একটি নির্ভরশীলতার ভাব ফুটিয়া রহিয়াছে। সে তাহার

সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিয়া দিয়া যেন পরম নিশ্চিন্ত হইয়াছে। লতিকা বুঝিয়াছে, আশ্রয়তরুকে একান্তভাবে বেষ্টন করিয়া ধরার মধ্যেই তাহার জীবনের সর্ব্বসার্থকতা।

নরেশ কোনও কথার উত্তর না করিয়া তাহার মুখের দিকেই চাহিয়া রহিয়াছে দেখিয়া কালো কহিল, "তোমার হয়েছে কি ? ভাল ক'রে কথা কচ্ছনা যে ? শুধু মুখের দিকেই চেয়ে রয়েছ,—ভাবছ বুঝি, কি কালোরে !"

নরেশ একটু হাসিয়া কহিল, "তা' ও কালো মুখখানার দিকে কবেই না এমনি করে চেয়েছি ?"

স্বামীর হৃদয়ে তাহার জন্য যে একটি গভীর স্নেহ সঞ্চিত রহিয়াছে, তাহার পরিচয় কালো বহুবার পাইয়াছে।

কালো একটু হাসিয়া অপাঙ্গদৃষ্টিতে নরেশের মুখের দিকে চাহিয়া কোমল স্বরে কহিল, "তুমি কি আমায় না ভালবেসে পার ?"

"কেন পার্‌ব না ?"—নরেশের বুকের মধ্যে কোথায় একটা খোঁচা লাগিতেছিল !

"ইঃ—তা পার না !"—চক্ষু ঘুরাইয়া কালো কহিল।

"কেন ?"—

"আমি যে তোমায় ভালবাসি !"

তুমি আমায় খুব বেশী ভালবাস নাকি, কালো ?"—নরেশের স্বর গভীর হইয়া আসিতেছিল !

"ওমা কথার শ্রী দেখ ! স্বামীকে ভালবাসে না, এমন কোন্ অবাগী আছে গো ?"—

কালোর মুখের উপর দিয়া একটি নির্ম্মল প্রীতিপূর্ণ কৌতুক-লেখা ক্রীড়া করিতেছিল।

"তা' কালো স্ত্রীরা ভালবাস্‌লেই কি সব স্বামীরা তাদের স্ত্রীদের ভালবাসে ?"—কালো নরেশকে তাহার বিশ্বাসের অটল ভিত্তির

উপর প্রতিষ্ঠিত রাখিয়া নিশ্চিন্ত ছিল, আর সে যে সেই ভিত্তি ভূমিটিকে দুই পায়ে দলন করিয়া নামিয়া আসিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছে, এই কথা মনে করিয়া নরেশ কোনও মতেই নিজের মনের মধ্যে শান্তি পাইত না। সুতরাং নরেশের প্রতি কালোর যে অবিচল, সহজ প্রেম, সেই প্রেমের পরিচয়টিকে নিজের কাছেই আজি আবার নূতন করিয়া ধরিয়া নিজেকে লজ্জিত, পীড়িত করিতে চাহিতেছিল! যে অন্তর কালোর কাছে অবিশ্বাসী হইতে চাহে, সে তাহাকে কোন মতেই ক্ষমা করিতে পারে না ত! কালো স্বামীর প্রশ্ন শুনিয়া তাহার মুখের দিকে চাহিল, —কহিল, "তা আর বাসে না! আমি কালো, কুৎসিত তবু ত তুমি আমায় কত ভালবাস!"

অনুতাপের তীব্র কশাঘাতে নরেশের মর্ম্মস্থল ক্ষত বিক্ষত হইতেছিল! সে একটু থামিয়া, একটু ঢোক গিলিয়া, অপ্রতিভ-ভাবে কহিল, "তা আমি বাসি বলে কি সবাই বাসে?"

কথাটা বলিয়া ফেলিয়াই নরেশ ভাবিল, ভারি বিশ্রী বলা হইয়া গেল! কালো,—কালো, কুৎসিত, তবু সে তাহাকে ভালবাসে, কথাটার মধ্যে এমনি একটা পুরুষোচিত গর্ব্ব ছিল!

কিন্তু যাহাকে বলা গেল, সে কথাটা কি ভাবে গ্রহণ করিল, বুঝিবার জন্য নরেশ কালোর মুখের দিকে চাহিল! দেখিল, সেই শিশুর মত সরল মুখ খানিতে, সন্দেহ নাই, বিরক্তি নাই, অবিশ্বাস নাই!—আছে শুধু একটি চিরনির্ম্মল প্রীতির পরিপূর্ণ উচ্ছ্বাস!

হঠাৎ কি কথা মনে পড়ায় কালোর মুখখানি উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, সে কহিল, "বাসে বই কি;—তবে আজ আর কাল!—আচ্ছা শোন তবে, তার প্রমাণ আমি তোমায় দিচ্ছি!"—

"কি তোমার প্রমাণ কালো?"

"আমার সই বিন্দুকে তোমার মনে আছে? ওই যে—"

বাধা দিয়া নরেশ কহিল, "মনে আছে বই কি!—বিন্দু,—তার অতুলের সঙ্গে বে' হয়েছে ত?"

কালো উৎসাহের সঙ্গে কহিল,—"হাঁ, তা অতুল বাবু আমার সইকে নাকি ভালবাস্তেন না।—সই আমায় ব'লে কত দুঃখু কর্ত।"

"এতে কি প্রমাণ হ'ল?—"

"সবটা বল্তেই দাও!—আমি তাকে বলেছিলাম যে 'তা হতেই পারে না, স্ত্রী যদি স্বামীকে ভালবাসে, তা হ'লে স্বামীও স্ত্রীকে ভালবাস্বেই! এ না বেসেই পারে না'!"

"হুঁ—তারপর!"—নরেশ একটু অন্যমনস্ক হইয়া পড়িতেছিল।

"আমি সইকে বলে দিয়েছিলাম—'তুই চুপ করে তোর স্বামীকে ভালবাস্তেই থাক্, এমন একদিন আস্বেই, যেদিন তিনি নিজ থেকেই তোকে তাঁর অন্তরের ভালবাসা জানাবেন!'—দেখ আমার কথা ঠিক কি না! সেদিন বিন্দুর সঙ্গে দেখা হয়েছিল, তার মুখে আর হাসি ধরে না,—অতুল বাবু ত এখন আমার সইকে ছাড়া থাক্তেই পারেন না! এত এক জন্মের কথা নয়, এ যে কত জন্মজন্মান্তরের সম্পর্ক,—ভালবাসা!—এ ভালবাস্তেই হবে!"

নরেশের মাথার মধ্যে দপ্ দপ্ করিতে লাগিল! কি জ্বলন্ত বিশ্বাস, কি অনন্ত নির্ভরশীলতা এই বাঙ্গালীর বধূকুলের! কালোর সই বিন্দুর মুখে হাসি ছিল না, সে মুখে হাসি ফুটিয়াছে! আর কালোর মুখের হাসি সে কি মুছিয়া দিবে? সে কি এমনই নিষ্ঠুর? এমনই পাষাণ? টেবিলের উপর হাতের কনুইটা স্থাপন করিয়া হাতের মুঠির উপর সে তাহার মস্তক ভার রক্ষা করিল! হঠাৎ স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া কালো দেখিল, তাহার দৃষ্টি ম্লান, ও মুখখানি বেদনাতুর হইয়া উঠিয়াছে!

কালো ব্যস্তভাবে কহিল, "ওকি! তুমি অমন কচ্ছ কেন?"

"আমার মাথাটার ভিতর ভারি কেমন কচ্ছে!"

"বাতাস দেব?— মাথাটা একটু টিপে দেব?"

—"দাও।"—

নরেশ উঠিয়া গিয়া শয্যার উপর অবসন্ন ভাবে শুইয়া পড়িল!

১০

কালোর পিতার অসুখ কমিল না, উত্তরোত্তর বাড়িয়াই চলিল। নরেশের ছুটি ছিল না; তবু কিছুদিন কলেজ বন্ধ করিয়া কালোর কাছে রহিয়া গেল। ইচ্ছা ছিল, কালোকে সঙ্গে নিয়া কলিকাতা ফিরিবে। কিন্তু শ্বশুরের অসুখ না কমাতে কার্য্যতঃ তাহা ঘটিয়া উঠিল না। আর কলেজে অনুপস্থিত থাকা চলে না, সুতরাং নরেশকে বাধ্য হইয়া কলিকাতা ফিরিবার জন্য প্রস্তুত হইতে হইল!

কালোর নিবিড় সঙ্গস্মৃতিই এখন তাহার একমাত্র অবলম্বন; সে তাহাই বুকে করিয়া কলিকাতায় চলিয়া আসিল! যে কয়দিন সে কালোর কাছে ছিল, সে কয়দিন সে নিশিদিন নিরবচ্ছিন্ন ভাবেই তাহার সঙ্গে মিশিয়াছে; সময়ে অসময়ে কালোর চোখে চোখে দৃষ্টি মিশাইয়া, তাহার কপোলে কপোলস্পর্শ দিয়া, ললাটে ওষ্ঠ ছোঁয়াইয়া, চূর্ণ কুন্তল পাখার বাতাসে উড়াইয়া, কণ্ঠ আলিঙ্গন করিয়া, কাণে কাণে একটি চারি অক্ষরের কথা বারংবার কহিয়া, কাজে অকাজে ডাকাডাকি করিয়া, সে কালোকে প্লাবিত করিয়া দিয়াছে! সে এমনি করিয়া তাহার অপরাধ ভুলিতে চাহিয়াছে! এমনই করিয়া একটা স্মৃতির স্তূপ বুকের মধ্যে বহন করিয়া লইয়া যাইতে চাহিয়াছে, এমনই করিয়া সে চাহিয়াছে, যে কালোকে যেন কিছুতেই ভুলিয়া যাওয়া না চলে!—তাহার অন্তরের গোপন বিদ্রোহের উপর এমনই করিয়া একটা বিরাট্

লজ্জার আবরণ টানিয়া দিতে চাহিয়াছে! কালোর নিবিড় স্মৃতির কাছে তাহার রূপতৃষ্ণা যাহাতে তুচ্ছ হইয়া যায়, উপহাসাস্পদ হইয়া উঠে, সে কেবল তাহাই চাহিয়াছে! কালোর কাছে তাহার ঋণের ও দায়িত্বের মাত্রাটাকে সে ক্রমাগতই বাড়াইয়া তুলিয়াছে, এই অপরিশোধ্য ঋণের মধ্যে নিজেকে জড়াইয়া রাখিয়া যে আর কোন মতেই সঞ্চয়ের দিকে যাওয়া চলে না, এটা সে নিজের অন্তরের কাছে একটি সত্যরূপে প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিতেছিল! চারিদিকের আঁটঘাট বাঁধিয়া সে কালোর প্রাপ্য সম্পদকে রক্ষা করিবার জন্য উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছিল!

কলিকাতায় আসিয়া দিন কয়েক বেশ কাটিয়া গেল। হঠাৎ একদিন নরেশের মাসীমা বড় পীড়িত হইয়া পড়িলেন। তাঁহার বেদনার ব্যারাম ছিল। সেদিন বড় বেশী জোরে বেদনা উঠিল। তিনি বড় কাতর হইয়া পড়িলেন। কলিকাতার অনেক বিখ্যাত কবিরাজ ডাক্তার দেখিলেন, কেহই আশার কথা বলিলেন না। কিন্তু আশা না থাকিলেও মানুষ আশা ছাড়ে না। নরেশ ভাবিল, কোনও মতে যদি মাসীমাকে বাঁচাইয়া তোলা যায়! সুতরাং সে চিকিৎসার কোনও ত্রুটি রাখিল না, এবং নিজেই শুশ্রূষার ভার গ্রহণ করিল। প্রভা কিছুই ভাবিতে পারিতেছিল না, অথবা সবই ভাবিয়াছিল; সুতরাং কাঁদিয়া আকুল হইল। কেহ প্রভা বলিয়া ডাকিলেই সে চকিতভাবে একবার তাহার অশ্রুপূর্ণ আয়ত চক্ষু দুটি তাহার মুখের উপর স্থাপন করিত; তারপরই দৃষ্টি নত করিয়া, অঞ্চলে চক্ষু ঢাকিয়া, নিতান্ত অসহায় ভাবে কাঁদিতে থাকিত! সে আহার ভুলিল, নিদ্রা ভুলিল! মার শিয়রে, মার মুখের দিকে চাহিয়া, দিনরাত সমান ভাবে বসিয়া রহিল! মধ্যে মধ্যে পীড়িতার মুখের কাছে মুখ দিয়া অশ্রুজড়িত কণ্ঠে ডাকিয়া উঠিত, "মা—মাগো!——"

তাহার এই শিশুর মত অসহায় ভাবটি যে দেখিত, তাহারই

চক্ষু ভিজিয়া উঠিত! তাহার এই আকুল আহ্বান শুনিয়া রোগিণীর নয়নপ্রান্ত হইতে অশ্রুধারা নামিয়া আসিত! তিনি নীরবে প্রভাকে তাঁহার রোগদুর্ব্বল বাহুবেষ্টনীর মধ্যে টানিয়া আনিতেন। মুখের উপর হইতে রুক্ষ চূর্ণ কুন্তলগুলি অতিকষ্টে সরাইয়া দিয়া ক্লান্তদৃষ্টিতে সেই অশ্রুমুখী বালিকার দিকে চাহিয়া থাকিতেন! ভাবিতেন এবার বুঝি সেই অচেনা দেশের আহ্বান আসিয়াছে! কেমন দেশ সে, যেখানে এই স্নেহময়ী বালিকাকে ছাড়িয়া যাইয়া থাকিতে হইবে! তাঁহার জীবনের নিষ্ঠ তপশ্চর্য্যার মাঝখানে এই মুগ্ধ সরল হরিণ শিশুটি আসিয়া পড়িয়া তাঁহাকে সহস্র মায়ার ডুরি দিয়া বাঁধিয়াছে!—এ ডুরি যে ছিন্ন করা চলে না! ওই হরিণ শিশুর কালো চক্ষুর অশ্রুধারা দুইটি তাঁহাকে মৃত্যুর পথেও যেন অমৃতের ধারার মত অনুসরণ করিতে চাহিতেছে!

ওই যে মৃত্যুর চিররহস্যাবৃত অন্ধকার যবনিকা রহিয়া রহিয়া দুলিতেছে, এই চক্ষু দুইটির আকুল স্নেহপূর্ণ দৃষ্টিটুকু কি ওই অন্ধ যবনিকা ভেদ করিতে পারে না? এই যে অন্তর ব্যথায় ক্ষুব্ধ, কাতর হইয়া উঠিতেছে, এই যে সব দেনা পাওনার হিসাব চুকাইয়া ফেলিবার মুহূর্ত্তেও অশ্রু বাধা মানিতে চাহিতেছে না, এ কেন?—ওগো, এমনটা হয় কেন?

মাসীমার এই ব্যারাম উপলক্ষে নরেশ প্রভাকে কয়দিন পর্য্যন্ত নিশিদিন একেবারে কাছে কাছেই দেখিতেছিল। এতদিন প্রভার রূপ নীরবে তাহাকে আকর্ষণ করিতেছিল! এখন সে প্রভার অন্তরস্থিত মহামহিমময়ী নারী মূর্ত্তিটি দেখিয়া বিস্মিত, পুলকিত হইয়া উঠিয়াছিল। তাহার অন্তর-সৌন্দর্য্য যেন তাহার বাহিরের রূপকেও পরিম্লান করিয়া তুলিয়াছিল!

নরেশ মরিল! একদিন সে নিজের হৃদয়ের দিকে চাহিয়া দেখিয়া শিহরিয়া উঠিল! অনন্তরূপশালিনী প্রভার তরুণ সুগৌর

মুখখানি তাহার হৃদয় মধ্যে কালোর স্মৃতিকেও ম্লান করিয়া আবার জাগিয়া উঠিয়াছে! সে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া কালোর মুখখানি মনে আনিতে চেষ্টা করিল;—কালো আসিল, তেমনই হাস্যমুখী, তেমনই আনন্দচঞ্চল! তাহার প্রেমস্রাবী দৃষ্টিটুকু উৎসারিত করিয়া সে তেমনি নরেশের মুখের দিকে নিমেষশূন্য নয়নে চাহিয়া রহিয়াছে। তাহার সর্ব্বস্ব! রসপূর্ণ স্ফুরিতাধরে যেন নরেশেরই সোহাগচিহ্ন প্রোজ্জ্বল হইয়া রহিয়াছে! কালো আসিয়া তাহাকে ডাকিতেছে,—"ওগো প্রিয় হে কালোর সর্ব্বস্ব! তুমি এস এস—কালোর নিবিড় ভুজবন্ধনে এস; কালোর হৃদয়ে এস!"—

কিন্তু সে যে কালোর অজ্ঞাতে আর একজনকেও তাহার হৃদয়ের পাশে স্থান দিয়া বসিয়াছে, কালো তাহা না জানা পর্য্যন্ত সে কেমন করিয়া কালোর নিবিড় ভুজবন্ধনের মধ্যে ধরা দিবে?

নরেশ মুখ ফিরাইল; তখন কালো আরও কাছে সরিয়া আসিল। বেদনার্ত্তের কাতরকণ্ঠে ডাকিল,—"ওগো এস, ওগো ওঠ!"—নরেশ ফিরিল না, উঠিল না, কথা কহিল না। তাহার অন্তর উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতেছিল; চক্ষে অশ্রুধারা নামিয়া আসিতেছিল!

কালো তাহাকে ডাকিতেছে;—তাহার স্বপ্নের সুখ, কল্পনার শান্তি, অন্তরের আনন্দ, মর্ম্মক্ষতের প্রলেপ, চিন্তার বিরাম, কালো!—সেই কালো;—যাহার বুকের উপর মাথা রাখিয়া সে বুকের মধ্যে সমুদ্রগর্জ্জন শুনিয়াছে;—যাহার বক্ষতটে আশ্রয় পাইয়া সে ব্যথা ভুলিয়াছে, জ্বালা জুড়াইয়াছে সেই কালো,—তাহার সঙ্গিনী কালো,—সহধর্ম্মিণী কালো!

কালো তাহাকে ডাকিতেছে; তবু সে মুখ ফিরাইল না! কালোকে বুকের কাছে টানিয়া আনিয়া, তাহার অশ্রু মুছাইয়া

দিল না! হায় কেন দিল না? কেন দিতেছে না? কালোর কাছে অভিমান? কি অপরাধ কালোর? তবু কালো কাছে আসিল; তাহাকে স্পর্শ করিয়া আবার কাতর কণ্ঠে ডাকিল—"ওগো এস, ওগো ওঠ!"—বিদ্যুতের স্পর্শের মত সে স্পর্শ তাহার শিরায় শিরায়, ধমনীতে ধমনীতে, আনন্দ, পুলক সঞ্চারিত করিয়া দিল!—তাহার সর্ব্ব শরীর একবার স্পন্দিত হইয়া উঠিল; তারপর সে হঠাৎ ফিরিয়া সজোরে কালোর হাত ধরিয়া অনুতপ্তের আকুল কণ্ঠে ডাকিয়া উঠিল, "কালো, কালো!"—

নরেশ চাহিয়া দেখিল, এক বেপথুমতী নারী, তাহারই দিকে শঙ্কাচকিত দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিয়াছে! স্রস্ত কুন্তলদাম তাহার পরম সুন্দর মুখখানির পাশে উড়িয়া পড়িয়াছে। সে যে পরম শুভ্র কোমল হাতখানি চাপিয়া ধরিয়াছিল, সেই হাতখানি স্বেদসিক্ত হইয়া উঠিয়া, তাহারই হাতের মুঠার মধ্যে রহিয়া রহিয়া কাঁপিতেছিল!

স্বপ্নের মোহ কাটিয়া গেলে, নরেশ দেখিল, এ তাহার কালো নহে;—এ প্রভা!—প্রভা তাহাকে ডাকিতে আসিয়াছিল। সে তাহার মরণাহতা মাতার মুখে যে ছবি দেখিয়া আসিয়াছে, তাহাতে আর লজ্জা, দ্বিধা, সঙ্কোচ করিবার অবসর ছিল না। সে যখন নরেশকে ডাকিয়া সাড়া পাইল না, তখন কম্পিত পদে কাছে আসিয়া তাহার বাহুমূল স্পর্শ করিল!

নরেশ দেখিল প্রভা; তখন সে হাত ছাড়িয়া দিল। প্রভা কম্পিত মৃদুকণ্ঠে কহিল, "মা যে কেমন হয়ে পড়েছেন, একবারটি উঠুন আপনি!"

নরেশ বিদ্যুৎ-স্পৃষ্টের মত চেয়ার ছাড়িয়া উঠিল; মাতালের মত অস্থির পদে রোগিণীর শয্যাপার্শ্বে ছুটিয়া গেল! তখন রোগিণীর রোগযাতনা শান্ত হইয়া আসিয়াছে! মুখশ্রীর উপর দিয়া

একটি গাঢ় পাণ্ডুর আভা ধীরে ধীরে জাগিয়া উঠিতেছে!—নরেশ মুখের কাছে নীচু হইয়া ডাকিল,—"মাসী মা!"—

প্রভা দ্রুতপদে কাছে আসিল। শয্যাপার্শ্বে বসিয়া মুখের কাছে ঝুঁকিয়া পড়িয়া আর্ত্তস্বরে ডাকিল,—"মা, মাগো!"—প্রভাকে বুকের কাছে টানিয়া লইবার একটা নিষ্ফল চেষ্টা দেখা গেল; তারপর শিথিল হস্তে নরেশের হাত ধরিয়া অস্পষ্ট জড়িত স্বরে তিনি কহিলেন,—"নরেশ, তুই প্রভাকে ভালবাসিস্ আমি তা' জেনেছি! বেঁচে থাক্‌লে ওকে আর কারু হাতে দিতাম্! কিন্তু সে সময় নাই ত! ওকে কারু হাতে না দিয়ে গেলে আমার মরণেও শান্তি হবে না;—কালো অসুখী হবে না, নরু! তার ছোট বোন্‌টি হয়ে তার পায়ের তলে থাক্‌বার যোগ্যতা ওর আছে বলেই আজ মরার সময়ও এ সাহস কর্‌লাম!"—একটু চুপ করিয়া থাকিয়া আবার কহিলেন—"প্রভার হাত ধর্ নরু, ওকে গ্রহণ কর্; আমায় মর্‌তে দে!"

নরেশের কম্পিত হস্তের মধ্যে প্রভার হাতখানি যখন মাসীমা ধীরে ধীরে তুলিয়া দিলেন, তখন নরেশ বাণাহতের মত চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল,—"মাসীমা, মাসীমা, এ তুমি কি কর্‌লে!" রোগিণীর দৃষ্টি তখন স্থির হইয়া আসিতেছিল, তবু একটু ম্লান হাসির রেখা বুঝি সেই মরণাহত পাণ্ডুর মুখখানির উপর ফুটিয়া উঠিল! প্রভা মার বুকের উপর লুটাইয়া কাঁদিয়া উঠিল, "মাগো,—ওমা,—মাগো আমার!"—

তখন সব শেষ হইয়া গিয়াছে!

১১

চারুর ঘরে বসিয়া কালো চারুর চুল বাঁধিয়া দিতেছিল। একটু আগে চারু কালোর চুল বাঁধিয়া দিয়াছে! চারু কহিল, "নে ছাড়্! তোর আর বাঁধা শেষই হয় না!"

কালো চারুর দীর্ঘ বেণীটী ধরিয়া একটু টান দিয়া কহিল, “কেন, এখন এমন কেন? আমার বেলা যে দু ঘণ্টা লাগিয়েছিলি!” চারু একটু মুখ টিপিয়া হাসিয়া কহিল, “তোর বয়স আছে, সোহাগও আছে; আমি বুড়ো মাগী, আমার এসব কি হবে না?” “ই-রে! খুব বুড়ী হয়েছিস্ বুঝি! কেন দাদা বলেছে নাকি?” “কাউকে বল্‌তে হবে কেন লো? আমি নিজেই বুঝি।” গম্ভীরভাবে কথা কয়টা বলিয়াই চারু হাসিয়া ফেলিল। এই সময়ে কালো চুল বাঁধিয়া শেষ করিয়াছিল। আর্‌সিখানা চারুর সম্মুখে ধরিয়া কহিল, “দেখ্‌ত, কেমন সুন্দর মুখখানি!” তারপর আরসি ফেলিয়া দুই হাতে চারুর মুখখানি তুলিয়া ধরিল! কিছুকাল একদৃষ্টিতে চারুর স্ফুটনোন্মুখ পঙ্কজতুল্য মুখখানির দিকে চাহিয়া থাকিয়া কহিল, “দেখ্, তোর মুখখানা দেখ্‌লে আমার মধ্যে মধ্যে ভারি হিংসা হয়।”

দুষ্ট চারু কহিল, “কেন তোর দাদাটীকে আমল করে ফেলেছি বলে নাকি?”

কালো চারুর গালে ধাঁ করিয়া একটা ঠোনা মারিয়া কহিল, “আর এমন বল্‌বি, রাক্ষসী!”

চারু হাসিতে হাসিতে কহিল, “তবে এ পোড়া মুখ দেখ্‌লে হিংসা হবে কেন লো?”

কালোর হাসি বন্ধ হইয়া গেল, ধীরে ধীরে কহিল, “যখনই ভাবি আমি এমন কুৎসিত, এমন কালো, তখনই মনে হয় স্বামীর অমন মুখখানির পাশে তোর মুখের মত অম্‌নি একখানি মুখ যদি দেখ্‌তাম, তা'হলে বুঝি আমার সব দুঃখ ঘুচে যেত।”

“তোর কিন্তু বাপু সবই অদ্ভুত!”

“না বৌঠান্, স্বামীর সুখের চেয়ে কি বড় থাক্‌তে পারে? তিনি যদি সুখী হন, আমি সব সহ্য কর্‌তে পারি!”

চারু আর হাসিল না। কালোর ভাব দেখিয়া যেন তাহার

বুকের মধ্যে কেমন করিতেছিল! চারু কহিল, "কেন, তিনি অসুখী কিসে? তুই ত বলেছিস্, তিনি তোকে কত ভালবাসেন! তিনি যদি তোকে পেয়েই সুখী হয়ে থাকেন, তোর এত চিন্তা কেন?"

কালো একটু হাসিয়া কহিল, "আমি যে কালো কুৎসিত, তা ভুলে যাস্ কেন, চারু!" "তুই যদি কুৎসিত, সুন্দরী কে কালো?" "স্নেহের খাতিরে একথা বল্‌লে ত চল্‌বে না, বৌঠান্! আয়নায় তাঁর মুখের কাছে আমার মুখ যখনই তিনি টেনে নিয়েছেন, তখনই আমার মনে হয়েছে কি কুৎসিত আমি! খুব সুন্দর একখানি মুখ আমি সেই মুখখানির পাশে মনে মনে এঁকে দেখিছি,—কি সুন্দরই মানায়!"—কালো চুপ করিল, একটা গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস তাহার বুকের মধ্য হইতে উঠিয়া আসিতেছিল!

"অশোকা গোয়ালিনীর কথা শুনেছিস্ ত?—তুই দেখি তেমনই হ'লি!"

চারুর কথা শুনিয়া কালো একটু হাসিল, কহিল, "কেন? তা বলিস্ কেন?" "তোর মতে পুরুষ গুলি সব কাণা, তারা শুধু রূপই চায়, রত্ন চেনে না! না?" "না, তা ভাবি না; তবে"—"তবে কিরে?"

তখন কালোর চক্ষুর কোণে অশ্রুবিন্দু দেখা দিয়াছিল, সে চারুর মুখের উপর দৃষ্টি স্থাপন করিয়া ধীরে ধীরে কহিল, "বল্‌ব?" —কালোর ভাব দেখিয়া চারু শঙ্কিতা হইয়া উঠিতেছিল; সে সন্দেহপূর্ণ স্বরে জিজ্ঞাসা করিল,—"কি বল্‌বি রে, কালো?"

"এতদিন বলিনি আজ বল্‌ব!—আজ পাঁচবৎসর স্বামীর বুকে মাথা রেখে কাটিয়েছি; তাঁর বুকের প্রত্যেক স্পন্দনটিকে প্রত্যেক শব্দটিকে আমি চিনি! তাঁর আদর, যত্ন সোহাগ, আমার সর্ব্বাঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে!—কিন্তু—" কালো চুপ করিল।

"কিন্তু কি, ঠাকুরঝি?"

"এবার তিনি এখানে এসেছিলেন, আগের চেয়ে সহস্রগুণ আদর, যত্ন, সোহাগ জানিয়ে গেছেন। কিন্তু লক্ষ্য করে দেখেছি তাঁর মুখের হাসিটুকু ম্লান, চোখের দৃষ্টিটুকু বেদনায় কুণ্ঠিত। বুকের উপর-মাথা রেখে কাণ পেতে বুকের মাঝে মাঝে চাপা দীর্ঘশ্বাসের শব্দ শুনেছি!—কেন এমন হয়েছে বুঝিনি! তবে সর্ব্বদাই মনে হয়েছে, কি একটা কথা যেন বল্‌বার ছিল, তা না বলেই তিনি চলে গেলেন!"

"মনে হয়েছে ত জিজ্ঞাসা করিস্ নাই কেন?"

"না, বৌঠান্, তিনি যখন নিজেই বল্‌লেন না, তখন জিজ্ঞাসা কর্‌ব কেন?"

"যাঃ! এসব তোর মনগড়া কথা,"—

"দাদার মুখের দিকে চেয়ে তুমি তাঁর দুঃখ কষ্টের কথা, না বল্‌লেও বোঝ না কি?—মেয়েমানুষ স্বামীর মন বুঝ্‌তে কি ভুল করে?"

"তবে তুই কি বুঝেছিস্, বল্!"

"ঠিক পরিষ্কার বুঝিনি, তবে মনে হয়েছে, কোনও দিকে আমার প্রতি কর্ত্তব্যের কোন ত্রুটি হয়েছে, তাই আমাকে আগের চেয়েও বেশী আদর যত্ন ক'রে, সোহাগ জানিয়ে, সেই ত্রুটিটাকে ভুলে যেতে চেয়েছেন!"

কালোর কথা শুনিয়া চারু অনেকক্ষণ কথা কহিল না; কি ভাবিতে লাগিল। হঠাৎ কহিয়া উঠিল, "আচ্ছা, তুই আস্‌তে আস্‌তেই তোর কাছে যে দু'তিন খানা চিঠি লিখেছিলেন, তা নিয়ে আয় ত!" কালো আস্তে আস্তে কহিল,—"না, প্রমাণের জন্য স্বামীর চিঠি আন্‌ব না!—স্বামীর মন বুঝ্‌তে আমার নিজের মনের প্রমাণই যথেষ্ট! আমি যা' বুঝেছি, ঠিক্‌ই বুঝেছি! তবে একটা ভারি দুঃখু রয়ে গেল!—তিনি ত তাঁহার কালোকে জানেন, তবু যা বল্‌তে এসেছিলেন, তা বিশ্বাস করে বল্‌লেন না কেন?"

"দেখ্, তুই ভুল বুঝ্তেও ত পারিস্!"

"না চারু, ভুল বুঝিনি!"—চারুর স্কন্ধের উপর মাথা রাখিয়া কালো নীরবে কাঁদিতে লাগিল! চারুর চোখেও জল আসিতেছিল। সে দুই হাতে কালোর মুখখানি তুলিয়া ধরিয়া কহিল,—"কাঁদিস্ কেন?"

"পাঁচ বৎসরের একত্র বাসেও স্বামীর বিশ্বাসপাত্রী হতে পারি নাই; এর চেয়ে বেশী দুঃখ মেয়েমানুষের আর কি আছে, বৌঠান্!"

"একটা কথা জিজ্ঞাসা করব?" "কর্!" "প্রভা এখনও সেখানে আছে?" "হাঁ"। "সে দেখ্তে কেমন?" "বুঝি, তোর চেয়েও সুন্দরী।" "ঠিক পেঁচাটির মত বুঝি;—গুণ?" "তাকে সতীন্ পাই ত মাথার মণি করে রাখি; এ কথা অনেক ভেবেছি।" "এমন?" "হাঁ, এমনি বটে!"—"তবে কাঁদিস্ না। ওঠ!"

এমন সময় কালোর কনিষ্ঠা ভগিনী প্রতিমা লাফাইতে লাফাইতে আসিয়া দিদির ঘাড়ের উপর পড়িয়া কহিল,—

"নরেশ বাবু, নরেশ বাবু, কুঞ্জে যাবে না?
দিদিমণি রাগ করেছে, কথা কবে না!
বৌঠান্, জামাই বাবু এসেছেন,—দেখে যাও!"—

চারু কহিল, "সত্যি?"

কালো ও চারু উভয়েই পরস্পরের মুখের দিকে চাহিল; তাহাদের চোখের অশ্রু তখনও মুছিয়া যায় নাই! শিশিরস্নাত শ্যামপল্লবশীর্ষে প্রথম সূর্য্যরশ্মিপাতের মত, কালোর মুখে হাসি ফুটিয়া উঠিল! চারু হাসিল না! প্রতিমা সুর করিয়া তাহার শ্লোক আওড়াইতে আওড়াইতে চলিয়া গেল!

১২

পরদিন প্রত্যূষে সকলের উঠিবার আগে, কালো শয্যাত্যাগ করিয়া চারুর ঘরের কাছে আসিয়া মৃদুস্বরে ডাকিল "বৌঠান্,"—

চারু দুয়ার খুলিয়া বাহির হইয়া আসিল। অনেক পূর্ব্বে তাহার ঘুম ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল, সে শুইয়া পড়িয়া কালোর কথাই ভাবিতেছিলে। চারু কহিল, "ঠাকুরঝি, এত সকালে উঠ্‌লি যে ?"

কালো একটু মৃদু হাসিয়া কহিল, "তোকে না দেখে কতক্ষণ থাক্‌তে পারি, বল্ !' কথাটা বলার পরই তার মুখের হাসিটুকু একেবারে নিভিয়া গেল !

"—ই—লো,"—দুটি আঙ্গুল দিয়া চারু কালোর বামগণ্ডস্থল একটু টিপিয়া দিল ; তার পরই মুখের দিকে চাহিয়া বলিয়া উঠিল, "কিরে ! তোর মুখ চোক্ এমন হয়ে গেছে কেন রে, কালো ?"

কালো একটু হাসিল।

"এবার ক'দিনের ছুটি দিতে হয় যে, চারু !"

"কেন, নিয়ে যেতে চেয়েছেন বুঝি ?"

"না, নিয়ে যেতে চান্‌নি ; আমি নিজেই যাব, তবে ওঁর সঙ্গে নয় ; উনি আজই চলে যাচ্ছেন !"

"তুই যে একটা হেঁয়ালি হয়ে দাঁড়াচ্ছিস্ লো ঠাকুরঝি !"

"মাসীমা মারা গেছেন শুনেছিস্ ত ?"

"হাঁ, তা ত কালই শুন্‌লাম্।"

"তাঁর শ্রাদ্ধের কাজ টাজের বন্দোবস্ত কর্‌তে হবে ত, তাই উনি থাক্‌তে পার্‌বেন না।"

"বুঝ্‌লাম ; তা তোকে সঙ্গে না নিয়ে পরে যেতে বল্‌ছেন কেন ?"

"উনি ত যেতেই বলেন নাই ; আমি নিজেই যাচ্ছি !"

"নরেশ বাবুর অজ্ঞাতে নাকি ?"—চারু ক্রমেই বিস্মিতা হইয়া উঠিতেছিল।

"হাঁ,—মা কাশী চলে যাচ্ছেন, তিনি নাকি আমাকে মুখ দেখাবেন না !"

"দূর ছাই! কথাগুলি ভেঙ্গেই বল্‌না; মুখ দেখাবেন না; অপরাধ হ'ল কি তোর?"

এবার কালো হাসিয়া উঠিল। কিন্তু কালোর এই হাসিটা চারুর কাছে ভাল লাগিল না। চারু হাসিল না। শুধু সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে কালোর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল! কাল্‌কার চুল বাঁধার সময় হইতে কালো তাহার কাছে একটি দুর্বোধ্য প্রহেলিকার মতন প্রতীয়মান হইতেছে! এখনকার কথাগুলিও সে বুঝিতে পারিতেছিল না। কালোর বুকের মধ্যে কোথায় একটা বেদনা আছে, চারুর কেবলই তাহাই মনে হইতেছিল। হাসি দিয়া, কথা দিয়া, সেই বেদনাটাকে সে যেন ক্রমাগতই চাপা দিয়া, আসিতেছে; চারু অন্তরে অন্তরে অস্থির হইয়া উঠিল। হঠাৎ কালোর দুই হাত সজোরে চাপিয়া ধরিয়া কহিল,—"দেখ্‌ কালো, হেঁয়ালি ছাড়্‌, যতটুকু বল্‌বি এক সঙ্গেই বলে ফেল্‌। আমার বড় ভাল বোধ হচ্ছে না।"

কালো মাথা তুলিয়া যখন চারুর মুখের দিকে চাহিল, তখন চারু দেখিল, কালোর চক্ষু অশ্রুসিক্ত হইয়া উঠিয়াছে। চারু কিছুই বুঝিতে না পারিয়া কালোর হাত ছাড়িয়া দিল, তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া রুদ্ধস্বরে কহিল,—"কি ঠাকুরঝি?"

কালো কহিল, "বৌঠান্‌, লক্ষ্মীটী আমার, একটি দিনের জন্যও যাবি আমার সঙ্গে?" "কোথায়?" "কল্‌কাতায়।" "কেন?" "প্রভাকে দেখ্‌তে।"

চারুর সমস্ত শরীরের মধ্য দিয়া বিপুলবেগে যেন একটি বিদ্যুতের তরঙ্গ খেলিয়া গেল! সে কালোকে ছাড়িয়া দিয়া তাহার ম্লান মুখখানির দিকে চাহিয়া চকিত ভাবে কহিল, "সত্যি?" কালোর ম্লানমুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। একটু হাসিয়া কহিল,—"সত্যি, কিন্তু বড় একটা বিপদে পড়া গেছে, বৌঠান্‌!"

চারু আর কোনও কথাই না শুনিয়া সেখান হইতে দ্রুতপদে

চলিয়া যাইতেছিল ; ক্ষোভে, দুঃখে, তাহার মাথার কাপড় খসিয়া পড়িয়া গেল, সেদিকে তাহার লক্ষ্যই ছিল না। কালো তাহাকে ধরিয়া কাছে টানিয়া আনিয়া কহিল,—"সব শুনে যা', চারু, নইলে আমি মাথা খুঁড়ে মরব। কল্‌কাতায় প্রভা মরতে বসেছে ; মা কাশী চলে যাচ্ছেন; আর ওঁর চোখ মুখ দেখেও আমার ভাল বোধ হচ্ছে না, একটা কিছু সর্ব্বনাশ করে বস্‌বেন, না হয় একদিকে চলে যাবেন।"

চারু রাগিয়া কহিল, "তা প্রভা মরতে বসেছে, তাতে আমার কি? তোরই বা কি?"

"ছিঃ? বৌঠান্, নিজের গায়ে ব্যথা লাগ্‌লে বুঝি এম্‌নি করেই ক্ষেপে যেতে হয়? সব্‌টা শোন্‌ই আগে, তারপর বিচার করিস্ —লক্ষ্মীটি আমার!"

১৩

যে মুহূর্ত্তে নরেশের মাসিমা তাহার হাতে প্রভার কম্পিত হাতখানি তুলিয়া দিলেন, সেই মুহূর্ত্তেই নরেশের হৃদয়ে একটি প্রবল আঘাত লাগিল ; সেই আঘাত তাহার অন্তরস্থিত রূপ-মোহকে চূর্ণ করিয়া দিল। সে কালোর কাছে যে বিষম অপরাধ করিয়াছে, তাহার তীব্রতাটা ঠিক সেই মুহূর্ত্তেই সে সুস্পষ্টরূপে বুঝিতে পারিল। নরেশের মনে হইল, যাহার কালো আছে, সে কেন এমন করিয়া মূর্খের মত দেখিয়া মজিল? সে কালোর কাছে কি না পাইয়াছে? তাহার চিত্তের আরাম, বিশ্রামের সঙ্গিনী, ক্রীড়ার সহচরী কালো,—যে তাহাকে তাহার হৃদয়ের সমস্ত প্রীতি-টুকু ঢালিয়া দিয়া নন্দিত করিয়াছে ;—যাহার নিবিড় সঙ্গ সুদীর্ঘ পাঁচ বৎসর পর্য্যন্ত তাহাকে তৃপ্তি, সুখ, শান্তি প্রদান করিয়াছে! সে কলেজে গেলে, বেড়াইতে গেলে, কালো তাহার পথ চাহিয়া বসিয়া রহিয়াছে! বিপদে সম্পদে, সুখে দুঃখে কালোর প্রেমপূর্ণ

দৃষ্টিটুকু দেবতার ধ্রুবদৃষ্টির মত তাহাকে অনুসরণ করিয়াছে! যখনই যেখানে সে গিয়াছে, সে মনে করিয়াছে, বাড়ীতে একখানি প্রেমপূর্ণ শঙ্কাব্যাকুল হৃদয় তাহারই অপেক্ষায় নিশিদিন উন্মুখ হইয়া রহিয়াছে! কালো কোনও দিন তাহার উপর অভিমান করে নাই; তাহার কাছে মুখ ফুটিয়া কিছু চাহে নাই; সে শুধু তাহাকে দিয়াছেই! নরেশ ভাবিল, সে কেন কালোর কাছে সমস্ত বলিতে যাইয়াও বলিল না। কালো হয়ত তাহাকে বাঁচাইতে পারিত!—এই অনুতাপ হইতে রক্ষা করিতে পারিত! কিন্তু হায়, এখন ত আর কোনও উপায়ই নাই!

ভাবিয়া ভাবিয়া মাসীমার উপর তাহার একটু রাগ হইল; কেন তিনি মৃত্যুকালেও এমন একটা কাণ্ড করিয়া গেলেন! কালোর উপরও একটু রাগ হইল; সে যদি কাছে থাকিত, তাহা হইলে ত আর এমনটা ঘটিতে পারিত না। সর্ব্বাপেক্ষা তাহার রাগ হইল প্রভার উপর, এবং নিজের উপর! প্রভা কেন এখানে মরিতে আসিল? আসিল ত এত রূপ লইয়া আসিল কেন? তাহার রূপই ত যত অনিষ্টের মূল! প্রভাকে সে যদি মোটেই না দেখিত, তাহা হইলে ত আর এমন একটা কিছুই ঘটিত না। কিন্তু নরেশ নিজেকে কোনও মতেই ক্ষমা করিতে পারিল না! এই সঙ্কটে কালোকেই সর্ব্বাগ্রে মনে পড়িল! কালো,—তাহার কালো, তাহার প্রিয়তমা কালো! হায়, সে আজ তাহাকে কোথায় ঠেলিয়া ফেলিয়া দিতে চলিয়াছে? এ কেমন করিয়া হয়? কালোকে সে কেমন করিয়া ভুলিবে? তাহার বুকের মধ্যে এক তীব্র দহনশিখা জ্বলিয়া তাহাকে পুড়াইয়া ছাই করিতেছিল! সে জ্বালা, সে দহন, যে কিছুতেই, কোনোমতেই নিভিবার নহে!

প্রেমামৃতপূর্ণ মঙ্গল ঘট লইয়া দাঁড়াইয়া—কে ও? ওই কি তাহার উপেক্ষিতা চারুহাসিনী কালো! ওই যে কালোর অম্লান

সৌন্দর্য্য পার্থিব সকল রূপকে মলিন করিয়া ফুটিয়াছে! ওই কালো!—ওই কালোই তাহাকে শান্তি দিতে পারে;—তাহার অন্তরদহনকে নির্ব্বাপিত করিতে পারে!

নরেশ কলিকাতা ছাড়িল, পূর্ব্বাঞ্চলের কূলপ্লাবী স্রোতোমুখে নৌকা ছুটাইয়া কালোর পিত্রালয়ে দেখা দিল। অতর্কিতে বন্যার জলের মতই আসিয়া পড়িয়া, কালোর কাণের কাছে তাহার ভুলের ইতিহাস, বেদনার কাহিনী জানাইল! কালো শুনিতে শুনিতে স্বামীর কাছে—আরও কাছে সরিয়া আসিল; কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই নরেশকে তাহার স্নিগ্ধ বক্ষে টানিয়া লইল! সে তাহার স্বামীকে মৌন আলিঙ্গনে বাঁধিয়া রাখিয়া বুঝাইতে চাহিতেছিল;—ওগো প্রিয়, হে প্রিয়তম, কালো তোমারই, তুমি তাহাকে সেবার অধিকার দিয়াছ, কুৎসিৎ কালোকে তোমার প্রেমস্পর্শ দিয়া সুন্দর করিয়াছ; তাহাই তোমায় কালোর পক্ষে যথেষ্ট নহে কি? তোমার সুখেই ত তোমার কালোর সুখ; তোমার তৃপ্তিতেই তাহার তৃপ্তি! তবে কেন এ কুণ্ঠা, এই লজ্জা, এই অনুতাপ?

কালো কোনও কথা কহিল না; তবু নরেশের মনে হইল, কালোর মৌন আলিঙ্গনস্পর্শটুকুই তাহার সমস্ত বেদনা হরণ করিয়া লইয়াছে! আজি আবার কতদিন পরে নরেশ কালোর বুকে মাথা রাখিয়া শান্তি পাইল!

চারুর কাছে কালো একে একে সব কথা বলিল! চোখের জলে সে আর চারুর মুখ দেখিতে পাইতেছিল না; চারুর ডান হাতখানি চাপিয়া ধরিয়া কহিল—"দেখ্ বৌঠান্, আমি কষ্ট পাব বলে সংসার শুদ্ধ সকলে অস্থির হ'য়ে উঠেছেন! আমি সেখানে যাওয়ার আগেই মা কাশী চলে যেতে চাচ্ছেন, কারণ চোখের উপর আমার কষ্ট দেখতে পার্বেন না; স্বামী ত ক্ষমা চাইতে এই পর্য্যন্ত ছুটেই এসেছেন! মাঝ থেকে বেচারী প্রভা মর্তে

বসেছে; তার মা নেই, কেউ তার দিকে ফিরেও চায় না। যেন সব অপরাধই তার। কেন, এমন হবে কেন, বৌঠান্? কি আমি যে আমার জন্যেই সংসারের মধ্যে এমন ওলট পালট্ হয়ে যাবে? সব চেয়ে আমার স্বার্থ টাই এঁরা বড় করে দেখ্বেন কেন? আমি কি এমনই হীন? না, চারু, আমি তা হতে দেব না! এখন ত সব শুন্লি, চারু! যাবি একবার? তুই সঙ্গে থাক্লে আমি সব দিক্ বজায় রাখতে পার্ব!"—কালো তাহার অশ্রুব্যাকুল দৃষ্টিটুকু চারুর মুখের উপর স্থাপন করিল!

চারু কহিল, "দেখ্, ঠাকুরঝি, সব বুঝলেও তোর সঙ্গে যাওয়া ত আমার কর্ম্ম নয়!—সব দিক্ বজায় তুই নিজেই রাখতে পার্বি, আমার সাহায্য লাগবে না!—তুই যদি সম্পর্কে আমার ছোট না হতিস্,—কালো, তোর পায়ের ধূলা মাথায় নিয়ে জীবনটা সার্থক ক'র্তাম্!"

১৪

শুনা যায়, কেহ কেহ স্বপ্নভঙ্গে জাগিয়া উঠিয়া হাতের মুঠার মধ্যে দেবতার দুর্লভ অনুগ্রহদান স্বরূপে ঔষধ লাভ করে। সেই পরম লাভটি তাহাকে নিরাময় ও স্বাস্থ্য প্রদান করে। জাগিয়া উঠিয়া একবার হাতের মুঠা খুলিয়া চকিত দৃষ্টিতে সে চাহিয়া দেখে, কোন্ দুর্লভ বস্তু দেবতার অনুগ্রহ সঙ্কেতে তাহার হাতের মুঠার মধ্যে আসিয়াছে! মুহূর্ত্ত মধ্যে সে আবার প্রাণপণে হাত মুঠা করিয়া ফেলে। লব্ধদ্রব্যের স্পর্শটুকু তাহার শিরায় বিদ্যুৎ স্রোত সঞ্চারিত করিয়া তাহাকে ত্রস্ত, চকিত করিয়া তোলে! লব্ধ দ্রব্যটির ব্যবহারপ্রণালী দেবতাই তাহাকে অনুগ্রহ করিয়া বলিয়া দিয়া গিয়াছেন। সে কোনও মতেই সেই তথ্যটি না ভুলিয়া যায়, তাহাই মনে মনে পুনঃ পুনঃ আলোচনা করিতে থাকে!

একখানি উত্তপ্ত হস্তের অতর্কিত স্পর্শ প্রভার চকিত দৃষ্টির কাছে যখন বাস্তব সত্যকে ফুটাইয়া তুলিল, তখনও প্রভার মনে হইতেছিল মৃত্যুশয্যাশায়িতা মাতার শয্যাপার্শ্বে বসিয়া সে এ কি স্বপ্ন দেখিতেছে ? মাতার মরণাহত মুখের দিকে চাহিয়া দেখিল, অস্তগামী শশাঙ্কের শেষ ম্লান লেখাটুকুর মতই তাহার মাতার পাণ্ডুর মুখের হাসির শেষ রেখাটুকু ধীরে ধীরে মিলাইয়া আসিতেছে। যে দেবতা অতর্কিতে তাহারই হাতের মধ্যে তাঁহার শেষ আশীর্ব্বাদটুকু তুলিয়া দিয়া গিয়াছেন, তিনি তাহাকে এমন অবসর দিলেন না যে সে জিজ্ঞাসা করিয়া রাখে, কেমন করিয়া সে এই অযাচিত দানকে সর্ব্ববেদনাহরণের জন্য কণ্ঠে ধারণ করিবে? কোন্ রক্ষাকবচের আবরণে ইহাকে সে আবৃত করিতে পারে ?

যে সামগ্রীর বিদ্যুৎস্পর্শ তাহাকে এমন করিয়া চকিত, ত্রস্ত, কুণ্ঠিত করিয়া তুলিতেছিল, সে একবার তাহার দিকে তাহার ব্যথিত ম্লানদৃষ্টি তুলিয়া চাহিল, তারপর মরণপথযাত্রিণী মাতার শয্যার উপরেই লুঠাইয়া পড়িয়া ডাকিল, "মা, মাগো—মা আমার !" যে দেবতা সেই মুহূর্ত্তেই তাহাকে তাঁহার নীরব আশীষধারায় অভিসিঞ্চিত করিয়া স্বর্গগতা হইয়াছেন, প্রভার ইচ্ছা হইতেছিল আকুলকণ্ঠে তাঁহাকেই ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করে—"ওগো জননী, হে পুণ্যময়ী, যাহাকে তোমার স্নেহনীড়ে—তোমারই তপ্তবক্ষের পীযূষধারায় বর্দ্ধিত করিয়াছে, তাহাকে আজ এ কি সমস্যার মধ্যে রাখিয়া গেলে ? বলিয়া যাও, একি তোমার আশীর্ব্বাদ, না তোমার অভিশাপ !"

প্রভা কাঁদিল,—কাঁদিয়া কাঁদিয়া শয্যা লইল ! কেহ তাহার দিকে ফিরিয়াও চাহিল না। কেন চাহিল না, তাহা যাহারা চাহিল না, তাহারাও ভাল করিয়া বুঝিল না !—কি অপরাধ প্রভার ?—তাহা কেহ ভাল করিয়া বুঝি বিচার করিয়াও দেখিল না ! প্রভা অনেক কাঁদিল ; তারপর চুপ করিল ; ভাবিল,

কেন কাঁদিব? কাহার জন্য কাঁদিব? নিজের জন্য? কেন,—নিজের উপর এত কিসের মায়া? সব পথ যদি রুদ্ধ হইয়া থাকে,—একটা পথ ত খোলা আছে! মরিলেই ত সকল গোল মিটিয়া যায়! তাহার জন্যই যদি একটি সুখের সংসারে আগুন লাগিয়াছে, তাহা হইলে সে কেন বাঁচিতে চাহিবে? সে মরিবে;—মরিয়া এই আগুন নিভাইবে, এই অশান্তি, উদ্বেগ দূর করিবে! হিন্দুর মেয়ের মরিতে এত ভয় কি? তখন প্রভা একটু নিশ্চিন্ত হইল; ভাবিল, এত সহজে যে কথাটার মীমাংসা হইয়া গেল, সেজন্য সে এত কাঁদিয়াছে কেন?

কিন্তু তবু মনের মধ্যে কোথায় একটু বেদনা ছিল। কিসের সেই বেদনা? না,—কিছু নহে!—তবু—তবু কি? সেই তপ্ত স্পর্শটুকু!—ঘুরিয়া ফিরিয়া বারবারই মনে পড়িতেছিল—সেই তপ্ত স্পর্শটুকু। এখনও হাতের উপরে যেন সেই নির্ম্মল পাণিপদ্মের স্পর্শটুকু লাগিয়া রহিয়াছে! তা মন্দ কি?—এবারকার মত ঐটুকুই সম্বল! এমন সময়ে কক্ষদ্বারে আসিয়া উচ্ছ্বসিত স্বরে কেহ ডাকিল, "সই!" বজ্রপতন শব্দে মানুষ যেমন চমকিয়া উঠে, প্রভা তেমনই চমকিয়া উঠিল; দ্বারের দিকে ভীতা কুরঙ্গিণীর মত চকিত দৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিল, কালো আসিতেছে। পথ থাকিলে, প্রভা পলাইত! তখনই মরিবার উপায় থাকিলে প্রভা মরিত! কিন্তু পলায়ন করিবারও পথ ছিল না, মরিবারও উপায় ছিল না! তখন নিরুপায় প্রভা দুই হাতে মুখ আবৃত করিয়া শয্যার উপর লুটাইয়া পড়িল! হায়! সে যদি শয্যার সঙ্গে মিশিয়া যাইতে পারিত! নিজের অস্তিত্বকে অস্বীকার করিবার কোনও উপায়ই যদি সে খুঁজিয়া পাইত! কালো ও তাহার মাঝখানে যদি একটা বিরাট অলঙ্ঘ্য প্রাচীর নিমেষের মধ্যে কোনও দৈত্য আসিয়া তুলিয়া দিতে পারিত! কালো আরও কাছে আসিয়া প্রভার শয্যার উপর বসিয়া পড়িয়া তাহার মুখের কাছে মুখ নিয়া ডাকিল, "সই!"

কি আহ্বান এই! স্নেহে, মমতায়, করুণায় উচ্ছ্বসিত,—প্রীতিতে বিগলিত, সোহাগে নন্দিত! কালোর মুখে একি আহ্বান! কালো শয্যা হইতে প্রভাকে টানিয়া তুলিল! তাহার কণ্ঠে দুই বাহু অর্পণ করিয়া, তাহার মুখের উপর স্নিগ্ধদৃষ্টি স্থাপন করিয়া কালো কহিল, "সই, কতদিন পরে তোর কালো এসেছে, তুই কি তা'কে তোর চোখের জলই দেখাবি?—মুখের হাসিটুকু দেখাবি না?"

প্রভা তবু কথা কহিল না। সে কালোর স্কন্ধের উপর মুখ রক্ষা করিয়া কাঁদিতে লাগিল!—তখন কালোর অশ্রুও আর বাধা মানিল না—সেও কাঁদিল; বিন্দুর পর বিন্দু অশ্রু নীরবে কালোর কপোল বাহিয়া প্রভার কুন্তলরাজির মধ্যে আশ্রয় লইতেছিল। প্রভা ভাবিতেছিল,—কালো—এমন কালো,—সে তাহারই সর্ব্বস্ব হরণ করিতে বসিয়াছে! এই অনিচ্ছাকৃত অপরাধের জন্য সে কি প্রায়শ্চিত্ত করিবে?

হঠাৎ কালো অঞ্চলে চক্ষু মুছিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, কহিল,—

"না, এমন ক'রে কাঁদ্‌তে ত আমি আসিনি;—প্রভা, তোর ভিতর দিয়ে আমার কতদিনের কল্পনা সার্থক হ'তে চলেছে, তা' যদি আমি তোকে বুঝাতে পার্‌তাম্! দেখ্, প্রভা, আজ তোকে পেয়ে আমি কত সুন্দর হ'য়ে উঠেছি;—আর কেউ আমাকে কালো, কুৎসিৎ বল্‌তে পার্‌বে না। এমন পদ্মালয়ার মত ছোট বোন্‌টি পাওয়ার সৌভাগ্য যার হয়, সে ছাড়া এ ত আর কেউই বুঝ্‌তে পার্‌বে না। প্রভা, সই!' তোর কালো যে তোর সব চেয়ে বড় আপনার জন, এতে কি তোর আনন্দ হচ্ছে না? কত দিন আমরা ভেবেছি, আমাদের দুটির মধ্যে ছাড়াছাড়ি হ'লে কেমন করে বাঁচ্‌ব;—দেখ্‌ত, নারায়ণ তাঁর রুক্মিনী সত্যভামার মতই আমাদের মিলিয়ে দিয়ে, কি অজস্র করুণাই দেখিয়েছেন!"

কালোর চোখে আবার জল আসিতেছিল; সে নীরব হইয়া

দুই হাতে জোর করিয়া প্রভার মুখখানি তুলিয়া ধরিল, কহিল,—"বল্ প্রভা, আমার ছোট বোন্‌টি হ'তে তোর আর এতটুকুও দ্বিধা নাই ?"

প্রভা কালোর বুকে মুখ লুকাইয়া অশ্রুজড়িত মৃদুকণ্ঠে কহিয়া উঠিল,—"এমন তুই, তা'ত জান্‌তাম্ না, সই !—যে তোর পায়ের ধূলা হ'তে পার্‌লে কৃতার্থ হয়, তাকে তোর ছোট বোনের আসন দিয়ে গর্ব্বিত ক'রে তুল্‌লি কেন, দিদি ?"—

তখন কালো প্রভার মুখখানি আবার তুলিয়া ধরিল ; দেখিল সে মুখখানি সত্যই একটি শিশিরস্নাত যূঁই ফুলের মতই নির্ম্মল সুন্দর। কালো তাহার মুখচুম্বন করিয়া কহিল,—"আমি তোকে মাথার মণি করে রাখ্‌ব, লক্ষ্মীটি আমার।"

প্রভা নীচু হইয়া দুই হাতে কালোর পায়ের ধূলা গ্রহণ করিয়া মাথায় দিল !

আরতির শেষ

১

মুন্‌সেফ্ প্রাণকৃষ্ণ বাবু দ্বিতীয় মুন্‌সেফ্ শরৎ বাবুকে "রিলিভ্" করিতে আসিলেন। সঙ্গে পত্নী কমলা, পুত্র সুধীরকৃষ্ণ ও কন্যা ঊষা। সুধীর কিশোরবয়স্ক; একটু চিন্তাশীল; বোধ হয় একটু আধটু কবি। পিতামাতা সে খোঁজ রাখিতেন না; কিন্তু দুষ্ট ঊষা মাঝে মাঝে দাদার খাতা চুরি করিয়া পড়িত ও তাহার সঙ্গিনী 'ললিতা'কে শুনাইত। 'ললিতা' একটা কাবুলী বিড়াল! 'ললিতা' কবিতা না বুঝুক, ঊষার আদর বুঝিত। আর ঊষাও তার্কিক শ্রোতা অপেক্ষা এই মূক শ্রোতাই অধিক পসন্দ করিত।

দ্বিতীয় মুন্‌সেফ্ বাবুর কন্যা সুহাসিনী, ঊষার চেয়ে বয়সে প্রায় এক বৎসরের বড়, অর্থাৎ প্রায় একাদশ বর্ষীয়া। সুধীর তাহাকে একবার মাত্র দেখিল। কুঞ্চিত কালো চুলে আধ ঢাকা সুন্দর মুখখানি; মেঘান্তরিত শশাঙ্কের মত শান্ত পুলকোদ্ভাসিত। সে মুখশ্রীর একখানি নিখুঁৎ ফোটো বহুদিন পর্য্যন্ত কিশোর কবির তরুণ হৃদয়ফ্রেমে আঁটা রহিল।

তিন দিন পরে শরৎ বাবু পত্নীকন্যাসহ চলিয়া গেলেন। আর দুই দিন পরে ইঁহাদের কথা সকলেই এক প্রকার ভুলিয়া গেল, ভুলিল না শুধু ঊষা,—সে সুহাসিনীকে তিন দিনের পরিচয়েই নিতান্ত আপনার করিয়া লইয়াছিল।

সুধীর সে দিন কলেজে চলিয়া গিয়াছে; ঊষা যথারীতি দাদার খাতা চুরি ও গোপন পাঠরূপ মহাপাপে লিপ্ত হইল। কিন্তু এ কি? এ কি ছন্দ কবির হৃদয়ে ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিয়াছে! ঊষা

ভাল করিয়া বুঝিল না ; তবু এটুকু বুঝিল, কবির হৃদয়ে একটা পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে ! কতবার খাতা চুরি করিয়া আনিয়া ঊষা পড়িয়াছে, কিন্তু এ নূতন সুর এমন করিয়া ত কোনও দিনই তাহার কাণে উঠে নাই ! কাবুলী বিড়ালটিকে বুকের কাছে চাপিয়া ধরিয়া ঊষা জিজ্ঞাসা করিল,—"বলিতে পারিস্, ললিতা, কি এ ?"

সকালে ডাক আসিয়াছে ; সুধীর কতকগুলি চিঠি হাতে করিয়া ভিতরে আসিল—বলিল, "ঊষা, তোর চিঠি আছে রে !" আগ্রহের সহিত ঊষা চিঠি চাহিয়া লইল।

"কা'র চিঠি রে—নূতন হাতের লেখা দেখ্‌ছি যে !" সুধীর জিজ্ঞাসা করিল।

"ইস্, তাই বলি আর কি ! তুমি খাতায় কি লেখ,—আমায় বলে থাক ?"—কথাটা বলিয়া ঊষা একটু কেমন হইয়া গেল! হঠাৎ খাতার কথাটা মুখ দিয়া বাহির হইয়া যাওয়া ত ভাল হয় নাই ! যদি চুরি ধরা পড়ে !

সুধীর জানিত, ঊষা তাহার খাতা চুরি করিয়া পড়ে. গোপনে হউক, প্রকাশ্যে হউক, তাহার যে একজন 'সমজদার' পাঠক আছে, সুধীর তাহা মনে করিয়া একটু গৌরব ও তৃপ্তি অনুভব করিত।

"আচ্ছা তোকে খাতা দেখাব—বল্ কে লিখেছে চিঠি।"

"চাই না আমি তোমার খাতা দেখ্‌তে" বলিয়া ঊষা ফিরিয়া দাঁড়াইল—চিঠি মুঠার মধ্যে শক্ত করিয়া ধরিয়া বলিল—"ছিঃ, পরের চিঠি বুঝি দেখ্‌তে আছে !" আজ তাহার ধর্ম্মজ্ঞানটা বড়ই প্রবল হইয়া উঠিয়াছে দেখিয়া সুধীর মনে মনে একটু হাসিল। পলকের মধ্যে ঊষা ছুটিয়া রান্নাঘরে মাতার কাছে উপস্থিত হইল, এবং "মা—'সু—র' চিঠি এয়েছে" কথাটা এমন ভাবে বলিল যে, বাহিরে সুধীর স্পষ্টই তাহা শুনিতে পাইল ! তাহার কর্ণমূল পর্য্যন্ত কেন যে আরক্তিম হইয়া উঠিল, সে ভাল বুঝিতে পারিল না।

চুরি করিতে যাইয়া, একজন চোর নাকি অন্য একজন চোরকে

ধরাইয়া দিয়াছিল। সুধীর আজ তাহার দেরাজের তালা চাবি বদ্‌লাইয়া ফেলিল ; কি জানি যদিই বা ঊষা চুরি করিতে আসিয়া চোর ধরাইয়া দেয় !

২

সুধীর স্থানীয় কলেজের ছাত্র। কলেজে "Little Brothers of the Poor" নামে একটি ছোট সমিতি ছিল। প্রতি বৎসর 'সেশন্' আরম্ভের সময়ে একটি বিশেষ সভার অধিবেশন হইত। প্রথম ও তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীর উৎসাহী ছাত্রগণকে লইয়া এই সমিতি গঠিত হইত। সমিতির সভ্যগণের কর্ত্তব্য ছিল, পীড়িতের সেবা ও দুঃখের অভাব-মোচন। সমিতি ছোট হইলেও, সভ্যগণ এক গুরু কর্ত্তব্যভার গ্রহণ করিয়াছিল। সহরে সাধারণ গৃহস্থ স্রোতের জল ব্যবহার করে। রাস্তার পাশে পাশে অপরিসর পয়ঃপ্রণালী চলিয়া গিয়াছে ; পয়ঃপ্রণালীগুলি নদীর সহিত সংযুক্ত ; এবং প্রত্যেক পুষ্করিণী এই প্রণালীসমূহের সহিত যুক্ত। প্রত্যেক পুষ্করিণীতেই জোয়ার ভাঁটায় জল বাড়ে ও কমে। তাই সহরটিতে প্রায় প্রতি বৎসরই কলেরার প্রকোপ দেখা যায়। যিনি এই সমিতির সম্পাদক বা প্রাণ, সহরের কেহ কলেরায় আক্রান্ত হইলে তাঁহার নিকট সংবাদ আসিত। সকলেই জানেন, কলেরা রোগীর সেবার জন্য সহজে লোক পাওয়া যায় না। যে স্থানে লোকাভাব বা যে সাহায্য পাইতে ইচ্ছা করিত, সম্পাদক মহাশয় প্রয়োজন অনুসারে তথায় 'সেবক' পাঠাইতেন। কলেজের যুবকগণই স্বেচ্ছায় এই সেবাভার গ্রহণ করিত।

সুধীর প্রথম বার্ষিক শ্রেণীতে আসিয়া ভর্ত্তি হইল। সমিতির বিশেষ অধিবেশনে সে তাহার নাম "কলেরা শাখায়" লিখাইয়া দিল। সমিতির দুইটি শাখা ছিল। একটিকে আমরা "কলেরা শাখা" বলিতে পারি। যাহারা অপেক্ষাকৃত নির্ভীক তাহাদিগকেই

কলেরা শাখায় গ্রহণ করা যাইত। অন্য শাখার সভ্যগণকে জ্বর ইত্যাদি সাধারণ রোগেই সেবা করিতে হইত। কে কোন্ শাখায় প্রবেশ করিবে তাহা ছাত্রদের নিজের ইচ্ছার উপরেই নির্ভর করিত। কলেজ হইতে আসিয়া সুধীর বলিল, "বাবা, আমি 'Little Brothers of the Poor' সমিতির কলেরা শাখায় নাম দিয়াছি।"

প্রাণকৃষ্ণ বাবু পত্নী কমলার মুখের দিকে চাহিলেন।

"তোর ভয় কর্‌বে না ?"—কমলা জিজ্ঞাসা করিলেন।

সুধীরের চক্ষু উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, বলিল, "ভয় কি, মা ? তোমার আশীর্ব্বাদ পেলে কিছু গ্রাহ্য করি না।"

"শুন, পাগল ছেলের কথা"—বলিয়া কমলা হাসিলেন। কমলার মুখের সে হাসিতে জগন্মাতার করুণ মুখের হাসিরাশির এতটুকু আভাস বুঝি ফুটিয়া উঠিল।

"তা বেশ, আমার কিছু অমত নাই, তবে খুব সাবধানে কাজ করিস্। মানুষ অনর্থক ভয় পায়—কলেরা ছোঁয়াচে নহে।" প্রাণকৃষ্ণ বাবুর কথায় একটা বিশ্বাস ও নির্ভীকতা ফুটিয়া উঠিতেছিল।

সমিতির নিয়ম অনুসারে সুধীর প্রথম প্রথম রোগের প্রথমাবস্থায় সেবা করিতে যাইত, তাহার পর সে ক্রমে ক্রমে সম্পাদক মহাশয়ের নির্দ্দেশ অনুযায়ী কঠিন অবস্থাতেও যাইতে আরম্ভ করিল। সেবাকার্য্যে সুধীরের তৎপরতা অতুলনীয় ছিল; রোগগ্রস্তকে একটু আরামে রাখিবার জন্য তাহার প্রাণপণ যত্ন ও আগ্রহ অপর সেবকগণের আদর্শ হইয়া উঠিল। কত রোগীর শিয়রে বসিয়া সে বিনিদ্র রজনী কাটাইয়া দিয়াছে! প্রভাতের সঙ্গে সঙ্গে যে দিন সুধীর দেখিত, রোগীর মুখে শান্তি ও আরামের চিহ্ন ধীরে ধীরে ফুটিয়া উঠিয়াছে, সে দিন তাহার অন্তর তৃপ্ত হইয়া উঠিত,—তাহার প্রসন্ন অন্তরে দেবতার আশীর্ব্বাণী যেন সেদিন

নিতান্ত সুস্পষ্ট হইয়া বাজিয়া উঠিত।—আর আত্মীয়গণের করুণ ক্রন্দনরোলের মধ্যে যে দিন রোগগ্রস্তের অবিনশ্বর আত্মা মৃত্যুর চির-রহস্যময়-রাজ্যে প্রবেশ করিত, সে দিন তাহার নয়নযুগল অশ্রুতে আপ্লুত হইয়া উঠিত।

৩

সুধীর এফ, এ, পাশ করিল; বিশ্ববিদ্যালয় ছেলের মুখের দিকে চাহে না; বাঙ্গালীর ছেলের মা বাপও বুঝি বড় একটা চাহেন না। ভদ্রলোকের ছেলের পরীক্ষায় পাশ করা দরকার; সুধীরও প্রশংসার সহিত পাশ করিল।

মা কমলা চাহিয়া দেখিলেন, সুধীর পাশ করিয়াছে বটে; কিন্তু তাহার স্বাস্থ্যের কতকটা অবনতি হইয়াছে।

উষা পিতার কাছে 'আব্দার' করিল, "বাবা, দাদার বে' দাও —আমার সইয়ের সঙ্গে"—সই,—সুহাসিনী, শরৎ বাবুর কন্যা।

বাবা হাসিলেন। মা চুপ করিয়া রহিলেন।—কারণ, উষার কথাটা তাঁহার ভাল লাগিয়াছিল। তাঁহার মৌনাবস্থা অনুমোদন-সূচক। সুহাসিনী মেয়ে ভাল, তিন দিনের পরিচয়েও সে বিষয়ে কাহারও সন্দেহ ছিল না। প্রাণকৃষ্ণ বাবু আর একটু হাসিলেন; সেটুকু পত্নীর মৌনভাব লক্ষ্য করিয়া। তিনি বলিলেন, "সুধীরের শরীরটা একটু খারাপ দেখ্‌ছি, একবার পশ্চিম বেড়িয়ে আসুক্; —কালই যাবে, বন্দোবস্ত করেছি।"

ত্রস্তভাবে উষা বলিল,—"বাবা, আমার কথাটার উত্তর?" যেন দাদার বিবাহ সরিয়া গেল, ভাবটা এমনই!

"দিচ্ছি;—দাওতো টেবিলের উপর থেকে একটা চিঠির কাগজ, আর পেন্‌টা"—প্রাণকৃষ্ণের ওষ্ঠাধর হাস্যরঞ্জিত হইয়া উঠিতেছিল।

কমলা বুঝিলেন চিঠির কাগজে কি হইবে। উষা উৎসুক

দৃষ্টিতে মা'র ও বাবার মুখে চাহিয়া ভাবিল "ব্যাপার কি ?"—

প্রায় দশ মিনিট কাল প্রাণকৃষ্ণ বাবু কি লিখিলেন ; তার পর চিঠিখানা উষার হাতে দিয়া কহিলেন, "এই নে তোর উত্তর !"

উষা চিঠি পড়িল ; আনন্দে তাহার সুন্দর মুখখানি রঞ্জিত হইয়া উঠিল।

"বাবা, এই আমি তোমায় 'আশীর্ব্বাদ' কচ্ছি"—প্রাণকৃষ্ণ বাবু ও কমলা হাসিয়া উঠিলেন।

"না বাবা 'প্রণাম' কচ্ছি"—পিতার পায়ের কাছে 'ঢিপ' করিয়া এক প্রণাম করিয়া উষা ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল। ভুলের লজ্জা ও প্রাথিতলাভের আনন্দ তাহাকে চঞ্চল, অস্থির করিয়া তুলিয়াছিল।

"পাগলি মা আমার"—প্রাণকৃষ্ণ বাবু হাসিতে হাসিতে কহিলেন। কমলা সব বুঝিয়াছিলেন, তবু জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি গা ?" "এই শরৎ বাবুর কাছে তাঁর মেয়েটির জন্য প্রস্তাব করে পাঠালুম—হ'ল ত ? এখন বোধ হয় রেতে নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমুতে দেবে ?"

কমলা হাসিলেন। প্রফুল্ল পঙ্কজের উপর প্রথম সূর্য্যরশ্মি-পাতের ন্যায় সে হাসিটুকু বড় উজ্জ্বল—বড় মধুর। পত্নীর তৃপ্তি দেখিয়া প্রাণকৃষ্ণ বাবু তৃপ্ত হইলেন।

৪.

যথাসময়ে সুধীর পশ্চিমে চলিয়া গেল। স্বাস্থ্যলাভের সঙ্গে সঙ্গে যাহাতে সুধীর দেশভ্রমণ দ্বারা অভিজ্ঞতা লাভ করিতে পারে, প্রাণকৃষ্ণ বাবুর সে ইচ্ছা ছিল, এবং তদনুযায়ী বন্দোবস্তও তিনি করিয়া দিয়াছিলেন। সুধীর এক স্থানে বসিয়া রহিল না, পশ্চিমের নানা স্বাস্থ্যকর স্থানে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল।

কয়েক দিন পরে শরৎ বাবুর নিকট হইতে পত্রের উত্তর আসিল। শরৎ বাবু এই বিবাহ-প্রস্তাবে যেন অনুগৃহীত হইয়াছেন, এমনই কৃতজ্ঞতার সহিত পত্রখানি লিখিয়াছেন।

"জানি আমি শরৎ বাবুকে, অমন উদারপ্রকৃতির লোক ছুটি দেখিনি; দেখেছ চিঠি?" প্রাণকৃষ্ণ বাবু হাসিয়া চিঠিখানি পত্নী কমলার হাতে দিলেন। কমলা চিঠি পড়িলেন; ঊষা পিতার পশ্চাৎ হইতে ঝুঁকিয়া পড়িয়া পূর্ব্বেই চিঠি পড়িয়াছিল; এখন বলিল, —"তবে এই মাসেই দাদার বে' দাও"—

প্রাণকৃষ্ণ বাবু হাসিলেন, কহিলেন, "সে বটে—কিন্তু তার যে এক বাধা রয়েছে; দুবার তো আর খরচ করে পেরে উঠ্‌বো না —একেবারেই—"

কমলার চক্ষু দুইটি প্রসন্নতাপূর্ণ হইয়া হাসিতেছিল। ঊষা কথাটা বুঝিল, কি বলিবে 'দিশা' না পাইয়া সে বলিয়া উঠিল, "বাবা, তোমার মাথার সাম্‌নে ক'গাছি চুল পেকেছে দেখ্‌ছি—তুলে দিই?" অনুমতির অপেক্ষা না করিয়াই ঊষা পাকা চুল তুলিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া পিতার দিকে অগ্রসর হইয়া গেল।

৫

মানুষ কল্পনাই করিতে পারে কিন্তু সে কল্পনাকে সার্থকতা দিবার ভার ভগবানের হাতে! কোন্ অলক্ষ্যে বসিয়া নিষ্ঠুর অদৃষ্ট একটু হাসিয়াছিল, তাহা উভয় পক্ষের কেহই জানিতেন না। বিবাহের প্রস্তাব সুস্থির করিয়া ফেলিবার জন্য উভয় পক্ষই ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছিলেন। ইহা আর এখন এক প্রকার কাহারও অবিদিত ছিল না যে, সুধীরের সঙ্গে সুহাসিনীর বিবাহ এক প্রকার স্থিরই হইয়া গিয়াছে। তবু আজ কাল করিয়া পুরা দুই বৎসর কাটিয়া গেল, আর সুহাসিনী চতুর্দ্দশ বৎসর পার হইয়া পঞ্চদশবর্ষে পদার্পণ করিল। যাহাতে শীঘ্র শুভকার্য্য সম্পন্ন হইয়া

যায় উভয় পক্ষেই এমত বন্দোবস্ত চলিতে লাগিল। আর বিলম্ব করা চলে না। কিন্তু এমন সময়ে দেবতার বজ্রের মত আকস্মিক ও নিষ্ঠুর এক বিপৎপাৎ হইল! সে বিপদ্ এতই অপ্রত্যাশিত যে, উভয় পক্ষীয় আত্মীয়গণই একান্ত হতবুদ্ধি হইয়া পড়িলেন।

সেদিন অপরাহ্ণে কাছারী হইতে ফিরিয়া আসিয়া প্রাণকৃষ্ণ বাবু বারাণ্ডায় বসিয়া হাতমুখ ধুইতেছিলেন; হঠাৎ তাঁহার বক্ষের স্পন্দন দ্রুত হইয়া উঠিল; মুখে চক্ষুতে এক অস্বাভাবিক জ্যোতিঃ ও ক্লান্তির ভাব ফুটিয়া উঠিল। প্রাণকৃষ্ণ পার্শ্ববর্ত্তিনী পত্নী কমলাকে সঙ্কেত করিলেন; কমলা স্বামীর অবসন্ন দেহ জড়াইয়া ধরিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন।

প্রাণকৃষ্ণ বাবু সাধ্বী পত্নীর ক্রোড়ে মস্তক রাখিয়া সেই বারাণ্ডায়ই শুইয়া পড়িলেন। উষা মাতার চীৎকার শুনিয়া দৌড়াইয়া আসিয়াছিল; পিতার অবস্থা দেখিয়া জল ও পাখা লইয়া আসিল। কিন্তু জলসেক ও পাখার বাতাস ব্যর্থ হইল। প্রায় পনের মিনিট পরে অমূল্য ডাক্তার আসিয়া রোগীর দেহ পরীক্ষা করিলেন—আপন মনে অস্ফুট স্বরে বলিয়া উঠিলেন, "Eh—past hope!"—কমলার মূর্চ্ছিত দেহলতা স্বামীর শয্যাপার্শ্বে লুণ্ঠিত হইয়া পড়িল!

সন্ধ্যার ধূসর ছায়া যখন ধরণীর উজ্জ্বল শোভা ম্লান করিয়া দিতেছিল, তখন প্রাণকৃষ্ণ বাবু মহাপ্রস্থান করিলেন।

৬

গ্রামের বাড়ীতেই শুদ্ধিকার্য্যাদি সম্পন্ন হইয়া গেল। পিতার মৃত্যুকালে সুধীর কাছে ছিল না, এই ক্ষোভ তাহার হৃদয়ে তীক্ষ্ণ শেলের মত বিদ্ধ হইয়া রহিল। পল্লীর শান্ত মধ্যাহ্নে যখন সুধীর জননী কমলার ক্রোড়ে মস্তক রাখিয়া অন্যমনস্কভাবে দূর আম্রকুঞ্জের শ্যামপল্লব-শোভার দিকে চাহিয়া থাকিত, তখন

তাহার চক্ষুর কাছে পিতার স্নেহদীপ্ত মুখখানির স্মৃতি জাগিয়া উঠিত। তখন আর অশ্রু কোন মতেই বাধা মানিত না। জননী তাঁহার স্নেহহস্ত পুত্রের ললাটে ধীরে ধীরে বুলাইয়া দিতেন। ঘণ্টার পর ঘণ্টা চলিয়া যাইত; উভয়ের তীব্র শোক, যে পবিত্র নিস্তব্ধতার সৃষ্টি করিয়া তুলিত—তাহা অপার্থিব। যে শোকে গুঞ্জন নাই, ভাষা নাই, প্রকাশ নাই, সেই শোকই বোধ হয় সর্ব্বাপেক্ষা তীব্র।

যে দিন ঊষা কাছে থাকিত, সে দিন সেই বুদ্ধিমতী বালিকা, আবদারে কথায় মা'র ও দাদার শোকের দারুণ নীরবতা ভঙ্গ করিত।

শোক-প্রবাহ যখন হৃদয়মধ্যে একান্তই উদ্বেল হইয়া উঠে, তখন সান্ত্বনা লাভের জন্য বুকের কাছে একটা কিছু আঁকড়াইয়া ধরিবার আকাঙ্ক্ষা স্বতঃই প্রবল হইয়া উঠে। কমলার ও সুধীরের স্নেহ উন্মুখভাবে ঊষাকেই বুকের কাছে টানিয়া আনিল; ঊষা প্রলেপের মত এই দুই শোকদিগ্ধ হৃদয়ে লাগিয়া রহিল।

কিন্তু এই শোকের তীব্র আঘাতে পুনরায় সুধীরের স্বাস্থ্যভঙ্গ হইল। আতপতপ্ত কমলপত্রের মত সুধীর শোকের তীব্র সন্তাপে ক্রমেই শুকাইয়া যাইতেছিল। কমলা অস্থির হইয়া উঠিলেন,—সুধীরকে পুনরায় পশ্চিম প্রদেশে স্বাস্থ্যান্বেষণে যাইবার জন্য ধরিলেন;—কিন্তু সুধীর মা'কে রাখিয়া আর কোনও মতে যাইতে স্বীকৃত হইল না। তখন সুধীর মা'কে ও ঊষাকে লইয়া পশ্চিমে কিছু কাল বাস করিয়া আসিবে, এমনই একটা বন্দোবস্ত হইয়া গেল। তাঁহারা কোথায় কিছু অধিক দিন বাস করিবেন, তাহা আর স্থির হইল না; যে স্থান জননীর ভাল লাগিবে সুধীর সেই স্থানেই কিছু দীর্ঘকাল বাস করিবে, মনে মনে ইহাই স্থির করিয়া রাখিল। প্রাণকৃষ্ণ বাবুর মৃত্যুর পাঁচ মাস পরে সুধীর মাতা ও ভগিনীকে লইয়া পশ্চিম চলিয়া গেল।

কালাশৌচের জন্য এক বৎসরের মধ্যে বিবাহকার্য্য হইতে পারিবে না বলিয়া শরৎ বাবু এই শোকের সময়ে বিবাহসম্বন্ধে কোনও কথা উল্লেখ করা সঙ্গত মনে করেন নাই। তিনি শুধু সান্ত্বনা ও সহানুভূতিসূচক চিঠি লিখিতেন; সান্ত্বনা-প্রদানের জন্য যে চিঠি লিখা যায়, তাহার প্রত্যেকখানির উত্তর কেহই আশা করে না; কারণ, শোকের কাছে ভদ্রতার তুচ্ছ খুঁটা নাটী হিসাবগুলি প্রায়ই লুপ্ত হইয়া যায়। শরৎ বাবু প্রায়ই সুধীরের পারিবারিক সংবাদ পাইতেন না; সুতরাং কবে তাহারা পল্লীগ্রামের বাড়ী হইতে পশ্চিমে যাত্রা করিয়াছে, সে সংবাদ শরৎ বাবু পাইলেন না।

শরৎবাবু যখন ছুটী লইয়া পল্লীগ্রামের বাড়ীতে সুধীরের সঙ্গে দেখা করিতে আসিলেন, তখন তাহারা তথায় ছিল না। প্রতিবেশী কেহই তাহাদের সঠিক সংবাদ দিতে পারিল না। শরৎবাবু ফিরিয়া আসিয়া পশ্চিমের নানা স্থানে সংবাদ লইতে চেষ্টা করিয়াও, তাহাদের সম্বন্ধে সঠিক খবর পাইলেন না।

সুহাসিনী এখন আর ছোটটি নহে। হিন্দুর ঘরের মেয়ে আর কত দিন রাখা যায়? শরৎ বাবুর আত্মীয়গণ বলিলেন, "আর মেয়ে রাখা চলে না, সুধীরের যখন খোঁজই নাই, তখন সে অপেক্ষায় বসিয়া থাকা সঙ্গত নহে। ভাল ছেলে দেখিয়া মেয়ের বিবাহ দিয়া ফেল।"

শরৎ বাবু প্রথম প্রথম কথাগুলিতে কাণ দিলেন না, কিন্তু যাঁহারা আত্মীয়তা করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, তাঁহারা সহজে পরামর্শদানে বিরত হইবেন কেন?

এমনই করিয়া কিছু দিন কাটিয়া গেল; শরৎ বাবুর পত্নী চারু আসিয়া বলিলেন, "ওগো, মেয়ের দিকে তো আর চাওয়া যায় না। সুধীরের আশায় আর কত দিন বসিয়া থাকিবে? মেয়ের অদৃষ্টে সুখ থাকিলে হইবে, একটা ঠিক করিয়া ফেল!"

শরৎ বাবুর যেন একটা বিশ্বাস ছিল যে, সুহাসিনীর প্রতি সুধীর বোধ হয় একটু আকৃষ্ট। সেই পিতৃহীন যুবক সুহাসিনীর বিবাহ হইয়া গেলে যে আশাভঙ্গজনিত মনস্তাপটুকু পাইবে, তাহা মনে করিয়াও শরৎ বাবু বুকের মধ্যে একটা অস্বচ্ছন্দতা বোধ করিতেছিলেন। কিন্তু সুধীরের পক্ষে এই মনস্তাপ ও হতাশার পরিমাণ কতটুকু, তাহা শরৎ বাবু বুঝিতে পারিবেন, এমন আশা আমরা করিতে পারি না; সুতরাং পত্নীর কাতর নিবেদন ও আত্মীয়গণের অযাচিত পরামর্শ তাঁহার হৃদয়কে ব্যথিত ও ক্লিষ্ট করিয়া তুলিলেও সাংসারিক হিসাবে তিনি সেগুলিকে অগ্রাহ্য করিতে পারিলেন না।

পুরুষ পৃথিবীর আকর্ষণী শক্তি আবিষ্কার করিতে পারিয়াছে, বিশ্বের চন্দ্রসূর্য্যগ্রহনক্ষত্রের মধ্যে যে সম্বন্ধ, যে রহস্য লুকায়িত আছে, তাহার একটা কিনারা করিতে চাহিবার স্পর্দ্ধাও রাখিতে পারে; কিন্তু এতটুকু বালিকার কোমল হৃদয়ের মধ্যেও যে আকর্ষণ, যে বিশ্ববিপ্লাবী প্রেম গোপন রহিয়াছে, তাহা পুরুষের নিকট চিরদিনই রহস্যাবৃত থাকিয়া যাইবে। শরৎ বাবু ভাবিলেন, সুহাসিনীর হৃদয়ে যদি সুধীরের জন্য এতটুকুও আকর্ষণ থাকিয়া থাকে, তাহা কালক্রমে লুপ্ত হইয়া যাইবে। সুতরাং এখন হইতে সুহাসিনীর বিবাহের চেষ্টা ও আয়োজন সবেগেই চলিতে লাগিল। আর সুহাসিনী? হিন্দুকন্যার 'বুক ফাটে তবু মুখ ফুটে না'— সুতরাং সে নীরবেই সব সহ্য করিতেছিল।

৭

"আর কোন্ তীর্থে যাইবে, মা?"

"কোথাও আর যাইব না, বাবা বিশ্বেশ্বর চরণে স্থান দিন্, এখানেই কিছুদিন থাকিয়া যাইব। আর যদি তুই বাড়ী ফিরিতে স্বীকার করিস্, চল্। কাশীও বুঝি আমার বাড়ীর চেয়ে শ্রেষ্ঠ নহে—যদি তুই ফিরিস্!"

চক্ষু মুদ্রিত করিয়া সুধীর ডাকিল, "মা!"

মাতা কমলা বুঝিলেন, কোথাও পুত্রের আঘাত লাগিয়াছে,—তাঁহার চক্ষু অশ্রুসজল হইয়া উঠিল। তিনি বলিলেন,—"কি বাবা!"

"মা, তুমি যদি বল আমি বাড়ী ফিরিব; যেখানে তুমি, সেইখানেই আমার কাশী।"

কমলা সুধীরের মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে স্নেহকোমল স্বরে কহিলেন, "না, বাবা, আমি কাশীতেই থাকিব, তোর যদি গ্রামে ফিরিতে ইচ্ছা হয়, তাই ও কথা বলিতেছিলাম"—মাতার স্বর গাঢ় হইয়া আসিতেছিল।

সুহাসিনীর বিবাহ-সংবাদ সুধীর ও কমলা পাইয়াছিলেন। সুধীরের শোকদুর্ব্বল হৃদয়ে এই আঘাত তীব্র ভাবেই লাগিয়াছিল। মাতার আন্তরিক ইচ্ছা ছিল, গ্রামে ফিরিয়া গিয়া সুধীরের বিবাহ দেন,—কিন্তু তিনি স্পষ্ট করিয়া সে কথার উল্লেখ করিতে পারিতেন না। গ্রামে ফিরিবার প্রস্তাবের অর্থই যে সুধীরের বিবাহে স্বীকার হওয়া, এটা সুধীর বুঝিত। কত দিন অকারণ অশ্রু আসিয়া সুধীরের গণ্ডস্থল প্লাবিত করিয়াছে; মাতার অঙ্ক-স্পর্শে সুধীর বালকের মত ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটাইয়া দিয়াছে; মাতা কমলা শোকের সে নীরবতা ভঙ্গ করেন নাই। বুক ভাঙ্গিয়া যখন দীর্ঘশ্বাস বাহির হইয়া আসিতে চাহিত, তখন নীরবে সুধীরের মাথায় হাত বুলাইতেন। মাতার আশীর্ব্বাদ ও স্নেহ এমনই করিয়া নীরবে পুত্রকে বেষ্টিত করিয়া রাখিয়া, সকল দুঃখ ও কষ্টের অংশ গ্রহণ করিতে চাহিত। হায়, মাতার স্নেহ!

সে দিন অপরাহ্ণে মেঘ আকাশ ছাইয়া ফেলিয়াছে; দিনের আলো নিবিয়া যায় নাই; তবু এক বিষাদমাখা ম্লান আলোকে সমস্ত কাশী সহরটি আবৃত হইয়া রহিয়াছে। বাহিরে ঘরে বসিয়া সুধীর একটা খবরের কাগজ পড়িতেছিল। সদর দরজা হইতে

একটা লোক ডাকিল, "বাবুজি, এ বাবুজি"—সুধীর বাহিরে আসিয়া দেখিল, টেলিগ্রাফ্ অফিসের একটা পিয়ন; হাতে টেলিগ্রামের খাম।

সুধীর খামখানি গ্রহণ করিয়া দেখিল, তাহার নামেই আসিয়াছে। কে এ টেলিগ্রাম করিল? কম্পিত হস্তে টেলিগ্রাম খুলিয়া সুধীর পড়িল। মর্ম্ম এই—

"মাকে লইয়া তীর্থে আসি, স্ত্রী কলেরায় আক্রান্ত, তুমি নিকটে আছ, শীঘ্র আইস। বিজয়।"

নাম সহি করিয়া দিয়া সুধীর বাড়ীর ভিতরে ছুটিয়া গেল। পিয়নটা বলিতেছিল—"বাবুজি, বক্‌সিস্,"—তাহার কথা সমাপ্ত হইবার পূর্ব্বেই সে চাহিয়া দেখিল, বাবুজি অদৃশ্য হইয়াছেন। "খবর তো জরুরি হ্যায়"—বলিতে বলিতে পিয়ন চলিয়া গেল,—আজি আর সে কিছু পায় নাই—'সিদ্ধি'র কটা পয়সাও নহে!

"আমাদের সঙ্গে পড়্‌ত বিজয়, তাকে তোমার মনে আছে ত, মা! তার মা ও স্ত্রীকে নিয়ে সে প্রয়াগে এসেছে, স্ত্রীর কলেরা, আমাকে যাওয়ার জন্য তার করেছে,"—সুধীর এক নিশ্বাসে বলিয়া গেল।

"কি সর্ব্বনাশ, তারা ত বিদেশে ভারি বিপদে পড়েছে,—তা তুই যাচ্ছিস্ ত?"—কমলা দেবীর কথার মধ্যে একটা দারুণ উৎকণ্ঠার ভাব ফুটিয়া উঠিতেছিল।

"তা,' মা, তুমি বল্‌লেই যেতে পারি।"

"ও মা, তা আর বল্‌ব না! এ বিদেশে তা'দের দেখ্‌বে কে?"

কুন্তীদেবী যে বিশ্বাস লইয়া তাঁহার মধ্যম পুত্রকে রাক্ষসের মুখে পাঠাইয়াছিলেন, কমলার পক্ষে অবলম্বন করিবার মত ততটুকু বিশ্বাস ছিল কি? তবু কি প্রশান্ত হৃদয়ে তিনি একমাত্র পুত্রকে, রাক্ষসের অপেক্ষাও নির্ম্মম ও ভীষণ এক অদৃশ্য দানবের সহিত সংগ্রাম করিতে যাইবার অনুমতি প্রদান করিলেন!

তাঁহার মাতৃহৃদয় সুধীরের সহপাঠীর বিপদ সংবাদে ব্যগ্র ও প্রতীকারপরায়ণ হইয়া উঠিল। রমণীর এ মূর্ত্তি, জগদ্ধাত্রী মূর্ত্তি। ইহার তুলনা অসম্ভব।

যথাসময়ে মাতার আশীর্ব্বাদরূপ অক্ষয় কবচে আবৃত হইয়া সুধীর তাহার সংগ্রামক্ষেত্রের উদ্দেশ্যে যাত্রা করিল।

৮

প্রয়াগে আসিয়া বিজয়ের বাসা খুঁজিয়া লইতে সুধীরের প্রায় রাত্রি দশটা বাজিল।

"বড় বিপদে পড়েছি, সুধীর,—মা'রও বোধ হয় কলেরা হয়েছে।"—ঘরের বাহিরে আসিয়া সুধীরের হাত ধরিয়া বিজয় কহিল।

"তোমার স্ত্রীর অবস্থা কিরূপ, বিজয়?"—সুধীরের স্বর সহানুভূতিপরিপূর্ণ।

"এখনও বেঁচে আছে,—তবে বোধ হয়, শেষ অবস্থা। আমি মা'র কাছে যাই; তুমি তার কাছে যাও। সঙ্কোচ ক'রোনা, সুধীর, শুধু তুমি আর আমি! দেখ, যদি রক্ষা কর্ত্তে পার। এমন বিপদে আর আমি পড়িনি!"

"কলেজে পড়বার সময় 'Little Brothers of the poor' সভ্য হয়ে যে শিক্ষাটা হয়েছিল এবার দেখ্‌ছি তা' কাজে লেগে গেল!"

সুধীর চির দিনই একটু লাজুক প্রকৃতির; কিন্তু সেবাকার্য্যে যখন সে ব্রতী হইত, তখন তাহার সমস্ত সঙ্কোচ ও দ্বিধা কোথায় চলিয়া যাইত। রোগীর অবস্থার জটিলতার সঙ্গে সঙ্গে সুধীরের উৎসাহ বাড়িয়া চলিত। কলেজে থাকিতে বিজয় ও সুধীর কত কলেরা রোগীর শয্যাপার্শ্বে কত বিনিদ্র রজনী কাটাইয়া দিয়াছে; তখন তাহারা স্বপ্নেও মনে করে নাই যে, কলেজের বাহিরেও এমন

একটা দিন তাহাদের জীবনে আসিবে, যে দিন সুদূর প্রবাসক্ষেত্রে তাহাদেরই আপন জনের সেবায় তাহাদের দুই সতীর্থকে এমন ভাবে মিলিত হইতে হইবে!

সুধীর ঘরে প্রবেশ করিয়াই দেখিল, একখানি ছোট চৌকির উপর ঔষধের শিশিগুলি সাজান রহিয়াছে। পার্শ্বে কয়েকটা কাচের বাটার মধ্যে প্লেট্ দিয়া ঢাকা, কিছু লেবু, বেদানা ইত্যাদি। আর একখানি কাগজে কখন্ কোন্ ঔষধ খাওয়ান হইয়াছে এবং খাওয়াইতে হইবে, তাহারই একটা 'চার্ট' লিখিত রহিয়াছে। একবার দৃষ্টিপাত করিয়াই সুধীর বুঝিল, সবই ঠিক আছে; বিজয় "সেবা সমিতির" সেবাপ্রণালীর এতটুকুও ভুলিয়া যায় নাই!

সেই অতীত দিনের মত আজ আবার সুধীর সেবা করিতে পাইবে, ইহা মনে করিয়া, তাহার প্রাণে তেমনই উৎসাহ জাগিয়া উঠিল। একটা ওয়াললাম্পের মৃদু আলোকে গৃহটি অনুজ্জ্বল ভাবে আলোকিত ছিল,—সুধীর আলোক উজ্জ্বল করিয়া দিয়া, রোগিণীর শয্যাপার্শ্বে ভূনতজানু হইয়া উপবেশন করিল; নাড়ী দেখিবার জন্য রোগিণীর হাতখানি তুলিয়া লইল। সে হস্ত শীতল দেখিয়া সুধীর সেকের বন্দোবস্ত করিবার জন্য উঠিল।

অস্পষ্ট ক্ষীণকণ্ঠে "প্রাণ যায়—মা গো—জল"—বলিয়া রোগিণী একবার মস্তক চালনা করিল।—তখন তাহার অবগুণ্ঠনমুক্ত মুখখানির উপর সুধীরের দৃষ্টি পড়িল; একটা অস্ফুট বিস্ময়সূচক শব্দ তাহার মুখ দিয়া বাহির হইয়া গেল। এ যে সুহাসিনী!

কিন্তু তখন ত আর তাহার বিস্ময় প্রকাশের অবসর নাই! আপনাকে সংযত, স্থির করিবার জন্য যে শক্তিটুকু সে তাহার দীর্ণ হৃদয়ের উপর প্রয়োগ করিল, সেই শক্তিই তাহাকে যেন মূর্চ্ছাতুর করিয়া তুলিতেছিল! তাহার পদতল হইতে যেন হর্ম্ম্যতল সরিয়া যাইতেছিল; সে একটা আল্‌নার কাঠ ধরিয়া দাঁড়াইল। হায়, কি সংগ্রাম তাহার বুকের মধ্যে এই এক

মুহূর্ত্তকাল চলিয়াছিল, কে তাহা বুঝিবে? বিশ্বের ঠাকুর কি মানুষের এই দুর্ব্বলতাটুকু ক্ষমা করিবেন?

"জল,"—আবার রোগিণীর মৃদু অস্পষ্ট কণ্ঠধ্বনি শুনা গেল। সুধীর চমকিয়া উঠিল; অনুতাপ ও লজ্জা আসিয়া যেন তাহাকে কশাঘাত করিল। বন্ধুপত্নী,—এবং বন্ধু বিশ্বাস করিয়া, এতটুকু দ্বিধা, এতটুকু সঙ্কোচ না করিয়া, তাহার উপর মৃত্যুপথযাত্রিণী পত্নীর শুশ্রূষাভার অর্পণ করিয়াছেন,—ইহাই কি তাহার পক্ষে যথেষ্ট নহে? বড় একটা গর্ব্ব, একটা সংযত আত্মবোধ তাহার প্রাণের মধ্যে জাগিয়া উঠিল। আজ তাহাকে এ সংগ্রামে, এ পরীক্ষায় জয়লাভ করিতেই হইবে।

একটু লেবুর রস করিয়া সে রোগিণীর মুখের নিকটে লইল—রোগিণী প্রায় সংজ্ঞাশূন্যা; কি বলিয়া সে ডাকিবে? সুধীর দন্তে আপনার ওষ্ঠ চাপিয়া একবার উপরের দিকে চাহিল—তাহার পর হৃদয়ের সমস্ত বল একত্র করিয়া বলিল—"খাও ত, লক্ষ্মী দিদিটি আমার!"

ঐ একটি আহ্বানেই যেন তাহার সমস্ত দুর্ব্বলতা কাটিয়া গেল;—তখন সে সহজ শান্তভাবে নিশ্বাস ফেলিবার অধিকার পাইয়া, যেন একটি পরম নিশ্চিন্ততা অনুভব করিল।

সুধীর যখন লেবুর রসটুকু সুহাসিনীর মুখে ঢালিয়া দিতেছিল, তখন সে একবার সুধীরের মুখের দিকে চাহিল; দেখিল, স্বামী নহে—আর কেহ,—কে সে? সেই আধ জাগরণ, আধ তন্দ্রার মধ্যে, সেই জীবন ও মৃত্যুর সন্ধিস্থলে দাঁড়াইয়াও সুহাসিনী চিনিল, সে কে। সে যে সুধীরকে চিনিতে পারিল, সে অপরাধ তাহার নহে। তাহার দীর্ণ নারীহৃদয়ের অন্তরালে যে মূর্ত্তিখানি সে বিস্মৃতির নিম্নে সবলে চাপিয়া রাখিতে চাহিয়াছিল, আজ সেই মূর্ত্তি, তাহাকে দুর্ব্বল পাইয়া, বিস্মৃতির স্তূপ ঠেলিয়া, বাহির হইয়া আসিয়াছে কি? সে শুনিয়াছে, বিকারের মোহে মানুষ

নানাপ্রকার মূর্ত্তি দেখে, স্বপ্ন দেখে ; তবে কি সে স্বপ্ন দেখিতেছে ? তন্দ্রার ঘোরে তাহার চিন্তার শৃঙ্খলা ভাঙ্গিয়া যাইতেছিল ; তবু সে বুঝিতেছিল, স্বামীর হস্ত হইতেও সেবানিপুণ দুইখানি হস্ত তাহার শুশ্রূষায় প্রাণপণে নিযুক্ত রহিয়াছে। দুইবার সে নিষেধ করিবে মনে করিয়াছিল ; কিন্তু তখনই রোগযাতনার আকুলতায় সে ভুলিয়া গিয়াছে, কি বলিবে। শুধু পিপাসা ;—আর সেই পিপাসার শান্তির জন্য জল—একটু জল !—ইহা ব্যতীত তাহার মুখ দিয়া আর কোন কথাই বাহির হইল না !

শেষ রাত্রিতে সুহাসিনীর অবস্থা একটু ভাল দেখা গেল। বিজয় মৃদুস্বরে আসিয়া রোগিণীর শয্যাপার্শ্বে দাঁড়াইল, ডাকিল, "সুধীর !" সুধীর তখন একটা কেট্‌লিতে সেক্‌ দিবার জন্য জল গরম করিতেছিল—ফিরিয়া উত্তর দিল—"কি, বিজয় ?"—তাহার পর ইঙ্গিতে জিজ্ঞাসা করিল "মা'র অবস্থা কেমন ?"

"বুঝিতে পারিতেছি না, একবার যাইও।"—পীড়িতার কাণে কথা না যায় এমনই মৃদুস্বরে বিজয় কথা কহিল।

সুহাসিনীর জ্ঞানসঞ্চার হইতেছিল ; স্বামীর অস্পষ্ট কথার স্বর তাহার কাণে গেল। সংজ্ঞালুপ্তির আবেশ তখনও তাহার দৃষ্টিতে পূর্ণভাবে বর্ত্তমান।

এই স্বামী—কি প্রেমময় তাঁহার হৃদয় ! বিবাহিত জীবনের এই বৎসরাধিক কাল সে তাঁহাকে তাঁহার আদর ও যত্নের এতটুকুও প্রতিদান করে নাই ! স্বামী যখন হৃদয়ের পূর্ণ আবেগ লইয়া তাহার কাছে আসিয়া ডাকিয়াছেন, তখন সে কতবার কাজের 'অছিলা' করিয়া চলিয়া গিয়াছে। হায়, কেন সে গিয়াছে ? সে নিজেই তাহা ভাল করিয়া বুঝিতে পারে নাই। স্বামীর হৃদয়ের পরিপূর্ণতা তাহাকে একান্ত ভাবে কুণ্ঠিতই করিয়া তুলিয়াছে—তাহার হৃদয়ের দৈন্য আরও সুস্পষ্টভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। সে যে অকপট চিত্তে স্বামীকে সবটুকু দিতে পারে

নাই! কেন পারে নাই, কোথায় তাহার বাধা, তাহা ত বলিবার নহে!

জীবন ও মরণের সন্ধি স্থলে দাঁড়াইয়া আজ তাহার দুর্ব্বল হৃদয় আরও কাতর হইয়া উঠিল; সুধীর কাছে আছে, আজই স্বামীকে সবটুকু দান করিবার উপযুক্ত মুহূর্ত্ত আসিয়াছে,—ইহার পরেই হয় ত পৃথিবীর সঙ্গে তাহার সব সম্বন্ধ শেষ হইয়া যাইবে; তাহা হইলে এ জীবনে ত আর স্বামীকে সবটুকু দেওয়া হইল না!

সুহাসিনী একবার সুধীরের মুখের দিকে চাহিল; ক্লান্তির আবেগে তাহার চক্ষুর পাতা ভাঙ্গিয়া আসিতেছিল, তবু সে আবার স্বামীর মুখে দৃষ্টি স্থির করিল। পিপাসায় তাহার কণ্ঠ শুষ্ক হইয়া আসিল। ঘরের আলোটা যেন নিভিয়া গিয়াছে; এমনই ভাবে একটা কালো ছায়া তাহার চক্ষুর উপর নাচিয়া উঠিল!—এই বুঝি মৃত্যু!—

ওগো, তাই কি? তবে ত আর অবসর হইল না!—সুহাসিনী প্রাণপণ করিয়া ডাকিল—"বড় পিপাসা, একটু জল দিন্, দাদা!"

তাহার অন্তরে কি সংগ্রাম চলিতেছিল, তাহা কি কেহ বুঝিয়াছে? তখন তাহার তন্দ্রার মোহ আবার তাহাকে চাপিয়া ধরিল! চমকিত সুধীর শয্যার পার্শ্বে সরিয়া আসিল; তাহার চরণ টলিতেছিল—মাথা ঘুরিতেছিল; সে শয্যাপার্শ্বে বসিয়া বলিল, "এই জলটুকু খাও, লক্ষ্মী দিদি আমার!"

সুধীরের দেওয়া জল এবার সুহাসিনীকে তৃপ্ত করিল,—তাহার নিশ্বাস সহজ হইয়া আসিল; তাহার মুখে চক্ষুতে একটা আরামের ভাব ফুটিয়া উঠিল। বিজয় কহিল "সুধীর ও ঘরে একবার মা'কে দেখ্তে যেও"—তার পর সেই দেবপ্রকৃতি যুবক মাতার সেবার জন্য পার্শ্বের কক্ষে চলিয়া গেল। সুধীর ও সুহাসিনীর হৃদয়ের উপর দিয়া যে একটা প্রলয়ঙ্কর ঝটিকা বহিয়া গিয়াছে বিজয় তাহার কিছুই জানিল না!

প্রবল ঝটিকান্তে পৃথিবী যেমন শান্ত, স্থির হইয়া নবোদিত সূর্য্যকে অভিনন্দন করিতে থাকে, সুধীরও সেদিনকার প্রভাতকে তেমনই করিয়া অভিনন্দন করিল। আজ তাহার হৃদয় শান্ত, স্থির, সম্ভ্রমময়।

৯

চার দিন পরে সুধীর বারাণসী ধামে ফিরিয়া আসিয়া জননীর চরণে প্রণাম করিল, কহিল, "মা, বাড়ী চল।"

জননী কমলা মনে মনে বিশ্বেশ্বরের নাম জপ করিলেন—তবে কি অনাদিনাথ তাঁহার প্রার্থনায় কর্ণপাত করিয়াছেন?

জননী বলিলেন, "বাবা, সুধীর—বাড়ী কি আমার বারাণসী হবে?"—

"তা' তুমি জান, মা। আমার মা যেখানে, সেখানেই আমার বারাণসী"—বলিয়া সুধীর একটু হাসিল!

"আর আমার মা"—জননীর তৃপ্ত কণ্ঠের বাণী শেষ হইবার পূর্ব্বেই ঊষা কোথা' হইতে ছুটিয়া আসিয়া কহিল "দাদা, বিজয় বাবুর স্ত্রী কেমন?"

"আরাম হয়েছে,—সে যে সুহাসিনী, ঊষা,"—সুধীর একটু হাসিল।

ঊষা ও কমলা দেবী চমকিতা হইয়া উঠিলেন;—জননী আর একবার পুত্রের মুখের দিকে চাহিলেন, দেখিলেন, সে মুখ নির্ম্মল, প্রশান্ত, গরিমাময় হাস্যদীপ্তিতে প্রোজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে।

সরকার ঝি

১

ফৌজদার সাহেবের লুব্ধদৃষ্টি হইতে বিধবা কন্যা উৎপল কুমারীকে রক্ষা করিবার জন্য রামরতন সরকার একদিন রাত্রির ঘনান্ধকারের মধ্যে পৈতৃক বাসস্থানের মায়া পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিলেন। রামরতন বুঝিয়াছিলেন, লোকালয়ে আর তাঁহার স্থান নাই! অরণ্যে হিংস্র জন্তু হিংসা করিতে পারে, কিন্তু বিপদ মানুষের মত তাহার সম্মান নষ্ট করে না! সুতরাং লোকবিরল গভীর অরণ্যকেই রামরতন বরণ করিয়া লইলেন।

বীচিবিক্ষোভিত ভৈরবের তীরে বিস্তৃত অরণ্যানী! একদিন কাঠ কাটিতে আসিয়া একদল কাঠুরিয়া সভয়ে দেখিল, সেই বিস্তৃত অরণ্যানীর একাংশ কে পরিষ্কার করিয়া ছোট কয়খানি কুটীর তুলিয়াছে! কুটীর কয়খানি মৃৎপ্রাচীর দ্বারা পরিবেষ্টিত! এক সৌম্যমূর্ত্তি বৃদ্ধ, আর এক অপূর্ব্বরূপশালিনী কন্যা, সে কুটীরের অধিবাসী! কাঠুরিয়ার দল দূর হইতে প্রণাম করিয়া চলিয়া গেল! দিনান্তে কেহ সঞ্চিত মধুভাণ্ড, আর কেহবা আহরিত কাষ্ঠের স্তূপ কুটীর দ্বারে রাখিয়া গেল! সে যেন দেবতার মন্দির-দুয়ারে ভক্তিনত সেবকের পূজা উপহার!

নিরক্ষর অসভ্য কাঠুরিয়ার দল নিত্য যথাসাধ্য উপহার লইয়া আসিয়া দেখে, সেই বিজন অরণ্যের মধ্যেও একখানি মাতৃহৃদয় তাহাদের জন্য উন্মুখ হইয়া অপেক্ষা করিতেছে! অন্নপূর্ণার ন্যায়, সেই মাতৃমূর্ত্তি তাঁহার স্বহস্তপরিবেষিত অন্নে তাহাদিগকে তৃপ্ত করেন,—আর তৃষ্ণায় সুপেয় ব্যবস্থা করিয়া তাহাদিগের শ্রম দূর

করেন!—এমনি করুণার্দ্রহৃদয়া তিনি! নগণ্য দরিদ্র কাঠুরিয়া,—তাহাদের সাংসারিক অসচ্ছলতা, হৃদয়ের বেদনা, কিছুই তো সেই দেবীর অজ্ঞাত ছিল না!

ধীরে ধীরে সেই মৃৎপ্রাচীরপরিবেষ্টিত কুটীর কয়খানি বেড়িয়া, এক ক্ষুদ্র কাঠুরিয়া পল্লী, কাহার মায়াময় 'সোণার কাঠির' স্পর্শে জাগিয়া উঠিল! বিজন অরণ্য যেখানে ছিল, সেখানে আড়ম্বর-বিহীন এক ক্ষুদ্র লোকালয়ের সৃষ্টি হইল! উৎপলকুমারী সে অরণ্যবেষ্টিত ক্ষুদ্র পল্লীটীর অধিষ্ঠাত্রী দেবী,—অধিরাণী।

সেই দীন কাঠুরিয়াপল্লীর ক্ষুদ্র নগ্ন শিশুটী হইতে আরম্ভ করিয়া, মূক গোবৎসটী পর্য্যন্ত তাহার স্নেহরাজ্য সমভাবে অধিকার করিয়াছিল। কুটীরে কুটীরে উৎপলকুমারীর পুণ্য নাম শ্রদ্ধা ও ভক্তির সহিত উচ্চারিত হইত।

২

ফৌজ্‌দার সাহেব দেখিল, ক্ষুদ্র সরকার রামরতন তাহার চোখে ধূলি দিয়া পলায়ন করিয়াছে! রোষে, ক্ষোভে, তাহার লালসা সহস্র গুণ বাড়িয়া উঠিল! একটা নগণ্য সরকার, কি তাহার সাহস! কিন্তু বিশাল দুনিয়ার কোথায় যাইয়া সে লুকাইবে? ফৌজ্‌দারের গুপ্তচর পল্লীতে পল্লীতে, নগরে নগরে, খুঁজিয়া দেখিল, কিন্তু কোথায়ও রামরতন ও তাহার কন্যাকে পাওয়া গেল না! নিষ্ফল আক্রোশের বহ্নিতে ফৌজ্‌দার নিজেই দগ্ধ হইতে লাগিল!

কিন্তু লালসা ও প্রতিহিংসা মানুষকে স্থির থাকিতে দেয় না! ফৌজ্‌দার এক অভিনব উপায়ে তাহার প্রতিহিংসাবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য উগ্র হইয়া উঠিল!

রামরতন সরকার ধনশালী বলিয়া খ্যাত ছিলেন। তাঁহার পলায়নের অব্যবহিত পরেই ফৌজ্‌দারের লোক যাইয়া রামরতনের

বাড়ী লুণ্ঠন করিয়া আনিল।—লুণ্ঠিত দ্রব্যাদির মধ্যে পাওয়া গিয়াছিল ;—উৎপলকুমারীর একখান তস্‌বীর! কি সুন্দর সেই তস্‌বীরলিখিত মূর্ত্তিখানি! গুচ্ছে গুচ্ছে ভ্রমরকৃষ্ণ কুঞ্চিত অলকদাম বাহুতে, অংসে উরসে ছড়াইয়া পড়িয়াছে! আর সেই প্রশান্ত নীলাব্জ-সুন্দর আয়ত চক্ষু দুইটা, আবেশলেশহীন ;—তবুও কি কোমল, কি মধুময়, কি বিশ্বাসপ্রদীপ্ত তাহার দৃষ্টিভঙ্গিটি! দেখিয়া দেখিয়া ফৌজ্‌দারের মস্তক ঘুরিয়া গেল!

ক্রূর সর্প যেমন তাহার বিদ্যুৎবর্ষী তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিকটস্থ খাদ্যের প্রতি নিবদ্ধ করে, ফৌজ্‌দার তেমনি করিয়া উৎপলকুমারীর পবিত্র আলেখ্যখানির দিকে চাহিয়া চাহিয়া তাহার কর্ত্তব্য স্থির করিতেছিল! দুইদিন পরে সন্ধ্যাবধূ যখন আপনার ধূসর অঞ্চলখানি দিয়া ধরণীর নগ্নপৃষ্ঠ ঢাকিয়া দিতেছিলেন, তখন ফৌজ্‌দার নবাবজাদার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য বাহির হইল! উৎপলকুমারীর তস্‌বীর সঙ্গে লইতে সে ভুলে নাই।

৩

চৈত্রের শেষ। দুই জন অতিথি উৎপলকুমারীর স্থাপিত কাঠুরিয়াপল্লীর মধ্যে প্রবেশ করিল। অঙ্গে তাহাদের কাঠুরিয়ার বেশ, কিন্তু সেই মলিন বেশের অন্তরাল হইতেও তাহাদের বিলাসপুষ্ট দেহাংশ বাহির হইয়া পড়িতেছিল। তবু পল্লীজননীর নিরক্ষর সরলপ্রাণ, কাঠুরিয়া সন্তানগণ, এই দুই ছদ্মবেশী অতিথিকে নিঃসন্দেহে পল্লীতে স্থান দান করিল!

নিদাঘের আরম্ভেই প্রতিবৎসর ভৈরবের জল লবণাক্ত হইয়া উঠে; তখন পানীয় জলের একান্তই অভাব ঘটে। রামরতন ও উৎপলকুমারী পল্লীর মধ্যস্থলে এক প্রকাণ্ড দীর্ঘিকা খনন করাইতেছিলেন, এবং দীর্ঘিকার কূলে এক সুদৃশ্য দেবমন্দির গঠিত হইতেছিল। পলায়ন করিয়া আসিবার

কালে রামরতন তাঁহার গৃহদেবতা ৺দধিবামন দেববিগ্রহকে সঙ্গে করিয়া আনিয়াছিলেন। মন্দিরে উক্ত দধিবামনদেবের প্রতিষ্ঠা হইবে।

আগত অতিথিদ্বয়ের একজন দুইদিন পরেই চলিয়া গেল। অন্যজন 'ছুতা' করিয়া পল্লীতেই রহিয়া গেল। বৈশাখী পূর্ণিমার দিন দীঘিকা ও মন্দির উৎসর্গীকৃত হইবে, সে সেই উৎসব প্রত্যক্ষ করিয়া চলিয়া যাইবে।

ছদ্মবেশী অতিথি এ কয়দিন কল্যাণময়ী উৎপলকুমারীকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখিতেছিল! কি সহজ, সরল গতি! সপ্তমীর দেবী প্রতিমার ন্যায় সে মূর্ত্তি, উজ্জ্বল, প্রশান্ত গরিমাময়ী! যে আবেশ-মুগ্ধ দৃষ্টি লইয়া সে প্রথমবার উৎপলকুমারীর দিকে চাহিয়াছিল, দুইদিন পরে সে দৃষ্টি সংযত হইয়া আসিল। কয়দিনের মধ্যে তাহার কঠিন হৃদয় ভক্তিতে নম্র, শ্রদ্ধায় আনত হইয়া পড়িল! পুণ্যের প্রভাব কোন্ ছন্দে মানুষের বিদ্রোহী হৃদয়ের মধ্যে প্রবেশ করিয়া সে হৃদয়কে জয় করে, তাহা বুঝা কঠিন! কণ্ঠে বিজয় মাল্য ধারণ করিয়া পুণ্যলক্ষ্মী যখন বিদ্রোহী হৃদয় হইতে হাসিতে হাসিতে বাহির হইয়া আসেন, সে তখনই প্রথম তাঁহাকে দেখিয়া অবাক্ হইয়া যায় ও পুনঃ পুনঃ নীরব ভাষায় অভিনন্দন করিতে থাকে।

যে উদ্দেশ্য সাধন করিবার জন্য অতিথি ছদ্মবেশে এই দীন কাঠুরিয়াপল্লীতে আসিয়াছিল, আজি সে কথা সে তো কল্পনায় ও মনে আনিতে ঘৃণা বোধ করিতেছিল! কিন্তু কেমন করিয়া সে এই বিপন্না উৎপলকুমারীকে রক্ষা করিবে?

আর তিন দিন পরে বৈশাখী পূর্ণিমা; উৎসবস্বপ্নে সমগ্র কাঠুরিয়াপল্লীটি বিভোর হইয়া রহিয়াছে। কিন্তু এই উৎসব ও আনন্দ সঙ্কেতের অন্তরালে যে এক সয়তানের দানবী-লীলা লুক্কায়িত রহিয়াছে, বিশ্বস্ত-হৃদয় কাঠুরিয়াগণের কেহই তো তাহা জানে না!

আর উৎপলকুমারী—বৃদ্ধ রামরতনের নয়নামৃতবর্ত্তি উৎপলকুমারী! সেই দীর্ঘিকার প্রশান্ত কালো জলরাশির ন্যায় তাহার হৃদয়খানি শান্ত, স্থির! কোথায় সেই মনোমোহন শ্যামসুন্দরের চির নবীন বাঁশিটী বাজিয়া উঠিয়াছে, হৃদয় বুঝি কাণ পাতিয়া, তন্ময় হইয়া তাহাই শুনিতেছিল!

৪

তুচ্ছ এক কুরঙ্গিণী,—তাহাকেই বন্দিনী করিবার জন্য কি বিপুল আয়োজন ও ষড়যন্ত্র চলিতেছিল!

ভৈরবের বক্ষে ছোট ছোট তরঙ্গ, শুভ্র জ্যোৎস্নার সংস্পর্শে তরল রৌপ্যরাশিবৎ জ্বলিতেছিল! বৈশাখী চতুর্দ্দশীর রাত্রি,—জ্যোৎস্নাপ্লাবিত; আকাশের গায়ে খণ্ড, লঘু মেঘ ভাসিয়া যাইতেছিল! নিদ্রাভঙ্গে স্বপ্নস্মৃতির ন্যায়, সে মেঘখণ্ডগুলি কোমল ও চঞ্চল—তেমনি আবেশমধুর!

পল্লীর নিম্নে ভৈরবের তীরে তীরে, ঝোপের আড়ালে, বৃক্ষের ছায়ায়, ছোট কয়খানি 'ছিপ্' আসিয়া ভিড়িল। পল্লীর অতিথি ধীরে ধীরে একখানি নৌকার কাছে আসিয়া সঙ্কেতধ্বনি জ্ঞাপন করিল,—ছিপ্ তীরে ভিড়িয়া তাহাকে তুলিয়া লইল। খানিকটা উজাইয়া ছিপখানা বাঁকের মাথায় গেল; সেখানে এক সুদৃশ্য 'বজ্‌রা' বাঁধা ছিল! অতিথি বজ্‌রায় উঠিল,—ভিতরে যাইবার কালে, দরজা হইতেই কুর্ণিশ করিতে করিতে প্রবেশ করিল। বজ্‌রার আরোহী স্বয়ং নবাবজাদা!

তখন সেই বজ্‌রার একটি সুসজ্জিত কক্ষের মধ্যে এক মন্ত্রণাসভা বসিয়া গেল! সভার সভ্যগণ,—নবাবজাদা ও তাঁহার বাসনানলের ইন্ধনদাতা পার্শ্বচর মোসাহেবের দল!

অনেক বিতর্কের পর স্থির হইল, সেই অতিথিই পুনরায় পল্লীতে যাইবে, এবং প্রদত্ত পরামর্শানুযায়ী কার্য্য করিবে। সেই মুহূর্ত্ত

হইতে পল্লীর চতুর্দ্দিকে সতর্ক পাহারা বসিল। অগোচরে আর কাহারও পল্লীর বাহিরে যাইবার উপায় রহিল না।

অতিথি ধীর পাদবিক্ষেপে পল্লীতে পুনঃ প্রবেশ করিল। তাহার অন্তরে অন্তরে কি এক নিদারুণ ঝটিকা সংক্ষুব্ধ হইয়া উঠিতেছিল! এই উৎপলকুমারীর মূর্ত্তিখানি, শান্তোজ্জ্বল দেবী-প্রতিমার ন্যায় তাহার চক্ষের সম্মুখে, কি এক অপূর্ব্ব গরিমায় মণ্ডিত হইয়া ফুটিয়া উঠিতেছিল। সেই স্নিগ্ধ, কান্ত মূর্ত্তিটীর সম্মুখে মানুষ আপনা হইতেই শ্রদ্ধায় ও ভক্তিতে আনত হইয়া পড়ে। পথের কর্দ্দমে লুকানো রত্ন যেমন প্রবল বারিপাতের পর বাহির হইয়া পড়িয়া দুর্দ্দিনের অন্ধকারের মধ্যেও আপনার স্নিগ্ধালোকে ভাস্বর হইয়া উঠে, অতিথির হৃদয়স্থিত দেবত্বও তেমনি আজিকার শ্রদ্ধা ও ভক্তির প্রবল অনুভূতির মধ্যে, অপবিত্রতার অন্তরাল হইতে প্রকাশিত হইয়া পড়িতেছিল! হায়, কেমন করিয়া সে আজি উৎপলকুমারীকে রক্ষা করিবে!

পল্লীপথে ধীরে ধীরে অতিথি অগ্রসর হইতেছিল; আজিকার যামিনী প্রভাত হইলে এই পল্লীপথে প্রকাশ্য দিবালোকে এক উৎসব ও আনন্দ কোলাহল জাগিয়া উঠিবে; তারপর দিনের আলোক যখন নির্ব্বাপিত হইয়া, চরাচর বৈশাখী পূর্ণিমার উজ্জ্বল জ্যোৎস্নায় হাসিয়া উঠিবে, তখন,—হায়, হায়, কি হইবে তখন? —সে আর ভাবিতে পারিল না! এতক্ষণ সে মোহাবিষ্টের মত চলিয়াছে—হঠাৎ চক্ষু চাহিয়া দেখিল, সে রামরতনের নাতিপ্রশস্ত প্রাঙ্গণে দণ্ডায়মান! আর তাহার চিন্তা করিবার মত শক্তি বা অবসর ছিল না! বুকের ভিতর হইতে এক অশরীরী বাণী বাহির হইয়া আসিয়া তাহার কাণের কাছে কি মন্ত্র পড়িতেছিল! কি বিপুল সে মন্ত্রের শক্তি!

বিশ্ব তখন জ্যোৎস্নাতরঙ্গে স্নান করিয়া হাসিতেছিল,—আকাশে, বাতাসে কি এক পুলকাবেগ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতেছিল!

অতিথি অনুভব করিতেছিল, তাহার বুকের মধ্যে যে পুণ্য মন্ত্র ধ্বনিত হইতেছে, যেন তাহারি অনুসরণ সারা বিশ্ব প্লাবিত করিয়া দিয়াছে! তাহার হৃদয়তন্ত্রী যেন এই মুগ্ধ বিশ্বের সহিত একই সুরে বাঁধা!

সে ধীরে ধীরে ডাকিল—"সরকার মহাশয়!"

দুইবার ডাকিতেই রামরতন সরকার উঠিয়া আসিলেন। কি পুণ্য সম্ভ্রমময় শান্ত মূর্ত্তিখানি!

অতিথি সবিস্ময়ে দেখিল, যে স্নিগ্ধ কোমল পুণ্য জ্যোতিতে বিশ্ব উদ্ভাসিত,—সে জ্যোতিঃ বৃদ্ধের মুখে চোখেও ফুটিয়া রহিয়াছে।

৫

রামরতন সন্ধান লইয়া জানিয়াছিলেন, ভৈরবের তীরে তীরে বহু সৈন্য গোপনে 'জমায়েৎবস্ত' রহিয়াছে। আর পল্লী চতুর্দ্দিকে সতর্ক প্রহরিগণকর্ত্তৃক এমনি পরিবেষ্টিত যে পলায়ন অসম্ভব! উৎসবমত্ত কাঠুরিয়াগণ আজি আর পল্লীর বাহিরে যায় নাই— কোনও সংবাদই রাখে না!

শত্রুপক্ষকে বাধা দিতে গেলেও বৃথা জনক্ষয়ই হইবে; নিরস্ত্র কাঠুরিয়ার দল, সশস্ত্র সৈন্যগণের সম্মুখে কতক্ষণ দাঁড়াইবে? তাই রামরতন আর ভক্ত কাঠুরিয়াগণকে এ বিপদ সংবাদ জানান নাই। রামরতন তবু একবার লড়িয়া দেখিবার জন্য ইচ্ছুক ছিলেন। কিন্তু উৎপলকুমারী বাধা দিল! তুচ্ছ প্রাণের মমতায় এই সন্তানতুল্য কাঠুরিয়াগণের রক্তপাত কেমন করিয়া চক্ষে দেখিবেন? আর আজিকার এই পুণ্য উৎসব, বিপদ্‌বার্ত্তা প্রচারিত হইলে তখনই শেষ হইয়া যাইবে! যাহা এতকালের আকাঙ্ক্ষিত স্বপ্নকল্পনা, আজ সার্থকতার মুহূর্ত্তে কেমন করিয়া তাহাকে ভাঙ্গিয়া দিবেন?

"মা, প্রাণ তুচ্ছ, কিন্তু সম্মান"—বাষ্প-জড়িত কণ্ঠের বাণী শেষ হইল না!

"বাবা, হিন্দুর মেয়ে আমি, আমার সম্মান অব্যাহতই থাকিবে" —ধীর কণ্ঠে উৎপলকুমারী কহিল।

বৃদ্ধ আর কথা কহিলেন না। গৌরবে তাঁহার বক্ষ পূর্ণ হইয়া উঠিল।

৬

বৈশাখী পূর্ণিমার সন্ধ্যা। দধিবামন দেবের মন্দিরে আরতি হইতেছিল। আজ প্রভাতেই এক শুভ মুহূর্ত্তে বিগ্রহ মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত ও দীর্ঘিকা উৎসর্গীকৃত হইয়াছে! রামরতন মন্দিরের সম্মুখে দাঁড়াইয়া—বিগ্রহের মুখের দিকে চাহিয়া রহিয়াছেন। তাঁহার মূর্ত্তি প্রশান্ত, চক্ষু অশ্রুসজল!

প্রশস্ত প্রাঙ্গণে কাঠুরিয়াগণ সমবেত হইয়াছে; তাহাদের মুখে উল্লাসলেখা, চক্ষুতে আনন্দদীপ্তি! যে বিপদের কালো মেঘ ঘনাইয়া আসিতেছিল, তাহা কাঠুরিয়াগণের সম্পূর্ণ অপরিজ্ঞাত।

মন্দিরের মধ্যে গললগ্নীকৃতবাসা উৎপলকুমারী ধূপদানীতে ধূপ, অগুরু, কুঙ্কুম, চন্দন নিক্ষেপ করিতেছিল। আরতির সুগন্ধি ধূমরাশি পুঞ্জীভূত হইয়া মন্দির আচ্ছন্ন করিতেছিল—আর অপূর্ব্ব রূপশালিনী উৎপলকুমারীর ললিত দেহলতা, সেই পবিত্র ধূমপুঞ্জে আবৃত হইয়া নবীন নীরদের কোলে স্থির সৌদামিনীবৎ শোভা পাইতেছিল। সে মূর্ত্তি অচঞ্চল, ভক্তিরসাপ্লুত। আজ তাহার কর্ণে কোন এক অদৃষ্টপূর্ব্ব দেবলোকের মধুসঙ্গীত বাজিয়া উঠিয়াছে। তাহার হৃদয়বীণায় চিরদিন যে সুর ঝঙ্কৃত হইয়াছে, সে যেন সেই স্বর্গলোকাগত সঙ্গীতেরি মনোমোহন রেশটুকু!

অতিথি ধীরে ধীরে উঠিয়া আসিল। রামরতন তাহার ইঙ্গিতে চমকিয়া উঠিলেন! ক্ষুদ্র এতটুকু একটি ইঙ্গিত।—কি বিপুল অর্থ তাহার পশ্চাতে লুকাইয়া রহিয়াছে!

রামরতন ধীরে ধীরে আসন ত্যাগ করিয়া মন্দিরমধ্যে উঠিয়া আসিলেন—ডাকিলেন—"মা"—

উৎপলকুমারী একবার পিতার মুখের দিকে চাহিল,—বুঝিল, তাহার আহ্বান আসিয়াছে!

সুদূর অতীতের কোন্ এক যুগে দেবতার পুণ্যরথ কোন্ এক তপঃকৃশা রমণীর প্রাঙ্গণে এমনি করিয়া জ্যোৎস্নার উজ্জ্বল আলোকস্নাত হইয়া নামিয়া আসিয়াছিল! আজিকার এ মুহূর্তে উৎপলকুমারী সে কাহিনীটিকে কল্পনার মোহিনী সৃষ্টি বলিয়া কোনো মতেই মনে করিতে পারিল না। উৎপলকুমারী বিগ্রহের সম্মুখে প্রণিপাত করিয়া উঠিয়া যখন সে মূর্ত্তির দিকে চাহিল, তখন তাহার মনে হইল, সে মূর্ত্তিখানি সজীব; তাহার জীবনব্যাপী নিষ্ঠা ও সাধনাকে সার্থক করিয়া দিবার জন্যই যেন সেই পাষাণ বিগ্রহের পলকবিহীন চক্ষুঃ হইতে এক বিশ্বপ্লাবি আলোকলেখা নির্গত হইতেছিল। আর বাহিরে সেই আলোকলেখাই যেন আকাশে, বাতাসে, ছন্দে ছন্দে পরিব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে!

পিতাপুত্রী মন্দিরসম্মুখস্থ প্রাঙ্গণ অতিক্রম করিয়া ঘাট্‌লার সোপানশ্রেণীর কাছে আসিয়া দাঁড়াইলেন। পিতাকে প্রণাম করিয়া উৎপলকুমারী কহিল—"বাবা, দীঘির পবিত্র জল একবার স্পর্শ করিব,"—উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া ধীর পাদবিক্ষেপে উৎপলকুমারী সোপানশ্রেণী অতিক্রম করিতে লাগিল।

"মা,—মা—ফিরে আয় মা,—আর একবার চেষ্টা করিয়া দেখিব"—বিকৃতকণ্ঠ রামরতনের মুখের বাণী শেষ হইবার পূর্ব্বেই সেই শান্ত-বনভূমি কম্পিত করিয়া, ভৈরবের তীরে তীরে, এক অশ্রুতপূর্ব্ব বিকটধ্বনি উত্থিত হইল!

উৎপলকুমারীর পায়ের নীচে তখন সোপানশ্রেণী ফুরাইয়া আসিয়াছে,—সে আবক্ষ নিমজ্জিত করিয়া দীর্ঘিকার কালো জলের উপর প্রফুল্ল শতদলের ন্যায় শোভা পাইতেছিল।

আকাশে শশাঙ্ক তেমনি মধুবর্ষণ করিয়া হাসিতেছিল,—আরতির সুগন্ধি ধূমপুঞ্জ গায়ে মাখিয়া, বাতাস, দীর্ঘিকার কালো জল ছুঁইয়া উৎপলের চূর্ণকুন্তল চুম্বন করিয়া বহিয়া যাইতেছিল! আর দূর গগনে ক্ষুদ্র দুইটী তারকা তাহাদের কিরণবর্ষী দৃষ্টি দ্বারা উৎপলকুমারীকে কি মৌন ভাষায় অভিনন্দন করিতেছিল!

আবার বিকৃতকণ্ঠে রামরতন ডাকিলেন—"মা"—আবার পল্লী কম্পিত করিয়া শতকণ্ঠে ধ্বনি উঠিল।

তখন দুইপাণি যুক্ত করিয়া উৎপলকুমারী পিতাকে উদ্দেশে প্রণাম করিল।

তার পর! তার পর অতিথি দৌড়াইয়া আসিয়া দেখিল, বৃদ্ধ রামরতন উন্মাদের মত দ্রুতপদে সোপান অতিক্রম করিয়া নামিয়া যাইতেছেন—পার্থিব বাধা আর তাঁহাকে ঠেকাইয়া রাখিতে পারিল না।—আর—যেখানে প্রফুল্ল পঙ্কজিনীতুল্য উৎপলকুমারী আবক্ষ নিমজ্জিত করিয়া দণ্ডায়মানা ছিল, সেখানকার জলরাশি তখনো মৃদু আলোড়িত হইতেছে; সেই চারু দেবীপ্রতিমা দীঘিকার কালো জলে বিসর্জ্জিত হইয়াছে!

* * * *

আজি ভৈরবের তীরে সে দীন কাঠুরিয়াপল্লী আর নাই। এক বহু জনাকীর্ণ ভদ্রপল্লী সে স্থান অধিকার করিয়াছে! কিন্তু সেই সুবৃহৎ দীঘিকা আজিও 'সরকার ঝি' নামে সুপরিচিত। সে দীঘিকার সুশীতল জল, দারুণ গ্রীষ্মে আজিও সহস্র সহস্র লোকের তৃষ্ণা দূর করিয়া, সেই পুণ্যবতীর পবিত্র নাম ঘোষণা করিতেছে।

জীবন-নৈবেদ্য

১

বহির্ব্বাটীর প্রাঙ্গণ হইতে শ্যামকিশোর উচ্চকণ্ঠে ডাকিল, "চন্দ্র",—

চন্দ্রকিশোর তখন পুষ্পচয়নে নিযুক্ত ছিল ; ভ্রাতার আহ্বান শুনিয়া উত্তর দিল, "দাদা, আমাকে ডাকিলে কি ?"

শ্যামকিশোর একটু কুণ্ঠিত ভাবে কহিল, "একবার এদিকে আসিতে হইবে, ইঁহারা আসিয়াছেন !"

চন্দ্রকিশোর ফুলের সাজিখানি সযত্নে ঠাকুরঘরের বারান্দায় রক্ষা করিয়া ধীরে ধীরে বহির্ব্বাটীতে আসিল ! সেখানে গ্রামের কয়েকজন ভদ্রলোক আসিয়াছেন। শ্যামকিশোর ভ্রাতাকে তাড়াতাড়ি কহিল, "এই তো ইঁহারা আসিয়াছেন, বেশীক্ষণ থাকিতে পারিবেন না, তোমার যাহা বলিবার থাকে বল।"

"আমার তো কিছুই বলিবার নাই, দাদা ! যাহা বলিবার ছিল, কাল রাত্রিতেই তোমাকে বলিয়াছি ; বৃথা ইঁহাদিগকে কষ্ট দিয়াছ,"—চন্দ্রকিশোর আস্তে আস্তে কথাগুলি বলিয়া গেল।

শ্যামকিশোর কনিষ্ঠের এই নির্ব্বিকার ভাবটি একেবারেই পছন্দ করিতে পারিতেছিল না। একটু অপ্রতিভ ভাবে উপস্থিত ভদ্রলোক কয়টীর মুখের দিকে চাহিয়া কহিল,—"চন্দ্র প্রস্তাব করিতেছেন, পৈতৃক বিগ্রহ তাঁহাকে দেওয়া হউক্ ; আমি আপত্তি করিয়াছিলাম, তাহাতে চন্দ্র তাহার প্রাপ্য সম্পত্তির অর্দ্ধাংশ ছাড়িয়া দিতেও প্রস্তুত হইতেছে,—তা' পৈতৃক বিগ্রহ কেমন করিয়া ছাড়িয়া দিব ? আমি বলি"—

"আমি তো আমার কথার মধ্যে গোল কিছুই রাখি নাই! পৈতৃক বিগ্রহে তোমার ও আমার সমান অধিকার, তাহাতো আমি অস্বীকার করি নাই; সম্পত্তির বিভাগ যে ভাবেই ইচ্ছা হয় কর, আমার কোনও আপত্তি নাই; বিগ্রহ আমাকে দাও, ইহাই তোমার কাছে আমার প্রার্থনা। আর এক কথা, পৃথগন্ন হওয়ার তো কিছু আবিশ্যকতা দেখি না; সত্যকিশোরই বংশের একমাত্র দুলাল; আমাদের অভাবে সেই তো সব পাইবে।" চন্দ্রকিশোর শান্তভাবে কথা কয়টি বলিল। তাহার সন্তানাদি কিছুই হয় নাই; সাধ্বী কমলাই তাহার গৃহের ও অন্তরের লক্ষ্মী!

শ্যামকিশোরের ললাট একটু কুঞ্চিত হইয়া আসিল। এই শান্ত, নিস্পৃহ ভ্রাতাটির সহিত সে কেন যে বিচ্ছেদের সৃষ্টি করিয়া তুলিতেছে, তাহা সে নিজেই ভাল করিয়া বুঝিতে পারে নাই।

উপস্থিত ভদ্রলোকদিগের মধ্যে একজন কহিলেন, "চন্দ্র তো কোনও গোলই রাখে নাই; বাল্যকাল হইতেই সে বিগ্রহের পূজা-অর্চ্চনায় আপনাকে ব্যাপৃত করিয়া রাখিয়াছে, বিগ্রহ পাইতে ইচ্ছা হওয়া তাহার পক্ষে স্বাভাবিক; তোমাদের পৃথগন্ন হওয়ার কোনও বাস্তবিক কারণ আছে কি না, তাহা আমরা দেখিতে চাহি না, তবে না হইলেই মঙ্গল হইত! সম্পত্তির অর্দ্ধাংশ চন্দ্রের প্রাপ্য, বিগ্রহ তুমি তাহাকে সম্পূর্ণ দিবে কি না তাহা তোমার বিবেচ্য; তবে তাহার প্রাপ্য সম্পত্তির অর্দ্ধাংশও ত বিগ্রহের জন্য সে তোমাকে দিতে চাহিতেছে, তখন"—

"আজ্ঞে, পৈতৃক বিগ্রহ কি এ ভাবে কেহ দিতে চাহে?"—

"তা ছোট ভাই যখন ধরিয়াছে, তাহার প্রাপ্য সম্পত্তির অর্দ্ধাংশ লইয়া না হয় তাহাকে বিগ্রহ দাও; নূতন বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিতেও খুব বেশী ব্যয় নহে।" দ্বিতীয় শালিসের কথাগুলির ও স্বরের মধ্যে একটু শ্লেষের ভাব লুক্কায়িত ছিল, শ্যামকিশোর

তাহা বুঝিল; কিন্তু গায়ে মাখিল না। সে জানিত রাগিলে কার্য্য নষ্টই হয়, কার্য্যোদ্ধার হয় না।

কিন্তু তবু তাহার প্রাণের মধ্যে একটা বিদ্রোহ উপস্থিত হইতেছিল। কে যেন তাহার অন্তর মধ্য হইতে তাহাকে এই ভ্রাতৃবিরোধে লিপ্ত হইতে পুনঃ পুনঃ নিষেধ করিতেছিল। কিন্তু তখনি দূরদর্শিনী গৃহিণীর যুক্তিপরম্পরা তাহার মনে পড়িয়া গেল। হৃদয়ের যে দুর্ব্বলতাটুকু তাহাকে আশ্রয় করিতেছিল, শ্যামকিশোর সবলে তাহা দূর করিয়া দিল; পরে ধীরে ধীরে কহিল,—"আপনারা যাহা ব্যবস্থা করিবেন তাহাতে আমার আপত্তি থাকিবে না। তবে বিগ্রহ সম্বন্ধে বিশেষ বিবেচনা করিবেন, ইহাই আমার সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ রহিল।"

উপস্থিত ভদ্রলোকদিগের মধ্যে আবার একটা অর্থপূর্ণ দৃষ্টি-বিনিময় হইয়া গেল। কেহ একটু হাসিলেন। যিনি সর্ব্বাপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠ, তিনি কহিলেন, "শ্যাম, তুমি চন্দ্রকে বিগ্রহ ছাড়িয়া দাও, এবং এজন্য যদিও চন্দ্র তাহার সম্পত্তির অর্দ্ধাংশ ছাড়িয়া দিতে চাহিতেছে, কিন্তু তাহা আমাদের মতে সমীচীন মনে হয় না; তুমি তাহার প্রাপ্য সম্পত্তির এক চতুর্থাংশ গ্রহণ কর, এবং বিগ্রহ তাহাকে ছাড়িয়া দাও"—

"আজ্ঞে, আমাকে পুনরায় বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা ত করিতে হইবে! শাস্ত্রেই আছে, গৃহদেবতাশূন্য আলয় শ্মশানতুল্য। পুনরায় বিগ্রহ স্থাপনের ব্যয় যথেষ্ট; চন্দ্র যদি আমাকে বিগ্রহ সম্পূর্ণ ছাড়িয়া দিতে আপত্তি না করেন, আমি আমার বিষয়ের অর্দ্ধাংশ চন্দ্রের বিগ্রহপ্রতিষ্ঠার জন্য ছাড়িয়া দিতে প্রস্তুত আছি। পৈতৃক বিগ্রহ ছাড়িতে আমার মন কিছুতেই অগ্রসর হইতেছে না!"

শ্যামকিশোর জানিত, চন্দ্র বিগ্রহ কিছুতেই ছাড়িতে চাহিবে না,—সম্পত্তির সবটুকু ছাড়িতে হইলেও নহে! সুতরাং সে তাহার শেষ অস্ত্র বাহির করিয়া ফেলিল।

চন্দ্রকিশোর তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, "না, আমি অর্দ্ধাংশই স্বচ্ছন্দচিত্তে ছাড়িব, আপনারা ব্যবস্থা করিয়া বিগ্রহ আমাকে প্রদান করুন।"

শালিসরা দেখিলেন, এই মূর্খের মঙ্গলের দিকে চাহিয়া কথা বলা বৃথা; তবু তাঁহারা যখন ব্যবস্থাপক, সঙ্গত ব্যবস্থা করিতেই তাঁহারা বাধ্য। দ্বিতীয় ভদ্রলোকটী কহিলেন, "আমাদিগকে না ডাকিয়া বিলিব্যবস্থা তোমরা নিজেরাও তো করিলে পারিতে;—যাক, তোমাদের তৈজসপত্রাদি যাহা আছে বাহির কর, কাগজ পত্রাদিও দেখাও; বেলা অতিরিক্ত হইয়া উঠিল, আমরা একটা স্থির করিয়া দিয়া যাইব।"—

তখন চন্দ্র কহিল,—"আজ্ঞে আমাকে একটু ছুটী দিতে হইবে"—"কেন?"—"পূজার সময় অতিবাহিত হয়, আমি আপনাদের অনুমতি পাইলে পূজার আয়োজন করিতে যাইব।" "এদিক্কার ব্যবস্থা?"—"আপনারাই করিবেন"—চন্দ্রকিশোরের মুখে একটী প্রশান্ত হাস্যরেখা ফুটিয়া উঠিল!

চন্দ্রকিশোর চলিয়া গেল।—এই সংসারজ্ঞানানভিজ্ঞ লোকটীর জন্য শালিস মহোদয়গণের অন্তর সহানুভূতিতে পূর্ণ হইয়া উঠিল।

"এমন নিস্পৃহ, উদার ভাইয়ের সঙ্গে পৃথগন্ন হইয়া কি লাভ হইবে, শ্যামকিশোর?"--দ্বিতীয় ভদ্রলোকটী একটু তীব্র ভাবে কথাটা বলিয়া ফেলিলেন।

"আজ্ঞে, ভিতরের খবর তো জানেন না,"—গম্ভীর ভাবে শ্যামকিশোর কহিল। কিন্তু তাঁহার কুণ্ঠা ও দৈন্যকে সে আর কোনমতেই চাপিয়া রাখিতে পারিতেছিল না।

"যাক্, সে খবরে কি কাজ আমাদিগের? চন্দ্র তো চলিয়া গেল, কি কি ভাগ করিতে হইবে দেখাইয়া দাও";—তৃতীয় শালিস কহিলেন।

ভিতর বাড়ীর প্রাঙ্গণে তৈজসপত্রাদি নামাইয়া রাখা হইল;

যে সকল পাট্টা কবুলিয়তি, দলিল, হ্যাণ্ডনোট, খত প্রভৃতি ছিল, তাহাও শ্যামকিশোর সিন্দুক হইতে সাবধানে বাহির করিয়া আনিল। শালিস মহাশয়েরা সমস্ত দুই অংশে বিভক্ত করিয়া চন্দ্রকে ডাকিলেন। বিগ্রহার্চ্চনা সমাধা করিয়া সে আসিয়া প্রাঙ্গণের পার্শ্বদেশে দাঁড়াইল। তাহার সরল, প্রশান্ত মুখের উপর একটা বিপুল নির্ভরশীলতার চিহ্ন দেদীপ্যমান রহিয়াছে। এই মাত্র সে তাহার অন্তর-দেবতাকে অর্চ্চনা করিয়া আসিয়াছে,—সে যেন তাহার প্রসন্ন দেবতার আশীর্ব্বাণী লাভ করিয়াই আসিয়াছে! পৃথিবীতে আর যেন তাহার কাম্য কিছুই নাই; সে যেন সমস্ত কোলাহল ও পার্থিব বিসম্বাদের অতীত!

শালিস মহোদয়েরা চাহিয়া দেখিলেন, সেই নিষ্ঠাপূত দেহখানি একটা ব্রাহ্মণোচিত গরিমায় উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে! শ্রদ্ধায় তাঁহাদিগের হৃদয় আনত হইয়া আসিল। বয়োজ্যেষ্ঠ ডাকিলেন, "চন্দ্র,"—

মৃদুকণ্ঠে চন্দ্রকিশোর উত্তর করিল, "আজ্ঞে"—

"শ্যামকিশোর বিভাগ করিবার জন্য যাহা উপস্থিত করিয়াছেন, আমরা তাহা সমান দুই অংশে বিভাগ করিয়াছি। ইহার একাংশ তুমি লইতে পার; বিগ্রহ পৈতৃক; উভয়েরই সমান ভাবে প্রাপ্য; তুমি যদি সম্পূর্ণ চাহ, তোমার ভ্রাতাকে দিতে হইবে; কিন্তু পূজার ব্যয়ের অর্দ্ধাংশও শ্যামের দেয়; সুতরাং তুমি তোমার বিষয়ের অর্দ্ধাংশই যে ছাড়িতে চাহিতেছ, তাহা সঙ্গত মনে করি না; চতুর্থাংশ দেয় হইতেও পারে। এতদতিরিক্ত আমাদের মতে অব্যবস্থা। তোমার ভ্রাতা যদি অর্দ্ধাংশের কমে না ছাড়েন, তোমরা নিজেরাই যে ব্যবস্থা হয় করিতে পার।—তবে আমরা এখন উঠিতে পারি?"

দেব বিগ্রহের একটা মূল্য স্থির করিতে হইতেছে; ঠাকুরকে লইয়া দর কষাকষি আরম্ভ হইল দেখিয়া চন্দ্রকিশোর দারুণ ব্যথিত

হইয়া উঠিল। সে অস্থির ভাবে বলিয়া উঠিল, "না, না, দেব বিগ্রহ লইয়া এ বিতর্ক উপস্থিত না হওয়াই বাঞ্ছনীয় ; দাদা যাহা বলিবেন তাহাতেই আমি প্রস্তুত আছি।"

"তবে তোমার দাদাই ব্যবস্থা করুন ; আমরা উঠিলাম।" শালিস মহাশয়েরা চলিয়া গেলেন।

চন্দ্রকিশোরের মূর্খতা, ও শ্যামকিশোরের অন্যায় কপটাচরণ সম্বন্ধে আলোচনা করিতে করিতে তাঁহারা যাইতেছিলেন। একজন কহিলেন, "এমন মূর্খ, সাংসারিক কোনও বুদ্ধিই একেবারে নাই,—এমন করিয়া সম্পত্তিটা ছাড়িয়া দিল! হরকিশোর ভট্টাচার্য্যের ঘরে ঐ কয়খানা তৈজস! আশ্চর্য্য বটে!"

"কাগজপত্রগুলি পর্য্যন্ত অর্দ্ধেক গোপন করিয়াছে"—

"ইচ্ছা করিয়া ঠকিলে, কে তাহাকে বাঁচাইবে?"

একজন এ পর্য্যন্ত নীরব থাকিয়া বিতর্ক শুনিতেছিলেন। আজিকার ব্যাপার তাঁহার হৃদয়কে একান্ত ভাবে স্পর্শ করিয়াছিল ; তিনি ধীরে ধীরে কহিলেন,—"সংসারে কে ঠকে, কে জিতে তাহা ঠিক বুঝা যায় না! যে ইষ্ট দেবতার অর্চ্চনা করিতে পাইবে বলিয়া সর্ব্বস্ব ছাড়িতে প্রস্তুত, সে কি ঠকিয়াছে মনে করেন?"—এই কথার পরে আর কেহ কোনও কথা কহিল না।

২

এমনটা হইত না। শ্যামকিশোর যে চিরদিনই এমনি ধূর্ত্ত কপট ছিল, তাহা আমরা বলিতে পারি না। পিতা হরকিশোর ভট্টাচার্য্য নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহার আর্থিক অবস্থা মন্দ ছিল না। গ্রামের মধ্যে ও বাহিরে সম্মান প্রতিপত্তি যথেষ্ট ছিল। মৃত্যুর পূর্ব্বে দূরদর্শী ব্রাহ্মণ দুই পুত্র শ্যামকিশোর ও চন্দ্রকিশোরকে ডাকিয়া বলিয়া গেলেন,—

"বিসম্বাদে সংসারে লক্ষ্মীর দৃষ্টি থাকে না, তোমরা, দুই ভ্রাতা মিলিয়া মিশিয়া থাকিও, মঙ্গল হইবে।"

বৃদ্ধ লক্ষ্য করিয়াছিলেন, শ্যামকিশোর দুর্ব্বলচিত্ত ও স্ত্রৈণ; কনিষ্ঠ সংসারবিরাগী; জীবনের প্রারম্ভ হইতেই সাংসারিক বিষয়ে উদাসীন। চন্দ্রকিশোরকে গৃহিণীর নির্ব্বন্ধাতিশয্যে বিবাহ দিয়াছিলেন, গৃহিণী তাঁহার পূর্ব্বেই স্বর্গগতা হইলেন। মৃত্যুর পূর্ব্বে হরকিশোর বুঝিয়া গেলেন, চন্দ্রকে বিবাহ দেওয়া ভাল হয় নাই, মুক্ত বিহঙ্গকে পিঞ্জরাবদ্ধ করিবার বৃথা চেষ্টা করা হইয়াছে।

বধূটী লক্ষ্মীরূপিণী, তাহার দিকে চাহিয়া বৃদ্ধের চক্ষে জল আসিত। অনেকটা ভাবিয়া মৃত্যুর প্রাক্‌কালে কনিষ্ঠ পুত্রকে কাছে ডাকিলেন, কহিলেন—"গার্হস্থ্যাশ্রম সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, তুমি সংসার ত্যাগ করিও না।"—পিতা তাঁহার শেষ নিশ্বাসটুকুর সহিত যে আদেশ করিয়াছিলেন, তাহাই চন্দ্রকিশোরকে সংসারের সহিত বাঁধিয়া রাখিল।

শ্বশ্রূর মৃত্যুর পর হইতেই বড় বধূ সংসারের কর্ত্রীপদ সাড়ম্বরে গ্রহণ করিয়াছিলেন। শ্বশুরের মৃত্যুর পর হইতেই তিনি একেবারে পাকা গৃহিণী হইলেন। সংসারটাকে ষোল আনা নিজস্ব করিয়া লইবার পক্ষে কেহ তাঁহাকে কোনও দিনই বাধা প্রদান করে নাই সত্য, তবু দেবরপত্নী কমলাকে এক কথা বলিলেই যে পাড়ার পাঁচ জনে আসিয়া তাহার পক্ষে সহানুভূতি প্রকাশ করিত, এবং পরোক্ষে বা প্রত্যক্ষে কমলা যে সংসারের মধ্যে সকল বিষয়েই তাঁহার সহিত তুল্যাধিকারসম্পন্না, এ সংবাদটাও তাঁহাকে শুনাইতে ছাড়িত না, বড় বধূ রাইমণি ইহা কোনও ক্রমেই সহ্য করিতে পারিতেন না!

কিন্তু কমলা কোনও দিনই রাইমণির প্রভুত্বকে অতিক্রম করে নাই, আঘাত করে নাই। যাহার স্বামী সংসারের সর্ব্ববিষয়েই অনাসক্ত, তাহার ধৈর্য্যচ্যুতি সহজে ঘটিবার কোনও কারণ নাই।

কমলা সংসারকে ত্যাগের চক্ষে দেখিয়াছিল ; ভোগের ঐশ্বর্য্য তাহাকে মুগ্ধ করিতে পারে নাই। কমলার এই অনাসক্তি ও নির্ব্বিকারের-ভাবটীকে রাইমণি "ন্যাকামি" বলিয়া মনে করিতেন, এবং "মিট্ মিটে ডাইনী যে ছেলে ধরারে যম" এই সত্যটা তিনি একদিন প্রমাণ করিয়া দেখাইতে পারিবেন, ইহাও অকুণ্ঠিতভাবে প্রচার করিতে ছাড়িতেন না।

সংসারের অবস্থা যখন এই প্রকার, তখন ত্যাগের পক্ষ যে ক্রমে ক্রমে সমস্ত ছাড়িয়া দিবে, এবং ভোগের পক্ষ যে ধীরে ধীরে সমস্তই দখল করিয়া বসিবে, এটা খুবই স্বাভাবিক।

কাজেও তাহাই হইল। স্ত্রী-বুদ্ধি-পরিচালিত শ্যামকিশোর ভ্রাতার সহিত পৃথগন্ন হওয়াটাই সাংসারিক শান্তিরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়া স্থির করিল, এবং সেদিন গ্রামস্থ কয়েকজন সম্ভ্রান্ত ভদ্রমহোদয়কে ডাকিয়া আনিয়া স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি বিভাগ করিয়া লইয়া প্রকাশ্যভাবে পৃথক্ হইল।

৩

প্রাপ্ত সম্পত্তির অর্দ্ধাংশ ছাড়িয়া দিয়া চন্দ্রকিশোর পৈতৃক বিগ্রহ রাধামাধবজিউকে নিজস্ব করিয়া লইল। পর দিন প্রভাতে চন্দ্রকিশোর যখন শয্যাত্যাগ করিয়া উঠিয়া বাহিরে আসিল, তখন তাহার অন্তর মধ্যে একটী বিপুল প্রসন্নতার ভাব ক্রীড়া করিতেছিল।

প্রভাত-সূর্য্যের স্বর্ণরশ্মি উদ্যানের শিশির-সিক্ত পত্র ও পুষ্পের উপর পতিত হইয়া এক অপূর্ব্ব উজ্জ্বলতার সৃষ্টি করিয়া তুলিয়াছে। শিশিরবিন্দু সেই স্বর্ণকিরণে জ্বলিতেছে ; পূর্ব্ব রাত্রির জ্যোৎস্নালোকে তরুণী দেববালাগণ বুঝি মর্ত্ত্যের পুষ্পোদ্যানে ক্রীড়াচ্ছলে নামিয়া আসিয়াছিল, তাহাদেরই কর্ণভূষণ-বিচ্যুত মুকুতারাজি তরুণ পল্লবের দলে দলে পতিত হইয়াছিল ;—

প্রভাতের রঞ্জিত আলোকলেখাই যেন তাহাদিগকে লোকচক্ষুর গোচর করিয়া দিয়াছে।

চন্দ্রকিশোর স্নানান্তে পুষ্পচয়ন করিয়া আনিল; কমলা স্বহস্তে দেবতার মন্দির প্রত্যহ মার্জ্জনা করিয়া রাখিত, আজও রাখিয়াছে। অন্যদিন স্বামী যখন অর্চ্চনা করিতেন তখন কমলা উপস্থিত থাকিতে পারিত না; সংসারের নানাকার্য্যে তাহাকে ব্যাপৃত থাকিতে হইত; আজ তো আর কোনও কাজই ছিল না। বিশ্বের ঠাকুরকেই কেন্দ্র করিয়া দুই স্বামী স্ত্রীতে একটী ক্ষুদ্র সংসার পাতাইয়াছে! আজ আর বাহিরের আহ্বান তাহাদিগকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিবে না; কাহারও কাছে কাজের হিসাব দিতে হইবে না; পরম নিশ্চিন্ততার মধ্যে শুধু ঠাকুরের অর্চ্চনা ও অর্চ্চনার আয়োজন লইয়াই তাহারা ব্যাপৃত থাকিতে পারিবে।

চন্দ্রকিশোর পূজা করিতেছিল, আর ক্ষৌমবসনা কমলা ধূপদানীতে অগুরু, কুঙ্কুম, চন্দন, ধূপ নিক্ষেপ করিতেছিল! উভয়ের অন্তরে উচ্ছ্বসিত তৃপ্তি, চক্ষে অশ্রুধারা। চন্দ্রকিশোর ভাবিতেছিল, পার্থিব দৈন্য যদি মানুষকে ঠাকুরের কাছে এতটুকুও লইয়া যাইতে পারে, তাহা হইলে মানুষ ঐশ্বর্য্য কামনা করে কেন? কাঙ্গাল বিদুরের ঘরে শাকান্ন ভোজন করিবার জন্য তুমি গিয়াছিলে,—হে ঠাকুর, তুমি যদি দীন, রিক্ত, কাঙ্গালকেই বেশী ভালবাস, তবে তোমার সেবককে সর্ব্বপ্রকার পার্থিব সম্পদ্ হইতে বিচ্যুত কর।

৪

সর্ব্বপ্রকার পরীক্ষার মধ্যে আপনাকে স্থির রাখিয়া যে জীবনের পথে অকম্পিত পদে অগ্রসর হইতে পারে, বৈকুণ্ঠেশ্বর স্বয়ং তাহার ললাটে তাঁহার পদাঙ্করেখা অঙ্কিত করিয়া দিয়া থাকেন। চন্দ্র-

কিশোরের মর্ম্মবীণায় যে সুর ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিয়াছিল, তাহা তাহাকে ধীরে ধীরে পার্থিব সুখ ও দুঃখের অতীত করিয়া তুলিতেছিল!

বিগ্রহ মন্দির, ও মন্দিরের পার্শ্ববর্ত্তী পুষ্পোদ্যান, ইহারই মধ্যে চন্দ্রকিশোর তাহার অনুভূতিকে, সত্তাকে সুখদুঃখকে কেন্দ্রীভূত করিয়া রাখিয়াছিল। জীবনে কার্য্য কিছুই ছিল না; বাল্যকাল হইতেই সে ঠাকুরের নিকট তাহার সুখ ও দুঃখকে নিবেদন করিতে অভ্যস্ত হইয়াছে; মধ্যে কমলা যখন জীবন-সঙ্গিনীরূপে আসিয়া দাঁড়াইল, পিতার আদেশ যখন তাহাকে সংসারের সহিত বাঁধিয়া দিল, তখনও সে এক বিগ্রহের সেবা ছাড়া জীবনের কাম্য আর কিছুই খুঁজিয়া পায় নাই! সাধ্বী কমলা তাহার পার্শ্বে আসিয়া সহধর্ম্মিণীরূপে দাঁড়াইল। সংসার যখন এই দুইটি নিরীহ প্রাণীকে পার্থিব সম্পদ্ হইতে বিচ্যুত করিবার জন্য নানাপ্রকার কূট আয়োজন করিতেছিল, তখন তাহারা আপনাদিগকে বিশ্বরাজের চরণতলে একান্তভাবে নিবেদন করিয়া দিল!

দেবতুল্য পিতার মৃত্যুকালীন আদেশ চন্দ্রকিশোরকে সংসারের সহিত একটী ক্ষীণ তন্তু দ্বারা বাঁধিয়া রাখিয়াছিল, কিন্তু সংসারকে কেমন করিয়া গুছাইয়া বাঁধিয়া রাখিতে হয় তাহা চন্দ্রকিশোর জানিত না। যে চতুর্থাংশ সম্পত্তি সে পাইয়াছিল তাহার আয় অতি সামান্য; উপযুক্ত পরিদর্শনের অভাবে তাহাও সম্পূর্ণ আদায় হইত না। কিন্তু পার্থিব দারিদ্র্যকে সে স্বেচ্ছায় বরণ করিয়া লইয়াছে, কোনও অভাবই তাহাকে এতটুকু দুঃখিত, ব্যথিত করিতে পারিত না।

শ্যামকিশোর দেখিল, চন্দ্রকিশোর বিষয়বুদ্ধির অভাবে সম্পত্তির প্রাপ্য চতুর্থাংশও নষ্ট করিতে বসিয়াছে। পৈতৃক সম্পত্তি এ ভাবে নষ্ট হইতে দেওয়া সে কোনও ক্রমেই সমীচীন মনে করিতে পারিল না। তখন সে চন্দ্রকিশোরের সম্পত্তিটুকুও হস্তগত

করিবার জন্য নানা কৌশল অবলম্বন করিতে লাগিল। চন্দ্রকিশোর তাহার সহজ বুদ্ধিতে বুঝিল, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা তুচ্ছ বিষয়ের জন্য নানা-প্রকার পাপে লিপ্ত হইতে চলিয়াছেন। তাহার মনে হইতে লাগিল, এই অন্যায়াচরণ হইতে সে যদি তাহার ভ্রাতাকে মুক্ত না করে, তাহা হইলে কতকটা পাপ যেন তাহাকেও স্পর্শ করিবে! বিষয়টুকু রক্ষা করিবার জন্য তাহার চিত্তও তো মধ্যে মধ্যে ব্যাকুল, বিক্ষিপ্ত হইতে পারে!—না, এমন করিয়া তুচ্ছ বিষয়ের জন্য সে তাহার জীবনকে, সাধনাকে ব্যর্থ করিতে প্রস্তুত নহে। বৈকুণ্ঠেশ্বরের মোহনমূর্ত্তি যাহার অন্তর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত রহিয়াছে, পার্থিব সম্পদ কেমন করিয়া আর তাহাকে মুগ্ধ করিবে?

চন্দ্রকিশোর সেদিন পূজা-শেষে ভ্রাতুষ্পুত্র সত্যকিশোরকে ডাকিল। ঘরের কোণে একটা অযত্ন-রক্ষিত বাক্স ছিল, তাহার ভিতর হইতে কতকগুলি কাগজপত্র বাহির করিয়া সে সত্য-কিশোরের হস্তে প্রদান করিল; সত্যকিশোর চন্দ্রকিশোরের মুখের দিকে চাহিয়া কহিল, "কাকা, কি এ?"

"তোমার বাবার কাছে দিয়ো, বলিয়ো কাকা আমাকে দিয়াছেন।"

বালক চলিয়া গেল। শ্যামকিশোর সেই দিনই ভোরে কার্য্যব্যপদেশে বিদেশে চলিয়া গিয়াছিল, চন্দ্র তাহা জানিত না। সত্যকিশোর কাগজপত্রগুলি তাহার মাতার কাছে আনিয়া রাখিল। রাইমণি সে গুলি সিন্দুকের ভিতরে তুলিয়া রাখিলেন।

পরদিন ভোরে চন্দ্রকিশোর স্নানান্তে ফুলের সাজি হাতে করিয়া পুষ্পোদ্যানের মধ্যে আসিয়া দাঁড়াইল। চারিদিকে রাশি রাশি পুষ্প প্রস্ফুটিত হইয়াছে। ভোরের বাতাস পুষ্পের সুগন্ধ গায়ে মাখিয়া ছুটিতেছিল, বিশ্বে আনন্দবার্ত্তা প্রচার করাই তাহার কার্য্য।

ফুলগন্ধবাহী বায়ু, পুষ্পরেণু উড়াইয়া, ফুলভারাবনত শাখাগুলিকে নাচাইয়া, কোমল লতিকাগ্রভাগকে দুলাইয়া, চন্দ্রকে স্পর্শ করিয়া ছুটিতেছিল! বিশ্ব তাহার নিখিল সৌন্দর্য্য যেন আজি এই ক্ষুদ্র উদ্যানখানির মধ্যে ফুটাইয়া তুলিয়াছে! তৃপ্তিতে, আনন্দে চন্দ্রকিশোরের হৃদয় পূর্ণ হইয়া উঠিল! ভগবান্ আজ যে তাহাকে পার্থিব সকল সম্পদ্ হইতে বিমুক্ত করিয়াও এমনি ভাবে বিশ্বের উন্মুক্ত সৌন্দর্য্যের মধ্যে আনিয়া দাঁড় করাইয়াছেন, ইহা মনে করিয়া চন্দ্রকিশোরের অন্তর কৃতজ্ঞতায় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিতেছিল! আজ সে গৃহে থাকিয়াও সর্ব্বপ্রকারে রিক্ত, কাঙ্গাল; পিতার আদেশ তাহাকে সংসারে বাঁধিয়া রাখিয়াছে, সেই সংসারের মধ্যে যে বিশ্বরাজ তাহাকে এমন করিয়া তপোবন-রচনার অবসর প্রদান করিবেন, চন্দ্রকিশোর তাহা পূর্ব্বে বুঝিতে পারে নাই। ঠাকুর পার্থিব সর্ব্বস্ব গ্রহণ করিয়া যদি তাহাকে তাঁহার প্রেমরাজ্যের কাঙ্গাল প্রজারূপে পরিণত করিয়া লন, তাহা হইলে ত তাহার কাম্যের আর কিছুই থাকিবে না!

এমন সময়ে মন্দিরের দ্বার হইতে সঙ্কেত করিয়া কমলা তাহাকে ডাকিল। চন্দ্রকিশোর কাছে আসিল; কমলার মুখের দিকে চাহিয়া দেখিল, সে মুখে কেমন একটা দুঃসহ জ্যোতিঃ ফুটিয়া উঠিয়াছে! কমলা শতকষ্টে বসিয়া ছিল; ধীরে ধীরে মন্দিরের উন্মুক্ত বারান্দার উপর শুইয়া পড়িল, কহিল—"আমাকে বৈকুণ্ঠেশ্বর ডাকিয়াছেন, তোমার পায়ের ধূলা আমার মাথায় দাও।"—চন্দ্রকিশোর শুনিলেন, শেষ রাত্রিতেই কমলা কলেরাক্রান্ত হইয়াছে। কমলা যখন স্বামীকে তাহার কাছে ডাকিল, তখন সে তাহার সমস্তটুকু জীবনীশক্তিকে একেবারে নিঃশেষ করিয়া ফেলিয়াছে! মানুষের চেষ্টা আর তাহাকে ধরিয়া রাখিতে পারিল না। সাধ্বী কমলার অমর আত্মা সেই দিন দ্বিপ্রহরের পরই নশ্বর দেহ পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল!

৪

"গ্রামের মালীক" হরিহর চাটুয্যে, শচীশের পিতা। তিনি বয়সে ও বুদ্ধিতে প্রবীণ, বিষয়কর্ম্মে কুশাগ্রবুদ্ধি। পাঁচখানি গ্রামের লোক তাঁহাকে খাতির করে এবং ভয় করিয়া চলে!

সেদিন দুপুরের পর বিশ্রামান্তে তিনি নায়েবকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। নায়েব আসিলে তাঁহাকে কহিলেন, "গৌরীপ্রসাদ মুখুয্যের কাল হইয়াছে, তাঁহার নামে যে ডিক্রীটা করাইয়া রাখিয়াছিলাম, তাহা লইয়া আইস!"

নায়েব ডিক্রীর কাগজ লইয়া আসিলেন। হরিহর বাবু ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া কহিলেন, "একটা অনাথা মেয়ে আছে, তাহাকে দূর করিয়া দিয়া বাড়ীটা দখল করিয়া লইতে পারি, তাহা করিব না। বিশেষ হরিহর চাটুয্যে অনাথার সঙ্গে বিবাদ করে না। কিন্তু ও বাড়ীটা আমার চাই-ই! মুখুয্যেদের বাড়ীর পূর্ব্বাংশে দত্তের ভিটাটা বহুকাল পড়িয়া রহিয়াছে। মেয়েটার জন্য সেখানে ঠিক্ তাদের বাড়ীর মতই একটা দেওয়ালঘেরা বাড়ী করিয়া দাও; সে সেখানেই উঠিয়া যাউক; আর কিছু নগদ টাকা, ধর চার পাঁচ শ, দিলেই বোধ হয় কোনও আপত্তি করিবে না!—কি বল, রমাপ্রসাদ?"—

নায়েব এ প্রকার হুকুম শুনিতে অভ্যস্ত ছিলেন! কোনও কথা প্রকাশ করিয়া বলিবার পূর্ব্বে কর্ত্তা সেই কথাটাকে বিশেষ-রূপে বিবেচনা করিয়া লইয়াই বলিতেন, এজন্য নায়েব মহাশয় কর্ত্তার কথা শেষ হইলে, কোনও মন্তব্য না করিয়া, কাজের কথাই আরম্ভ করিতেন। নায়েব রমাপ্রসাদকে এই জন্যই হরিহর বাবু খুব বেশী পসন্দ করিতেন।

নায়েব কহিলেন, "বাড়ী তৈয়ার করিবার খরচা কি সরকারী তহবিল হইতেই দেওয়া মনস্থ করিয়াছেন?" "হাঁ"। "মুখুয্যে

মহাশয়ের পৌত্রীর সঙ্গে কবে দেখা করিতে বলেন ?” “আজই,—না, কি বার আজ ? বৃহস্পতিবার ! কাজ নাই, কাল সকালেই দেখা করিবে !” “ডিক্রীটা ?” “ছিঁড়িয়া ফেল !”

নায়েব কাগজখানা ছিঁড়িতে একটু ইতস্ততঃ করিতেছিলেন। কর্ত্তা হাসিয়া কহিলেন, “বিবাদ করিবার উপযুক্ত পুরুষ কেহ বাঁচিয়া থাকিলে ওটা রাখিতাম ; একটা অনাথা মেয়ের বিরুদ্ধে ডিক্রী রাখিব না। কিন্তু বাড়ী আমি চাই, তাকে টাকা দিয়া সন্তুষ্ট কর ! এখন যাও !”—হরিহর বাবু গড়গড়ার নলটা তুলিয়া লইলেন ; নায়েব দ্বিরুক্তি না করিয়া ডিক্রীর কাগজটা খণ্ড খণ্ড করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিয়া বাহির হইয়া গেলেন !

কুশাগ্রবুদ্ধি, বিষয়ী হরিহর হিসাবে একটু ভুল করিয়াছিলেন। টাকা দিয়া যে সকলকে ‘সন্তুষ্ট’ করা যায় না, এ কথা জানিলেও তিনি একবারও মনে করিতে পারেন নাই যে হরিশ মুখুয্যের এতটুকু মেয়েটা তাঁহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইবার সাহস রাখিতে পারে !

শচীশ পাশের ঘরেই ছিল ; রুদ্ধ নিঃশ্বাসে নায়েবের সঙ্গে পিতার পরামর্শ শুনিল ! তাহার কাণের কাছ দিয়া আগুন ছুটিতেছিল ;—নিরুপমার কাছে নায়েব এই প্রস্তাব উপস্থিত করিলে, সে যাহা উত্তর দিবে, তাহা যেন শচীশ তখনই শুনিতে পাইতেছিল ! তাহারা গ্রামের মালীক বলিয়া তাহাদের এমন কি অধিকার আছে, যে একটী নিরীহ প্রাণীকে তাহার পিতৃপিতামহের ভিটায়ও সুস্থ হইয়া, শান্তিতে বাস করিতে দিবে না ? একদিন সে নিরুপমার কাছে যে অপরাধ করিয়াছে, তাহারই প্রায়শ্চিত্ত সে এতদিন বসিয়া দণ্ডে দণ্ডে, পলে পলে করিতেছে ! আজ আবার সেই নিরুপমাকেই এমন করিয়া অপমান করিবার কি অধিকার তাহাদের আছে ?

তাহার একবার ইচ্ছা হইতেছিল, পিতার কাছে ছুটিয়া যাইয়া,

পায়ে ধরিয়া, তাঁহাকে নিরস্ত করে! কিন্তু তাহা তাহার সাহসে কুলাইল না! তবু সে স্থির থাকিতে পারিল না। পাশের দুয়ার খুলিয়া নিঃশব্দ চরণে সে বাহির হইয়া আসিল। দেউড়ীর কাছে নায়েবকে ধরিল;—ম্লান মুখে ডাকিল, "কাকা!"—ডাক শুনিয়া নায়েব ফিরিয়া দাঁড়াইলেন; স্নেহপূর্ণ স্বরে কহিলেন, "কি বাবা?"

শচীশ তখনই কাকাকে কি কহিবে ঠিক গুছাইয়া উঠিতে পারিতেছিল না! সে একটু কুণ্ঠিত ভাবে একেবারে নায়েব মহাশয়ের কাছে সরিয়া দাঁড়াইল। একবার মাটীর দিকে চাহিল, তারপর চকিত দৃষ্টিতে কাকার মুখের দিকে চাহিয়া আবার মাথাটা নীচু করিয়া দাঁড়াইল। রমাপ্রসাদ বুঝিলেন, শচীশ এমন কোনও কথা লইয়া আসিয়াছে, যাহা সে তাহার পিতার কাছে বলিতে সাহসী নহে।

বাল্যকাল অবধি সে তাহার যে কোনও আবদার পিতার কাছে না জানাইয়া, এমনি করিয়া কাকার কাছে আসিয়া জানাইয়াছে। আজও আবার সে ছেলেবেলার মতই একেবারে তাঁহার গায়ের কাছে ঘেঁসিয়া দাঁড়াইয়াছে; সেই—কথা বলিতে যাইয়া কুণ্ঠিত ভাবটুকু—ঠিক্ তেমনি আছে।

শচীশের মাথার উপর হাতখানি রাখিয়া, একটু হাসিয়া রমাপ্রসাদ কহিলেন, "কি শচীশ, কি বল্‌তে এসেছ?"

শচীশ তাহার নত মুখখানি তুলিয়া কাকার মুখের দিকে আবার চাহিল, তারপর দৃষ্টি ফিরাইয়া লইয়া ধীরে ধীরে কহিল, "কাকা, বাবার সঙ্গে আপনার এখনি যে কথা হ'ল, তা' আমি শুনেছি; কাকা, এর কি কোনো উপায় নাই?"—শচীশের কথার মধ্যে একটা কাতরতাপূর্ণ মিনতির ভাব ছিল। রমাপ্রসাদ তাহা লক্ষ্য করিলেন।

"কিসের উপায়, শচীশ?"—একটু অন্যমনস্ক ভাবে রমাপ্রসাদ কহিলেন।

"তা'কে কি এ অপমান থেকে রক্ষা করা যায় না ?"

"কা'কে ?"—রমাপ্রসাদ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে শচীশের মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন। শচীশ এই বৈষয়িক ব্যাপারের মধ্যে হঠাৎ কেন আসিয়া পড়িতে চাহিতেছে, রমাপ্রসাদ তাহাই বুঝিতে চেষ্টা করিতেছিলেন।

সরলপ্রাণ শচীশ কহিল,—"নিরু,—হরিশ মুখুয্যে ম'শায়ের কন্যাকে",—শচীশ জানিত না যে নিরুপমার নামটা আজ এমন করিয়া তাহার মুখে বাধিয়া যাইবে, এমন করিয়া তাহার কাণের কাছ দিয়া, কপোলের ধার দিয়া শোণিতের একটা দ্রুত ক্ষণিক উচ্ছ্বাস ক্রীড়া করিয়া যাইবে!

কাকার তীক্ষ্ণ দৃষ্টির সম্মুখে সে যেন এতটুকু হইয়া যাইতেছিল! রমাপ্রসাদ শচীশের মুখের উপর দৃষ্টি স্থির রাখিয়াই কহিলেন, "তা অপমান বলে মনে কর কেন? তা'কে তো অনুরোধই করা হবে"—

দ্রুত, তীব্র স্বরে শচীশ কহিল,—"অনুরোধ করা হবে, পৈতৃক ভিটা ত্যাগ করে যেতে ত ?"

"সেজন্য তাকে টাকা দেওয়া হবে, আর যে বাড়ী তার আছে, ঠিক্ অমনি, ওর চেয়ে ভাল, একটা নূতন বাড়ী তাকে করে দেওয়া হবে!—এতে তার আপত্তি হবে কেন ?"

শচীশের চক্ষু একবার জ্বলিয়া উঠিল; তারপর আস্তে আস্তে কহিল, "কাকা, আপনার মুখে এমন শুন্‌ব আশা করি নাই। ঠিক তেমনি একটা বাড়ী পেলেই কি সব শুধ্‌রে যায় ?"

"কেন যাবে না ?"

"এই ধরুন, আমাদের কাছে কেহ যদি ঠিক্ এমনি প্রস্তাব এনে উপস্থিত করে, আমরা কি তা' ভাল বলে মান্‌ব ?"

রমাপ্রসাদ হাসিয়া কহিলেন, "এই দেখ পাগল কি বলে!"

"বাপ দাদার ভিটে, যেখানে সাতপুরুষের পায়ের ধূলা সঞ্চিত

রয়েছে, সেই ভিটের উপর ভাঙ্গা কুঁড়েও যে স্বর্গের চেয়ে শ্রেষ্ঠ! এ কি কাউকে ছেড়ে যেতে বলা যায়, কাকা?”

শচীশের কথা শুনিয়া রমাপ্রসাদের চক্ষে জল আসিতেছিল; তিনি শচীশের মাথায় ধীরে ধীরে হাত বুলাইয়া দিতে দিতে কহিলেন, “শচীশ, তোমার কথা আমি বেশ বুঝ্‌তে পাচ্চি; কিন্তু উপায় নাই, তোমার বাবার হুকুম! সে হুকুমের বিরুদ্ধে কোনো দিন মাথা তুলিনি;—এখনও তুল্‌ব না! তাঁর মনে কি কি মতলব আছে, তিনিই জানেন; তবে আমি এটুকু বল্‌তে পারি, নিরুপমা যদি নিজের ইচ্ছায় বাড়ী না ছাড়ে, তোমার বাবা তার কাছ থেকে জোর করে কখনই বাড়ী নেবেন না; তিনি যদি জোর করে কেড়ে নেওয়ার লোক হতেন, বহুকাল পূর্ব্বেই নিতে পারতেন!”—হরিহর বাবুর প্রতি রমাপ্রসাদের যে একটা অটল শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের ভাব ছিল, তাহা তাঁহার কথাগুলি শুনিয়া বেশ বুঝা গেল।

শচীশ একটু চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, “তা' কাকা, তার কাছে যখন কথাটা তুল্‌বেনই, তখন যাতে সে খুব বেশী দুঃখ না পায়, এমনি করেই তুল্‌বেন!”—কথাটা বলিয়া ফেলিয়া শচীশের ভারি লজ্জা করিতে লাগিল। সে আর কাকার মুখের দিকে ভাল করিয়া চাহিতেই পারিতেছিল না।

রমাপ্রসাদ একটু হাসিয়া আস্তে আস্তে কহিলেন, “আচ্ছা, তাই হবে, বাবা! কিন্তু কথাটা যেমন করেই বলা যাক্, মোটের উপর দাঁড়াবে কিন্তু একই, এই যা।”

শচীশও তাহা বুঝিয়াছিল; কিন্তু তাহার প্রাণের মধ্যে যে ব্যাকুলতা জাগিয়া উঠিয়াছিল, তাহার জন্যই সে স্থির হইতে পারিতেছিল না। রমাপ্রসাদ চলিয়া গেলেন। শচীশ স্থির করিল, জননীকে একবার বলিয়া দেখিবে। ম্লান মুখে ধীরে ধীরে সে অন্তঃপুরের দিকে চলিয়া গেল।

৫

দক্ষিণের দিকে গৌরীপ্রসাদ মুখুয্যের বাড়ীটা থাকাতে জমীদারবাড়ীর শ্রী কোনও মতেই খুলিতেছিল না। হরিহর বাবু বহু চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু গৌরীপ্রসাদ পৈতৃক ভদ্রাসন ত্যাগ করিতে সম্মত হন নাই। বিবাদবিসম্বাদ ত কিছুদিন চলিয়াছিল, কিন্তু কোনও ফল হয় নাই। বাড়ীটার উপর হরিহর বাবুর লোভ থাকিলেও তিনি জোর করিয়া বাড়ী নেওয়ার পক্ষপাতী ছিলেন না। সে প্রকার ইচ্ছা থাকিলে, গৌরী-প্রসাদের সাধ্য ছিল না যে তাঁহাকে ঠেকাইয়া রাখেন। গৌরী-প্রসাদও তাহা জানিতেন। পরদিন দুপুরের পর রমাপ্রসাদ আসিলেন। হরিহর বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হইল?" "আজ্ঞে, সে হরিশ মুখুয্যের মেয়েই বটে; বাপের তেজটুকু মেয়েটা ঠিকই পাইয়াছে।"—"সব কথাগুলি বেশ করিয়া বুঝাইয়া বলিয়াছিলে ত?" "আজ্ঞে হাঁ।" "নগদ টাকার কথা?" "এক হাজার পর্য্যন্ত উঠিয়াছিলাম।" "কি বলে?" "লাখ টাকা দিলেও নয়,"—একটু থামিয়া, অল্প একটু হাসিয়া, রমাপ্রসাদ কহিলেন, "মেয়েটা বলে কি,—" হরিহর বাবু আগ্রহ সহকারে কহিলেন, "কি—কি বলে?"—"বলে, 'দুঃখু, আমার টাকা নেই, থাকলে আপনার কর্ত্তার কাছে তাঁহার ভদ্রাসন বিক্রী করেন কি না জানবার জন্য লোক পাঠাতেম'।"—রমাপ্রসাদ হরিহর বাবুর মুখের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিলেন, দেখিলেন,—তাঁহার মুখশ্রী অপ্রসন্ন নহে! হরিহর বাবু চোখের চস্‌মাটা খুলিয়া বাক্‌সের উপর রাখিয়া কহিলেন, "বটে,—মেয়েটার সাহস তো কম নয়!—আচ্ছা আমি দেখ্‌ব!" শেষের দিক্‌কার কথা কয়টী খুব আস্তে আস্তে বলিলেন। রমাপ্রসাদ কর্ত্তার মুখে ক্রোধের কোনও লক্ষণ দেখিলেন না; একটু বিস্মিত হইয়া

ভাবিলেন, 'এতকাল এক সঙ্গে কাটাইলাম, কিন্তু এই অদ্ভুতচরিত্র লোকটীকে একটুকুও চিনিতে পারিলাম না।' রমাপ্রসাদ চলিয়া গেলেন। হরিহর বাবু বসিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন, মধ্যে মধ্যে তাঁহার মুখে একটী মৃদু হাসির আভা জাগিয়া উঠিতেছিল।

৬

সপ্তাহ কাটিয়া গেল। ফাল্গুনের শেষ; আম্রমুকুল ঝরিয়া গিয়াছে; শুষ্ক ঝরা মুকুল লাগিয়া লাগিয়া আম পল্লবগুলি মলিন হইয়া রহিয়াছে। আকাশ মেঘহীন, নীল, নির্ম্মল! বনের পাখী নবোদ্গত শ্যামল পত্ররাজির মধ্যে গা' ঢাকিয়া বড়ই মাতামাতি করিয়া ডাকিতেছে! ফুলের বাগানে ফুল ধরে না; বাতাসে ফুলের গন্ধ ভাসিয়া আসিতেছে। শচীশ নিজেই যত্ন করিয়া একখানি ফুলের বাগান তৈয়ারী করিয়াছিল। বড় একটা গন্ধরাজ ফুল গাছের নিম্নে ছোট একখানি আসন ছিল; শচীশ দুপুর বেলা প্রায়ই সেখানে যাইয়া বসিত। সে আজও আসিয়াছিল। রমাপ্রসাদের সহিত নিরুপমার যে কথাগুলি হইয়াছিল, তাহা সে রমাপ্রসাদের নিকট হইতেই জানিয়া লইয়াছিল। নিরুপমার সেই উত্তরের পর হরিহরবাবু কোন্ পথ লইবেন, তাহাই শচীশের কাছে একটী চিন্তার বিষয় হইয়া পড়িয়াছিল। আজও সে মনে মনে সেই কথারই আলোচনা করিতেছিল। দক্ষিণের দিকে একটু দূরে নারিকেলকুঞ্জের মধ্যে দেওয়াল-ঘেরা গৌরীপ্রসাদ মুখুর্য্যের বাড়ীটী দেখা যাইতেছিল। ঐ দেওয়ালঘেরা বাড়ীটীর মধ্যে নিরুপমা রহিয়াছে। কতদিন পূর্ব্বে, সেই একটা মুহূর্ত্তের জন্য সে নিরুপমাকে দেখিয়াছিল; তারপর আর দেখে নাই। কতদিন শচীশের ইচ্ছা হইয়াছে, একটু ফাঁক খুঁজিয়া, একটা বারের জন্যও তাহাকে দেখিয়া আইসে। কিন্তু সে কল্পনাটী মনে উঠিলেই তাহার বুকের মধ্যে শোণিতের উচ্ছ্বাস দ্রুত হইয়া উঠিয়াছে,

কাণের কাছ দিয়া আগুন ছুটিয়াছে, কপোল আরক্ত হইয়া উঠিয়াছে। কেন এমন হইয়াছে, সে ভাল করিয়া বুঝিতে পারে নাই। এখন সে পূর্ব্বের মত সহজভাবে নিরুপমার নামটী উচ্চারণ করিতে পারে না। কাকার কাছে কোনও কথা জিজ্ঞাসা করিতে আর তাহার সাহসে কুলায় না। কাকার তীক্ষ্ণ দৃষ্টির কাছে তাহার চক্ষু নত হইয়া আইসে। নিরুপমার কাছে সে যে অপরাধ করিয়াছিল, সেই অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করিবার জন্য সে অন্তরের সমগ্র সহানুভূতিটুকুকে নিরুপমার দিকেই প্রেরণ করিয়াছিল। কিন্তু একদিন হঠাৎ সে বুঝিল, নিরুপমাকে সহানুভূতির বেশী, আরও এমন একটা কিছু সে দিয়া ফেলিয়াছে, যাহা কোনও দিনই ফিরাইয়া লওয়া চলিবে না! ঐ দেওয়ালঘেরা বাড়ীটীর মধ্যে এমন একজন রহিয়াছে, যাহার কাছেই তাহার জীবনের সুখের সোণার কাঠিটী আছে! অথচ তাহাকে পাওয়ার কোনও উপায়ই ছিল না! যখন নিরুপমার প্রীতি তাহার অন্তরে নিঃশব্দে ধূমায়িত হইয়া উঠিতেছিল, তখনই তাহার পিতা নিরুপমাকে তাহার চিরদিনের গৃহখানি হইতে বিতাড়িত করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। অদৃষ্টের কি নিষ্ঠুর উপহাস! হঠাৎ একটী অস্ফুট কাতর চীৎকারধ্বনি শচীশকে চমকিত করিয়া তুলিল! শচীশ চাহিয়া দেখিল, একটী গাঢ় ধূমরেখা দেওয়াল ছাড়াইয়া নারিকেল-কুঞ্জের পাশ দিয়া উত্থিত হইতেছে! শচীশ উঠিয়া দাঁড়াইল; তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে আবার সেই দিকে চাহিল; আবার পঞ্জীভূত ধূমরাশি নারিকেলকুঞ্জ আচ্ছন্ন করিয়া উত্থিত হইল! মুহূর্ত্তমধ্যে বাগানের বেড়া ডিঙ্গাইয়া, ব্যবধানটুকু দৌড়াইয়া পার হইয়া, দেওয়াল টপ্‌কাইয়া শচীশ গৌরীপ্রসাদ মুখুর্য্যের প্রাঙ্গণে আসিয়া দাঁড়াইল! শচীশ দেখিল, অগ্নি তাহার লেলিহান্ রসনা বিস্তার করিয়া ঠাকুরগৃহ আক্রমণ করিয়াছে। প্রবেশের পথ দুর্গম! দ্বারে বেপথুমতী নিরুপমা! সে ঠাকুর বাহির করিয়া আনিবার জন্য

উন্মুখ আগ্রহে দুয়ারের কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে! শচীশ সুবিধা পাইয়াছে; আজ সে তাহার সমস্ত অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করিবে। তাহার অন্তরে এক বিপুল উৎসাহ জাগিয়া উঠিয়াছিল। মন্দিরপ্রবেশোন্মুখী নিরুপমার দুই হাত ধরিয়া তাহাকে টানিয়া নিরাপদ স্থানে আনিল। নিরুপমা চকিত দৃষ্টিতে একবার সেই উৎসাহদীপ্ত তরুণ মুখখানির দিকে চাহিয়া কাতর কণ্ঠে বলিয়া উঠিল,—"আমার ঠাকুর"—"আমার ঠাকুর!"—বিপদের উন্মাদ আঘাত আজ উভয়েরই লজ্জা, দ্বিধা ও সঙ্কোচকে চূর্ণ করিয়া দিয়াছিল; শচীশ কহিল, "এখানেই থাক তুমি, নিরু! তোমার ঠাকুর আনিয়া দিতেছি!"—নিরুপমারই কাছে দাঁড়াইয়া আজ তাহাকে এমন করিয়া 'নিরু' বলিয়া ডাকিতে শচীশ একটুও দ্বিধা বোধ করিল না! এ যেন কতকালের পরিচয়!—আজিকার এক মুহূর্ত্তের মধ্যেই যেন শতজন্মের পরিচয় কাহিনীটা লুকানো ছিল। শচীশ নিরুপমাকে হাত ধরিয়া তাহার উপরই নিভর করিবার জন্য টানিয়া কাছে আনিয়াছে, এ যেন এমন নূতন একটা কিছু কাজ নহে! এর পূর্ব্বেও যেন কতবার শচীশ তাহাকে এমনি করিয়া বিপদে ও সম্পদে তাহারই উপর নির্ভর করিবার জন্য কাছে টানিয়াছে। উভয়ে একটু থমকিয়া পূর্ণদৃষ্টিতে উভয়ের মুখের দিকে চাহিল! শচীশ চক্ষু ফিরাইল না;—নিরুপমা তাহার উচ্ছ্বসিত দৃষ্টি নত করিল না! নিরুপমার স্বপ্নময় দৃষ্টিটুকু যেন এমনি করিয়া জন্মজন্মান্তর শচীশকে অনুসরণ করিয়া আসিতেছে! মুহূর্ত্তমাত্র—তারপর শচীশ বিদ্যুৎবেগে প্রাঙ্গণ অতিক্রম করিয়া গেল! প্রজ্বলিত দেবগৃহ তখন পতনোন্মুখ!—নিমেষহীন নয়নে নিরুপমা দেখিল, শচীশ জীবনকে উপেক্ষা করিয়া, সেই পতনোন্মুখ গৃহের মধ্যেই প্রবেশ করিল! একটা অস্ফুট চীৎকার তাহার মুখ হইতে বাহির হইয়া গেল!—সে সেইখানেই দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া কাঁপিতে লাগিল। আজ যাহার জন্য এমন করিয়া তাহার হৃদয়

উদ্বেগাকুল হইয়া উঠিয়াছে, সে তাহার কেহই নহে, তবু যেন মনে হইতেছিল, সে-ই তাহার সব!—শচীশ দুই হাতে দেববিগ্রহকে বুকের সঙ্গে জড়াইয়া ধরিয়া বাহির হইয়া আসিতেই গৃহ ভূশায়ী হইল! নিরুপমা এতক্ষণ রুদ্ধনিশ্বাসে শচীশের কার্য্য দেখিতেছিল, এখন তাহাকে নিরাপদ দেখিয়া একটা আরামের নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল! ঠাকুর পাইয়া নিরুপমার সমস্ত উদ্বেগ দূর হইয়া গেল। তখন কোথায় ঠাকুরকে রাখিবে সেই জন্যই সে ব্যস্ত হইয়া পড়িল! অগ্নিতে যে তাহার সর্ব্বস্ব পুড়িয়া ছাই হইতেছিল, তাহা সে ভুলিয়া গেল; বুঝি শচীশকেও ভুলিল! ইতিমধ্যে বহুলোক আসিয়া পড়িয়া অগ্নি নির্ব্বাপিত করিবার চেষ্টা করিতেছিল। একদিন শিকারান্তে, যে আম্রবৃক্ষতলে শচীশ দাঁড়াইয়াছিল, আজও সেখানে এক বর্ষীয়ান্ পুরুষকে দেখা যাইতেছিল; তাঁহার স্নেহস্রাবী দৃষ্টি শচীশ ও নিরুপমার সর্ব্বাঙ্গে আশীষধারা বর্ষণ করিতেছিল। সেই বর্ষীয়ান্ পুরুষ, হরিহরবাবু!

৭

অগ্নির গ্রাস হইতে ছোট একখানি ঘর রক্ষা পাইয়াছিল। সেই গৃহমধ্যে এক দিকে ঠাকুরকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া অন্য দিকটা নিরুপমা নিজেদের থাকিবার মত করিয়া লইল। বারান্দায় বিশ্বাসী রামকমল থাকিবে। পরদিন প্রভাতে, দুই একটা ফুল গাছে যে সামান্য কয়েকটা ফুল ছিল, তাহাই তুলিয়া লইয়া নিরুপমা পূজার আয়োজন করিতেছিল। এমন সময়ে ধীরপাদ-বিক্ষেপে রমাপ্রসাদ প্রাঙ্গণে আসিয়া দাঁড়াইলেন। রামকমল রমাপ্রসাদকে বসিবার জন্য একখানি ছোট আসন আনিয়া দিল। তিনি না বসিয়াই কহিলেন,—"মা, বড় বিপদেই পড়ে গেছ; তা আমি আবার সেই পুরানো কথাটা তুল্‌তে চাই, কোনো কষ্টই থাক্‌বে না! একবার মুখ ফুটে বল লক্ষ্মী, বাড়ীটি তৈরি হয়ে

যাক্!” নিরুপমা অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া একবার রমাপ্রসাদের মুখের দিকে চাহিল! রমাপ্রসাদ দেখিলেন, নিরুপমার কালো চক্ষু দুইটী রোষে, ক্ষোভে জ্বলিয়া উঠিয়াছে! সে দ্রুত কণ্ঠে বলিল, “কাকা, আপনি আমার বাবারও বন্ধু ছিলেন জান্‌তাম। আজ আমাকে অনাথা পেয়েই কি বার বার এমনি করে অপমান করতে সাহস করেন? দাদু বল্‌তেন, হরিহরবাবু ধাম্মিক লোক; ভাল পরিচয় তিনি দিচ্ছেন, যা’ হোক্! আমি এই বাড়ী ছেড়ে এক পাও যাব না; টাকার লোভ কি দেখাচ্ছেন? আপনার কর্ত্তার সমস্ত বিষয় সম্পত্তি আমার পায়ের কাছে এনে বিলিয়ে দিলেও আমি এ বাড়ী থেকে নড়্‌ব না!”

“তাই হোক্ মা, হরিহর চাটুয্যে তাহার বিষয় সম্পত্তি তোমার পায়ের কাছেই বিলিয়ে দিতে এসেছে।”—নিরুপমা চমকিয়া চাহিয়া দেখিল, হরিহর বাবু কখন তাহাদের পিছনে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন! তাঁহার মুখের হাসি, চোখে জল!—“রমাপ্রসাদ, সোণা খাঁটি কি না যাচাই করে নেওয়ার জন্য মাকে আমার অনেক কষ্টই দিয়েছি! কিন্তু এই কষ্ট দিয়েও যে কি আনন্দই পেয়েছি তা’ আর বল্‌তে পারিনে! মা আমার, বুড়োকে তোমার যে মূর্ত্তি দেখিয়েছ, সেই মূর্ত্তিতেই তার সংসারে অচলা হয়ে থেক!—তোমাকে পাওয়ার জন্যই যে তোমাকে বেদনা দিয়েছি তাই জেনে বুড়োকে ক্ষমা ক’রো!” হরিহর বাবুর কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই নিরুপমা উঠিয়া ঘরের মধ্যে চলিয়া গেল! তার কাছে সবই যেন কেমন গোলমাল হইয়া যাইতেছিল! এ যেন একটা অদ্ভুত স্বপ্ন! সেই স্বপ্নের মধ্যে শচীশের আয়ত চক্ষু দুইটার নিবিড় প্রেমপূর্ণ দৃষ্টিটুকুই যেন একটা অভ্রান্ত সত্যরূপে তাহার সম্মুখে ফুটিয়া উঠিতেছে!

স্নানান্তে বৃদ্ধা ঘরে ফিরিয়া আসিতেছিলেন। হরিহর বাবু ও রমাপ্রসাদ তাঁহার কাছে গেলেন। নিরুপমা তাহার হাতের

ফুলগুলি ঠাকুরের পায়ের উপর ঢালিয়া দিল এবং তাহার অন্তরের সুখ ও দুঃখকে অন্য দিনের মতই তাঁহারই পায়ের কাছে নিবেদন করিয়া দিল।

* * * *

পুণ্য বৈশাখের দ্বিতীয় দিবসেই মহাসমারোহে শচীশের সঙ্গে নিরুপমার বিবাহ হইয়া গেল। বিবাহে নিরুপমা যে সকল অলঙ্কার পাইয়াছিল, তাহারই কতকাংশ বিক্রয় করাইয়া বাড়ীটী পুনরায় নির্ম্মাণ করাইল। পূর্ব্বের মতই পূজার সমস্ত আয়োজন নিরুপমা স্বহস্তেই করে; পিতামহের যে জমীজমাটুকু ছিল, তাহার আয় সম্পূর্ণই ঠাকুরের সেবায় ব্যয়িত হয়। শ্বশুরালয়ের একটী কপর্দ্দকও নিরুপমা ঠাকুরের সেবার জন্য ব্যয় করে না এবং মাসের মধ্যে পনের দিনেরও বেশী সে এ বাড়ীতেই থাকে। শচীশও নিরুপমার কালো চোখ দুইটির মায়া কাটাইতে না পারিয়া, কিছুদিন খড়ের ঘরে বাস করাটাই স্বাস্থ্যের পক্ষে পরম উপকারী বলিয়া মনে করিতে আরম্ভ করিয়াছে।

মিলনাশ্রু

দেবেন্দ্র সেদিন সন্ধ্যাবেলা কাছারী হইতে ফিরিয়া আসিতেই তাহার পত্নী ললিতা আসিয়া কহিল, "এভাবে তো আর সংসার চলে না! ছোট মেয়েটার অসুখ, আমি একা কতদিক দেখিব! একটা চাকর আছে, সে তো পাঁচজনের কাজ করিয়াই অবসর পায় না, আমি একা সবদিক্ না দেখিলে চলে না! তা' মানুষের শরীর তো বটে, কত সয় তাই বল"—পত্নীর বক্তৃতা দীর্ঘতর হইয়া চলিয়াছে দেখিয়া বাধা দিয়া দেবেন্দ্র কহিল, "কি হইয়াছে বল না!—অত দীর্ঘ ভূমিকায় কাজ কি?"—"হাঁ ভূমিকাই বটে; তোমার সংসারের জন্য খাটিয়া হাড় কালী করিব, আর একটা কথা বলিতে আসিলেই—" "তা' কি কথা বলনা,—আমি তো শুনিতে প্রস্তুতই আছি,"—দেবেন্দ্রের শরীরটা ভাল ছিল না। বিশেষ বিপক্ষের উকীলের কাছে আজ সে একটু তীব্র শ্লেষ পরিপাক করিয়া আসিয়াছিল, তাই মেজাজটাও একটু রুক্ষ ছিল;—শেষ কথাটা বলিবার সময়ে তাহার স্বরটা একটু অনর্থক তীব্র হইয়া উঠিয়াছিল। ললিতা তাহা লক্ষ্য করিল। সে তাহার রক্তাধর উল্টাইয়া একটু অভিমানের স্বরে কহিল, "কথা বলিতে আসিলেই যদি অসহ্য হয়, আমাকে না হয় এখান হইতে পাঠাইয়া দাও,—তার পর সুখে শান্তিতে সংসার কর! আমি যদি সহ্য করিতে না পারি আমাকে জোর করিয়া সহ্য করান তো আর চলিবেনা!"—দেবেন্দ্র দেখিল, বিপদ ক্রমেই ঘনাইয়া আসিতেছে। তখন সে সহজ ভাবে কহিল, "কি হইয়াছে

বলনা”—ললিতা বুঝিল ঔষধ ধরিয়াছে! তখন ললিতা স্বামীর কাছে অনেক কথাই কহিল, যাহার ফলে দেবেন্দ্রের মস্তিষ্ক ক্রমেই উত্তপ্ত হইয়া উঠিতে লাগিল। সমস্ত দিনের পরিশ্রমের পর তাহার শরীর ও মন উভয়ই অবসন্ন ছিল। পত্নীর কথাগুলি শুনিয়া শুনিয়া তীব্র বিরসে ও ক্রোধে তাহার আপাদমস্তক জ্বলিয়া উঠিল! সে তীব্র কণ্ঠে ডাকিল,—“রাজেন!”—ললিতা দেবেন্দ্রের মুখ চাপিয়া ধরিয়া কহিল, “আঃ, ঐ জন্যই তো আমি তোমার কাছে কোনও কথাই বলিতে চাহিনা; এই সমস্ত দিন খাটিয়া আসিয়াছ, একটু বিশ্রাম কর, হাতমুখ ধুইয়া মুখে একটু কিছু দাও,—এমন কি হইয়াছে যে ঠাকুরপোকে এখনি না ডাকিলে নয়? বলিতে হয়, পরে যখন হয় বুঝাইয়া বলিয়ো। আর বলিবারই বা কি?” —দেবেন্দ্র পত্নীর হাত সরাইয়া দিয়া আবার ডাকিল, “রাজেন!” —রাজেন্দ্র অন্য ঘরে ছিল, সেখান হইতে উত্তর করিল,—“দাদা ডাকিলে?” তার পর সেই গৃহ হইতে বাহির হইয়া বারান্দায় আসিল।—দেবেন্দ্র সার্টের বোতাম খুলিতে খুলিতে কক্ষ হইতে বাহির হইয়া আসিল, কহিল,—“তোর কি বুদ্ধি শুদ্ধি একেবারে লোপ পাইয়াছে?”—রাজেন্দ্র বুঝিল, ভ্রাতার এই হঠাৎ উত্তেজিত হইয়া উঠার সহিত বধূঠাকুরাণীর সাময়িক একটা বক্তৃতার কার্য্যকারণ সম্বন্ধ বর্ত্তমান আছে। সে ধীরে ধীরে কহিল,— “কোনও অন্যায় করিয়াছি কি?”—“ঘর শুদ্ধ সকলের অসুখ, কে কাজকর্ম্ম করে ঠিক নাই, ইহার মধ্যে চাকরটাকে শিবমাটি আনিবার জন্য পাঠাইলি কোন্ বুদ্ধিতে?” রাজেন্দ্র একটু ইতস্ততঃ করিয়া কহিল “কই আমি তো চাকরকে শিবমাটি আনিতে বলি নাই!”—“চাকরকে না বলিয়াছিস্ রাঙ্গা বৌমাকে বলিয়াছিস্”—“তাহাতে কি বিশেষ অপরাধ হইয়াছে?”—“সে কোথা হইতে মাটি আনিবে? সুতরাং চাকরকেই মাটির জন্য কহিতে হইয়াছে! এদিক্‌কার কাজ কে করে বাপু!”—“আমি

চাকরকে তো বলি নাই”—“সে একই কথা—কে আনিবে ?”—“যাহাকে বলিয়াছিলাম সেই আনিতে পারিত, আনা অসুবিধা বলিলে' আমিই আনিতে পারিতাম।”—“ঘরের বধূ কোথায় তোর শিবমাটি আনিতে যাইবে?' সুতরাং চাকরই গিয়াছে! তুই তো সংসারের কোনও কাজই করিবি না, দেখিবি না, চব্বিশ ঘণ্টা তোর পূজা লইয়াই আছিস্! সে পূজার যোগাড় ত তুই নিজেই করিয়া লইতে পারিস্!”—“ভিতর বাড়ীর পুকুর পাড়ে মাটি, সকলেই আনিতে পারে! আর পূজার যোগাড়ের কথা বলিলে,—সে জন্য আমি তো কাহারও উপর নির্ভর করিনা! সবই তো নিজে করিয়া লইয়া থাকি!”—“কি তুই নিজে যোগাড় করিস্? পূজার সাজ নিজে গুছাইয়া নিস্? ফুল বিল্ব পত্রাদি নিজে সংগ্রহ করিস্? জল নিজে আনিস্? কি তুই নিজে করিয়া থাকিস্?”—“যে কয়টা কথা বলিলে সবই তো নিজে করি,—কাহারও উপরই তো নির্ভর করি না!” “পূজার বাসনগুলি নিজে মাজিয়া আনিস্?”—“না!”—“তবেই তো দেখ্! তুই নিজে সংসারের ত কিছুই করিবি না, আবার তোর জন্য যদি সংসারের সকলের খাটিতে হয়, সংসার চলে কেমন করিয়া?”—রাজেন্দ্র ভ্রাতার যুক্তির বহর দেখিয়া বিস্মিত হইয়া উঠিয়াছিল!—ধীরে ধীরে কহিল,—“পূজার বাসনগুলি মাজিয়া দেওয়া এমন বেশী কিছু নহে; মেয়েছেলেরা যে কেহ উহা করিতে পারে।”—“না তাহা পারিবে না,—তুই তোর পূজা সন্ধ্যা লইয়াই যদি থাকিতে চাহিস্, সংসারের কোনও কাজেই যদি না লাগিস্, তোর পূজার আয়োজনের জন্য সংসারের ক্ষতি করিয়া সময় নষ্ট করিতে পারিবে না।”—“পূজার আয়োজন করিতে গেলে সময় নষ্ট হয় মনে করি না! তবে কেন ঘরের মেয়েছেলেরা এই কাজটুকু পারিবে না, তাহা আমি বুঝিনা!”—“তা' বোঝ আর নাই বোঝ, কেহই তোমার জন্য সময় নষ্ট করিবে না,

পার নিজে করিয়া নিয়ো, না হয়, ওসব ছাড়।”—রাজেন্দ্র ধীরে ধীরে বারান্দা হইতে নামিয়া আসিল। ভ্রাতার মুখের দিকে তাহার শান্ত দৃষ্টি উৎসারিত করিয়া কহিল,—“কেন, আমি কি সংসারের কেহ নহি?—আমার এতটুকু কাজ কেহ করিতে পারিবে না, রাঙ্গা বৌও পারিবে না, এমন কথা বলিতেছ।”—“হাঁ বলিতেছি,—সংসারের এক কড়ার উপকার যখন তোমাকে দিয়া পাওয়া যাইবে না, তখন তুমিই বা সংসারের কাছ হইতে কি আশা করিতে পার?” একটা তীব্র অপমান বোধ রাজেন্দ্রের অন্তরকে ব্যথিত করিয়া তুলিতেছিল! সে চিরদিনই নিরীহ; ভ্রাতার গলগ্রহ। কিন্তু ভ্রাতা যে এমন করিয়া তাহাকে আঘাত প্রদান করিবেন তাহা সে কোনও দিন স্বপ্নেও মনে করিতে পারে নাই। তাহার দুই চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিল! সে ধীরে ধীরে কহিল, “আর কিছু আশা না করি, তোমার কাছে এমন রূঢ় কথাগুলি স্বপ্নেও আশা করি নাই! যাক্, সবই আমি করিয়া নিব—আমার জন্য কাহাকেও কিছু করিতে হইবে না! আমি আর কাহারও সাহায্য চাহিব না।”—অশুভ মুহূর্ত্তে দেবেন্দ্রনাথ উত্তেজিত মস্তিষ্ক লইয়া ভ্রাতার সহিত তর্ক করিতে আসিয়াছিল। তর্ক যে এতটা বাড়িয়া উঠিবে সে প্রথমে তাহা মনে করিতে পারে নাই। এখন সে সংযম হারাইয়া ফেলিয়াছিল; ক্রমাগত কি যে কতকগুলি অসম্বদ্ধ কথা তাহার মুখ দিয়া বাহির হইতেছিল, সে বোধ হয় তাহা নিজেই ভাল করিয়া বুঝিতে পারিতেছিল না। রাজেন্দ্রের কথা শুনিয়া সে হঠাৎ বলিয়া ফেলিল, “যাহাকে দুই মুঠা অন্নের জন্য অন্যের উপর নির্ভর করিতে হয়, তাহার এত কথা কেন?”—কথাটা বলিয়াই দেবেন্দ্র চমকিয়া উঠিল; সেত এমন করিয়া বলিতে চাহে নাই! সামান্য গর্ত্ত খুঁড়িতে যাইয়া কে নাকি কালসর্প বাহির করিয়াছিল। সেই সর্প তাহাকে ক্ষমা করে নাই,—দংশন করিয়াছিল। দেবেন্দ্র যে তীব্র হলাহল উদ্গীরণ

করিল, তাহা রাজেন্দ্রকে স্পর্শ করিল। অন্তরালে আর একটী অশ্রুমুখী নারী এই বিতর্ক শুনিতেছিল, তাহাকেও স্পর্শ করিল।—তীব্র আঘাত পাইলে মানুষ যেমন তন্মুহূর্ত্তেই তাহার সমগ্র অনুভূতি-টুকুকে হারাইয়া ফেলে, এবং পর মুহূর্ত্তেই আঘাতের তীব্রতা পূর্ণভাবে অনুভব করিয়া চীৎকার করিয়া উঠে, ভ্রাতার কথা শুনিয়া রাজেন্দ্র প্রথমে বিস্মিত, স্তব্ধভাবে চাহিয়া রহিল, পরক্ষণেই তাহার মুখ দিয়া তেমনি করিয়া একটা অস্ফুট আর্ত্ত চীৎকার বাহির হইয়া আসিল। "দাদা, দুই মুঠা অন্ন দিয়া থাক—এক মুঠা তোমার কনিষ্ঠকে, আর এক মুঠা তোমার ভ্রাতৃবধূকে! আর না দিতে হইলেই কি সব গোল মিটিয়া যাইবে?—তবে তাহাই হউক!" রাজেন্দ্র দ্রুতপদে সেখান হইতে চলিয়া গেল! দেবেন্দ্র হতবুদ্ধি হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল! না, সে তো ভ্রাতাকে এমন করিয়া বলিতে চাহে নাই,—এমন করিয়া আঘাত করিতে চাহে নাই!

২

সাংসারিক হিসাবে ধরিতে গেলে রাজেন্দ্র এক প্রকার অকর্ম্মণ্য। অর্থোপার্জ্জনের দিকে তাহার লক্ষ্য কোনও কালেই ছিল না। লেখা-পড়াও এমন কিছু সে শিখিয়াছিল না, যাহাতে কোনও কর্ম্মপ্রাপ্তি তাহার পক্ষে সহজ হইতে পারে। সে চিরদিনই ভ্রাতার উপর একান্ত নির্ভরশীল ছিল। গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য ভ্রাতার মুখাপেক্ষী। কিন্তু ভ্রাতার অন্নে যে তাহার অধিকার ততক্ষণ পর্য্যন্ত, যতক্ষণ তিনি অনুগ্রহ করিয়া সেই অন্নদান করিবেন, ইহা সে বুঝিত না। কোথায়ও যে কোনও পার্থক্য থাকিতে পারে, একপক্ষে দাতার গর্ব্ব এবং অন্যপক্ষে দানগ্রহীতার দৈন্য থাকিতে পারে, রাজেন্দ্র তাহা কোনও দিনেই মনে করিতে পারে নাই। দেবেন্দ্র কতদিন কত তীব্র কথা তাহাকে শুনাইয়াছে, সে তাহা জ্যেষ্ঠের অনুশাসন বাণী বলিয়াই মাথা পাতিয়া গ্রহণ করিয়া

আসিয়াছে। অন্ধকার রাত্রিতে পথ চলিতে চলিতে বিদ্যুতালোকে কালসর্প দেখিয়া পথিক যেমন চমকিয়া উঠে, দেবেন্দ্র তর্কের মুখে অতর্কিতে যে হলাহল উদ্গীরণকারী কালসর্পকে কনিষ্ঠের সম্মুখে বাহির করিয়া আনিল, তাহা দেখিয়া রাজেন্দ্র চমকিয়া উঠিল! সংসার এতদিন তাহার কাছে সহজ, সরল ভাবেই চলিতেছিল, আজ হঠাৎ তাহার গতি বক্র হইয়া উঠিল,—তাহার নিষ্ঠুর অকরুণ মূর্ত্তি বাস্তবরূপে রাজেন্দ্রের স্তম্ভিত দৃষ্টির কাছে ফুটিয়া উঠিল! সে ভ্রাতার সম্মুখ হইতে ছুটিয়া বাহির হইয়া গিয়াছিল। মধুমতী যেখানে উচ্ছলিত বেগে ছুটিয়া চলিয়াছে, সে একটু শান্তি পাইবার আশায় সেইখানেই চলিয়া আসিল। একটা পুরাতন জীর্ণ ঘাটলার ভাঙ্গা সিঁড়ির উপর সে বসিয়া পড়িল! দূরে পশ্চিমাকাশে চক্রবাল রেখার কাছে সূর্য্য অস্ত যাইতেছে! তাহার রঞ্জিত রেখায় খণ্ডমেঘগুলি বিচিত্র বর্ণে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে। শ্যামল ধান্যক্ষেত্র আন্দোলিত করিয়া, তরঙ্গশীর্ষ চুম্বন করিয়া, কাশ-চামর দুলাইয়া বায়ুপ্রবাহ ছুটিতেছে। রাজেন্দ্র বসিয়া বসিয়া ভাবিতেছিল। তাহার মনে হইতেছিল, আজিকার দিন পর্য্যন্ত সে যে বাড়িয়া উঠিয়াছে, ইহার মধ্যে যেন কোনই সার্থকতা নাই, আবশ্যকতা নাই! নিজের গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য দুমুঠা অন্নের সংস্থান করিবার ক্ষমতাও তাহার নাই, এমনি অপদার্থ, অকর্ম্মণ্য সে! যে নিজেই চলিতে পারে না, তাহার উপর আবার একটি বোঝা চাপানো হইয়াছে! যে সাধ্বী নারী তাহার মুখের দিকে চাহিয়া দিন কাটাইতেছে, তাহাকে সুখিনী করিবার জন্যও তো সে কোনও বন্দোবস্তই করিতে পারে নাই! সমস্ত শক্তি লুটাইয়া দিয়া সেই নারী যে সংসারের জন্য খাটিতেছে, সে সংসারের তাহার কোনও অধিকারই নাই; সেখানে সে আশ্রয়টুকুও পাইবে না! সে যে খাটিয়াছে তাহা শুধু দুই মুঠা অন্নসংস্থানের জন্যই, নিজের সংসারের জন্য নহে,—এই কঠিন

সত্য আজ তাহার কাছে হঠাৎ সুস্পষ্টরূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে! অদৃষ্টের এ কি নির্ম্মম উপহাস! কিন্তু সে তো কোনও উপায়ই খুঁজিয়া পাইতেছে না! পত্নী সুলতা যদি না থাকিত, তাহা হইলে সে একদিকে চলিয়া যাইত! সংসারের সহিত সে কোনও বন্ধনই তো চাহে নাই! তবু এ কি স্বর্ণশৃঙ্খলে সে বাঁধা পড়িয়াছে! এ শৃঙ্খলকে ফেলিয়া যাওয়া যায় না, ছিঁড়িয়াও যাওয়া চলে না! কি করিবে সে! তাহার অন্তর বেদনা নিবিড় হইয়া আসিতেছিল;—চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল! সে তাহার দুইপাণি যুক্ত করিয়া একবার উর্দ্ধে অনন্ত নীলাকাশের দিকে চাহিল!—হে অন্তর-দেবতা! হে বিশ্বেশ্বর! হে শঙ্কর! সমস্ত জীবন ভরিয়া ত একমনে তোমাকেই জানিয়াছি;—আজ যে অপমান গ্লানি তুমি তোমার অবোধ সন্তানকে দিয়াছ, তাহা বহন করিবার শক্তি প্রদান কর। নদীর কূলে কূলে, শ্যামল বনের ছায়ায় ছায়ায়, সন্ধ্যার অন্ধকার গাঢ় হইয়া আসিতেছিল। সেই মৌন সন্ধ্যায় রাজেন্দ্র তাহার অন্তর বেদনাকে অন্তরতমের চরণে নিবেদন করিয়া দিতেছিল! যে সংসারের বাস্তব রুক্ষ মূর্ত্তিকে কোনও কালেই প্রত্যক্ষ করে নাই, তাহার কাছে ক্ষুদ্র একটি আঘাতও তীব্রতম হইয়া উঠে! এই আঘাতের বেদনাটাকে রাজেন্দ্র কোনও মতেই ভুলিতে পারিতেছিল না। সে যখন বাড়ী আসে, তখন ক্ষুদ্র পল্লীখানি সুপ্তিমগ্ন হইয়া রহিয়াছে। দেবেন্দ্র কোনও কার্য্যোপলক্ষে রাত্রের গাড়ীতেই কলিকাতা চলিয়া গিয়াছিল। ঘরে প্রবেশ করিয়া রাজেন্দ্র দেখিল, সুলতা তাহার অপেক্ষায় বসিয়া রহিয়াছে। রাজেন্দ্র কোনও কথা না বলিয়া শুইয়া পড়িল। সে পত্নীর মুখের দিকে চাহিতে পারিতেছিল না। সুলতা স্বামীর শয্যাপার্শ্বে আসিয়া বসিল। পাখাখানা টানিয়া লইয়া বাতাস করিতে লাগিল। কিছু পরে রাজেন্দ্র সুলতাকে টানিয়া কাছে আনিল, কহিল, "থাক্, আর হাওয়া করিতে হইবে

না,—তুমি মশারিটা ফেলিয়া শোও!"—সুলতার চক্ষের কোণে অশ্রু দেখা দিল। সাহস করিয়া ধীরে ধীরে কহিল,—"কিছু মুখে দেবে না?"—"না, তুমি দাসীপনা করিয়া আমার এক মুঠা অন্নের সংস্থান করিবে,—সে অন্নে আর আমার রুচি নাই! তুমি আইস!"—সুলতা স্বামীর বুকের কাছে মুখ লুকাইয়া অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিল! রাজেন্দ্র মৃদুস্বরে ডাকিল, "সুলতা!" "কেন?" সুলতার কণ্ঠ বাষ্পরুদ্ধ!—"এমন অপদার্থের হাতেই পড়িয়াছ, যে তোমার এক মুঠা অন্নের সংস্থান করিবার ক্ষমতাও রাখে না!" "ছিঃ, অমন কথা কেন বলিতেছ? তোমার সঙ্গই আমার সুখ; তার বেশী ত আমি কিছু চাহি না!"—"সুলতা, সংসারে একমাত্র তুমিই আমার বন্ধন; তুমি যদি পত্নীরূপে না আসিতে, একদিকে চলিয়া যাইতাম!" "দুই মুঠা অন্নের সংস্থান, যিনি সৃষ্টি করিয়াছেন তিনিই করিয়া দিবেন—সে জন্য তুমি কেন অমন করিতেছ? দিন কাটিবেই,—দিন কাহারও জন্য বসিয়া থাকে না!—অসহায়ের যিনি সহায়, তিনি আমাদের দিকেও মুখ তুলিয়া চাহিবেন।"—রাজেন্দ্র কোনও কথা কহিল না। সুলতার মুখে এত কথা সে কোনও দিনই তো শুনে নাই! সুলতার সহানুভূতি পাইয়া তাহার অন্তর পরিতৃপ্ত হইল! বিশ্ব যাঁহার ইঙ্গিতে পরিচালিত হইতেছে, তাঁহার রাজ্যে অবিচার নাই। ছোট বড় সকলকেই তিনি রক্ষা করেন। তাঁহার মঙ্গল ইচ্ছা জয়যুক্ত হউক, পূর্ণ হউক! রাজেন্দ্র সেদিন সুলতার নির্ম্মল, শুভ্র, কোমল বক্ষের মধ্যে তাহার উত্তপ্ত ললাট রক্ষা করিয়া যে তৃপ্তি পাইল, তাহার তুলনা নাই! আজিকার অপমান ও গ্লানির ভিতর দিয়াও যে ঠাকুর তাহার জন্য এতখানি আনন্দ, তৃপ্তি পরিবেষণ করিবেন, রাজেন্দ্র তাহা স্বপ্নেও মনে করিতে পারে নাই।

৩

প্রভাতে রাজেন্দ্র কহিল,—"পূজার আয়োজনটা কি নিজেই করিয়া লইব, সু ?"—সুলতা হাসিল। আজ সর্ব্বপ্রকার রিক্ততার মধ্যেই যে তাহাকে নিজের সংসারটীকে আরম্ভ করিতে হইবে, ইহা ভাবিয়াও তাহার চোখে মুখে একটা উৎসাহের দীপ্তি জাগিয়া উঠিতেছিল। তাহারা যে সত্যই রিক্ত, দীন, কাঙ্গাল,—সংসারকে আজি তাহারা সর্ব্বপ্রথম নূতন করিয়া আরম্ভ করিবে! কোথায়ও কিছু নাই,—কোনও প্রকারের আয়োজন নাই। সহজ, সরল গতিতে এই দুইটী প্রাণীকে লইয়া একটী সংসার রচিত হইবে। উভয়েই পরম নিশ্চিন্ত! চোখে চোখে মিলিতেই হাসি উছলিয়া উঠিতেছে। কোনও বাধা নাই,—কুণ্ঠার দৈন্যে কেহই সঙ্কুচিত হইয়া উঠিতেছে না। সুলতা ও রাজেন্দ্র স্থির করিয়াছিল, বিশ্বের ঠাকুরকেই কেন্দ্র করিয়া তাহারা তাহাদের ক্ষুদ্র সংসারটীকে রচনা করিয়া তুলিবে! সুতরাং সুলতা প্রভাতে শয্যাত্যাগ করিয়াই স্নানান্তে পূজার আয়োজনে প্রবৃত্ত হইল। পুকুরের কাছ হইতে মাটি আনিয়া শিবমূর্ত্তি গঠন করিল; পুষ্পচয়ন করিল; সমস্ত গুছাইয়া সে যখন আসন আস্তৃত করিতেছিল, তখন গৃহমধ্যে ললিতা প্রবেশ করিয়া কহিল, "বলি, আজ কি উনান জ্বালিতে হইবে না, ছেলেপেলেগুলি যে কাঁদিয়া খুন হইল!"—সুলতা ললিতাকে গৃহ প্রবেশ করিতে দেখিয়া প্রথমটা বড়ই চমকিয়া গিয়াছিল। পরক্ষণেই মুখ ফিরাইয়া একটু হাসিয়া কহিল,—"যাইতেছি, কিন্তু পূজার আয়োজনটা সারিয়াই যাইব!"—ললিতা বিস্মিতা হইয়া সুলতার মুখের দিকে চাহিল। সে নিজের কর্ণকে বিশ্বাস করিতে পারিতেছিল না! যে সুলতা চিরদিন নীরবেই তাহার আজ্ঞা প্রতিপালন করিয়া আসিতেছে সে যে আজ তাহার কথায় এমন সহজ ভাবে উত্তর দিবে, ইহা সে মনেই করিতে

পারে নাই। ললিতা ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া কহিল,—"পূজার আয়োজন করিতে যাইয়া সকাল বেলার সময়টা নষ্ট করিবে,—সমস্ত 'দিন কোনও কাজেরই সুবিধা হইবে না—তাহার হিসাব আছে?"—ললিতার স্বর ক্রমেই রুক্ষ হইয়া উঠিতেছিল। সুলতা মৃদুস্বরে কহিল, "পূজার আয়োজনটাও তো করিতে হইবে!" ললিতা ভাবিল সে স্বপ্ন দেখিতেছে! সে কিছুকাল সুলতার মুখের দিকে অবাক্ হইয়া চাহিয়া রহিল। একি সেই সুলতা? কি সাহস তাহার? কিন্তু সুলতা তেমনি পূজার আয়োজনে ব্যস্ত রহিয়াছে! তাহার মুখের মৃদু হাসিটুকু তখনো অধরপ্রান্তে লাগিয়া রহিয়াছে। "যা' ভাল বোঝ কর রে বাপু!" ললিতা দ্রুতপদে সেখান হইতে চলিয়া গেল! আজ সুলতার কাছে তাহাকে যে পরাভব স্বীকার করিতে হইল, তাহা তাহার স্বপ্নেরও অগোচর ছিল। সে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিল, সুলতার এ ধৃষ্টতা সে চূর্ণ করিয়া দিবেই।

৪

সুলতা পাক করিয়া ললিতার ঘরের দুয়ারে দাঁড়াইয়া কহিল,—"দিদি, রান্না হইয়া গেল। ছেলে-মেয়েদের দিয়া যাও!"—কথাটা বলিয়াই সুলতা রান্না-ঘরের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। সুলতা বরাবরই পাক করিত, কিন্তু পাক শেষ হইলে ললিতা আসিয়া পরিবেষণ করিত। পরিবেষণ করিবার আনন্দটুকু সুলতার অদৃষ্টে কোনও দিনই জুটে নাই। ললিতা অন্ধকারমুখে রান্নাঘরে প্রবেশ করিল। সুলতা ধীরে ধীরে তাহার ঘরের দিকে চলিয়া আসিল। ললিতা একবার অপাঙ্গ-দৃষ্টিতে সুলতাকে দেখিয়া লইল! ছেলেমেয়েদের খাওয়া হইয়া গেল, তবু সুলতা ফিরিল না' দেখিয়া কৌতূহলী ললিতা সুলতার দুয়ারের কাছে আসিয়া একবার তীব্র স্বরে কহিল,—"বলি একবার এদিকে

আসিতে হইবে, তাহা কি ভুলিয়া গেলে ?" সুলতা একটু কুণ্ঠিত ভাবে কহিল, "আমি একটু পরে যাইব।"—ললিতা দুয়ারের কাছে মুখ বাড়াইয়া দিয়া ঘরের ভিতরে দৃষ্টিপাত করিল। সে ঘরের মধ্যে সুলতাকে যে কার্য্যে ব্যাপৃতা দেখিল, তাহাতে তাহার বিস্ময়ের সীমা রহিল না। সুলতা তাহার স্বামীর জন্য পাক করিতেছিল। সে হঠাৎ ঘরের মধ্যে, প্রবেশ করিয়া কহিল, "কি রকম!"—সুলতা একটু আড়ষ্টভাবে উঠিয়া দাঁড়াইয়া অবগুণ্ঠনটা একটু টানিয়া দিল। রাজেন্দ্র সেখানে ছিল। ললিতার প্রশ্নের ভাব দেখিয়া সে একটু মৃদু হাসিল, কহিল,—"কি রকম কি, বৌ ?"—"এ সব কি হইতেছে ?"—তাহার স্বরের মধ্যে একটা রূঢ় কর্ত্তৃত্বের ভাব ছিল। "সহজ কথায়, পাক হইতেছে, তাহাতে বিস্ময়ের এমন কি আছে, বৌ!" ললিতা তাহার চক্ষুর প্রান্ত অবজ্ঞার ভাবে একটু সঙ্কুচিত করিয়া কহিল, "বেশ!"—তারপরই সে দ্রুতপদে ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিল। সুলতা যে তাহার সংসারের সমস্ত কার্য্য নিঃশব্দে সম্পন্ন করিয়া দিয়া আসিয়াছে এবং তারপর নিজের ঘরের কাজ করিতেছে, এটা ললিতার কাছে বিষম অপমানের মত মনে হইতে লাগিল! সে নিষ্ফল আক্রোশে অধর দংশন করিতে লাগিল। এ অপমানের প্রতিশোধ সে গ্রহণ করিবেই! সন্ধ্যার পূর্ব্বে সুলতা যখন পুনরায় ললিতার পাকগৃহে প্রবেশ করিল, তখন ললিতা দ্রুত কর্কশকণ্ঠে বলিয়া উঠিল,—"কি, রাত্রির চাউলের সংস্থান করিতে আসিয়াছ বুঝি ?"—ললিতার মনে সুলতার সাধুতা সম্বন্ধে কোনও সন্দেহ কোনও কালেই ছিল না। তবু আজ সে তাহাকে আঘাত ও অপমান করিবার সুযোগই সমস্ত দিন অনুসন্ধান করিয়াছে! "যাও, যাও, আর তোমার ন্যাকামি করিতে হইবে না।"—ললিতার কথা শুনিয়া সুলতার শান্ত চক্ষু হঠাৎ একবার জ্বলিয়া উঠিল ; তারপর সে নিজেকে সংযত করিয়া লইয়া ধীরে ধীরে কহিল,—"দিদি,

মানুষকে বেদনা দিতে হইলে কি এমনি করিয়াই দিতে হয় ?” ললিতা একবার তাহার মুখের দিকে উপেক্ষাভরে চাহিল ; তারপর নিঃশব্দে হস্ত প্রসারিত করিয়া উন্মুক্ত দুয়ার দেখাইয়া দিল। অপমানিতা স্থলতা ধীরপাদবিক্ষেপে গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেল। দন্তে ওষ্ঠ চাপিয়া ললিতা কহিল, “বিষের নামে খোঁজ নাই তার কুলাপানা চক্র !”

৫

দুই দিন কাটিয়া গেল। তৃতীয় দিন চাকা ঘুরিয়া দাঁড়াইল ! কলিকাতা হইতে হঠাৎ একটা টেলিগ্রাম আসিয়া সব ওলট-পালট করিয়া দিল ! ললিতা অল্প ইংরাজি জানিত, টেলিগ্রাম পড়িয়া আর কোনও কথা বিশেষ না বুঝিতে পারুক্, Small-pox কথাটা বুঝিল ! স্বামী বসন্তরোগে আক্রান্ত ; সে চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। রাজেন্দ্র ঘরের মধ্যে ছিল, সে বাহির হইয়া আসিল। টেলিগ্রাম পিওনকে দেখিয়া সে ব্যস্ত ভাবে অগ্রসর হইয়া আসিল। “কি হইয়াছে বৌ”,—ললিতা হাতের কাগজখানা রাজেন্দ্রের দিকে ফেলিয়া দিয়া অঞ্চলে মুখ ঢাকিয়া কাঁদিতে লাগিল। তাহার নারী হৃদয় বিপদ আশঙ্কা করিয়া ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিল ; সে বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে কহিল, “কি হবে ঠাকুরপো !”—বিপদের মুহূর্ত্তে তাহার গর্ব্ব, অভিমান, সব চূর্ণ হইয়া গেল ! এক ঘণ্টা পূর্ব্বেও সে স্থলতাকে অপদস্থ করিবার সুযোগ খুঁজিতেছিল, রাজেন্দ্রের প্রতি শ্লেষবর্ষণ করিয়া প্রতিবেশিনী রমণীর কাছে কত মিথ্যা কাহিনীর অবতারণা করিতেছিল, কিন্তু বিপদ যখন রুদ্রমূর্ত্তিতে তাহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল, তখন সে মান, অভিমান, গর্ব্ব সবই ভুলিল !—দুই দিন পূর্ব্বে যে রাজেন্দ্রকে সে তুচ্ছ করিয়াছে, অপমান করিয়াছে, এখন তাহাকেই সর্ব্বাপেক্ষা আপনার জন মনে করিয়া তাহারই কাছে

আসিয়া দাঁড়াইল। রাজেন্দ্র কহিল 'বৌ, টাকা আছে? কিছু টাকা আন ত! পাঁচটায় গাড়ী; চারিটা বাজে",—"কত টাকা ঠাকুরপো?"—"যত বেশী পার"—"আমার কাছে দুই শত টাকার বেশী নাই ত!"—"শীঘ্র যাও—যাহা থাকে আন, দেরী করিলে চলিবে না—" ললিতা দ্রুতপদে কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিল এবং মুহূর্ত্ত মধ্যেই ফিরিয়া আসিল। "ঠাকুরপো, এই দু'শ এগার টাকা ছিল, আর এই বালা ও অনন্ত দিলাম, কিন্তু আর একটা কথা, —ললিতার চক্ষু আবার অশ্রুতে ভরিয়া উঠিল! "কি বৌ,"— "আমাকেও নিয়া চল, ঠাকুরপো,"—"সে হয় না, বৌ। সময় এত অল্প, তোমাকে নিয়া যাইতে হইলে এগাড়ী ধরা যাইবে না; —আমি দৌড়াইয়া গেলে এ গাড়ী ধরিতে পারিব, কম পথ নয় তো, বৌ!—আমি কাল বীরেনকে পাঠাইব, বীরেন তো কলিকাতায় আছে, তার সঙ্গে যাইয়ো!" বীরেন রাজেন্দ্রের ভাগিনেয়। রাজেন্দ্র আর গৃহপ্রবেশ করিল না। সুলতা নিঃশব্দে তাহার যাত্রার উপযোগী আবশ্যক দ্রব্যাদি ইতিমধ্যে গুছাইয়া লইয়া আসিয়াছিল। রাজেন্দ্র চাদরখানি কাঁধে ফেলিয়া জুতা ও পুঁটুলিটা হাতে করিয়াই ছুটিল,—ললিতার উত্তরের অপেক্ষা করিল না। সুলতার মুখের দিকেও একবার চাহিল না! শুধু নারায়ণ-গৃহের সম্মুখে চাহিয়া একবার মাথা নত করিয়া প্রণাম করিল, মনে মনে কহিল, "ঠাকুর রক্ষা কর! রক্ষা কর!!" তখন ললিতা সেইখানেই মাটিতে লুটাইয়া পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল! তাহার কত কথা মনে হইতেছিল, তাহা তো সে মুখ ফুটিয়া বলিতে পারিবে না! তাহার কেবলি সুলতার সেদিনকার কথাটা মনে পড়িতেছিল,—"দিদি, মানুষকে বেদনা দিতে হইলে কি এমনি করিয়াই দিতে হয়!" হায়, কেন সে এমন করিয়া সুলতাকে বেদনা দিয়াছিল, এমন করিয়া তাহাকে অপমান করিয়াছিল! সুলতা ধীরে ধীরে ললিতার কাছে আসিয়া বসিল;

সে নিজের অশ্রুই রোধ করিতে পারিতেছিল না; ললিতাকে কেমন করিয়া প্রবোধ দিবে? প্রবোধ দিবার কোনও উপায়ই খুঁজিয়া না পাইয়া সে ধীরে ধীরে ললিতার আলুলায়িত কেশরাশি গুছাইতে লাগিল। হঠাৎ ললিতা সুলতার হাত ধরিয়া কহিল, "সুলতা, আমাকে ক্ষমা কর্! ক্ষমা কর্!"—সুলতা দিদির পায়ের ধূলা মাথায় লইয়া কহিল, 'ছিঃ দিদি, আমি যে তোমার ছোট বোন্, অমন কথা বলিতে নাই!"

৬

প্রায় দুইমাস কাটিয়া গিয়াছে। একখানি ঈজিচেয়ারের উপর দেবেন্দ্র শায়িত ছিল। ভীষণ বসন্তরোগে তাহার চেহারা এত পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, যে তাহাকে হঠাৎ চিনিতে পারা যায় না! রাজেন্দ্র তাহাকে শুশ্রূষা করিয়া বাঁচাইয়া উঠাইয়াছে! সে প্রাণের মায়া করে নাই, রোগ-কল্পনায় আশঙ্কিত হয় নাই! নিশিদিন অবিশ্রান্তভাবে সে ভ্রাতার শয্যাপার্শ্বে বসিয়া তাহার সেবা করিয়াছে। রোগীর ওষ্ঠের প্রত্যেক কম্পনটি পর্য্যন্ত লক্ষ্য করিয়া, তাহার যখন যাহা আবশ্যক তাহা যোগাইয়াছে! চিকিৎসকেরা বলিয়াছিলেন, এমন করিয়া প্রাণের মায়া তুচ্ছ করিয়া রাজেন্দ্র যদি তাহার সেবা না করিত, রোগী কখনই রক্ষা পাইত না! কয়েকদিন হইল দেবেন্দ্রকে বাড়ী লইয়া আসা হইয়াছে! সে বিপদ্মুক্ত হইলেও এখনও সবল হয় নাই। ললিতা কক্ষের মধ্যে কি কার্য্যে ব্যাপৃতা ছিল; দেবেন্দ্র কহিল,—"ওগো, আমার অকর্ম্মণ্য ভাইটাকে একটু ডাকিয়া দাওতো!"—দেবেন্দ্রের রোগপাণ্ডুর মুখখানি একটু উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। ললিতা একটু হাসিয়া কহিল,—"যাই—কেমন আর ভাইয়ের সঙ্গে বিবাদ করিবে?"—কথাটা বলিয়াই তাহার দুই চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিল। সে হাসিতে হাসিতে অঞ্চলে চক্ষু মুছিল! দেবেন্দ্র কহিল

—"ডাক তুমি তাহাকে! ভাই, হাজার বিসম্বাদ হইলেও, ভাই! —একরক্ত বুঝিলে ত!" ললিতা শেষ কথাটার শ্লেষটুকু বুঝিল, কহিল, "তা' কি আর আমি অস্বীকার করি? ভারি শিক্ষা দিয়াছে ঠাকুরপো আমাকে। সে যদি সম্পর্কে আমার বড় হইত, প্রণাম করিয়া পায়ের ধূলা মাথায় লইতাম!" "যেন সম্পর্কে বড় আর কেহ নাই! আরে, ঠাকুরপোর দাদা তো আছে"—দেবেন্দ্র হাসিয়া উঠিল। ললিতা উঠিয়া আসিয়া, গলায় অঞ্চল জড়াইয়া, দেবেন্দ্রকে প্রণাম করিল এবং পদধূলি গ্রহণ করিল! "তা' ধূলা তো আর পায়ে নাই,—ষ্টকিংএর উপর হাত বুলাইলে আর কি হইবে?"—ললিতা হাসিয়া কহিল, "ধূলা কি আর তোমরা পায়ে রাখিয়াছ, তোমরা যে সাহেব হইয়াছ।"—এমন সময়ে কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া রাজেন্দ্র ডাকিল, "বৌ!"—ললিতা ফিরিয়া কহিল, "এই যে, তোমার 'অকর্ম্মণ্য ভাইটী' আসিয়াছেন!!!"—"কি করিতেছিলি রাজেন্?" রাজেন্দ্র একটু হাসিয়া কহিল, "এই পূজার আয়োজন।"—দেবেন্দ্র ললিতার দিকে ফিরিয়া কহিল, "রাজেনের পূজার আয়োজনটা এই ঘরেই করিয়া দাও তো; —আমি পূজা দেখিব।" "আমি সবই ঠিক করিয়া রাখিয়া আসিয়াছি, তুমি লইয়া আসিলেই চলিবে!"—ললিতা উঠিয়া গেল এবং শীঘ্রই পূজার সাজ লইয়া ফিরিয়া আসিল। দেবেন্দ্র তাহার স্নেহ-কোমল দৃষ্টি ভ্রাতার মুখের উপর নিবদ্ধ করিয়া ধীরে ধীরে কহিল, "রাজেন্, আজ আমার সাম্নে তোর পূজা কর্, আমি দেখিব!" রাজেন্দ্র জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সম্মুখে বসিয়া পূজা করিতে বাস্তবিকই কেমন একটু সঙ্কোচ বোধ করিতেছিল। দেবেন্দ্র একটু অন্যমনস্ক ভাবে কহিল, "এবার আমি সুস্থ হইয়া উঠিলে, আমার পূজা লওয়ার বন্দোবস্ত করিয়া দিস্ রাজেন্!" রাজেন্দ্র ললিতার মুখের দিকে চাহিয়া একটু হাসিল। ললিতা একটু কুণ্ঠিতা হইতেছিল; তাহার অনেক কথা মনে পড়িতেছিল। সে

রাজেন্দ্রের দিকে অশ্রুসিক্ত নয়নপল্লব তুলিয়া কহিল,—"ঠাকুরপো, সেই সঙ্গে আমাকেও মনে করিও।"—রাজেন্দ্র তাহার পূজার আসনের উপর যাইয়া দাঁড়াইল। হঠাৎ দেবেন্দ্র কহিল,—"পূজায় বসিবার পূর্ব্বেই একটা কথা আছে আমার, আমি তোর কাছে যে অপরাধ করিয়াছিলাম, সেজন্য আমি ক্ষমা না চাহিয়া কোনমতেই শান্তি পাইতেছি না। তুই আমাকে ক্ষমা কর্, রাজেন!"—দেবেন্দ্রের দুই চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিল! "ছিঃ, এ তুমি কি বলিতেছ দাদা!"—রাজেন্দ্র ভ্রাতার পায়ের কাছে মাথা নত করিয়া প্রণাম করিল। দেবেন্দ্র তাহার রোগ-দুর্ব্বল হস্ত প্রসারিত করিয়া রাজেনকে কোলের কাছে টানিয়া আনিল। ললিতা অঞ্চলে চক্ষু মুছিতেছিল!

ব্যথিত

সতীশের বিবাহের তিন বৎসর পরে তাহার মাতা-ঠাকুরাণীর কাল হইল। সতীশের স্ত্রী চারুর বয়স তখন পনর বৎসর। সতীশের একটি ছোট ভাই ছিল, সুরেশ। সুরেশ চারুর চেয়ে দুই বছরের ছোট। চারুর দুই বৎসরের একটি সহোদর ছিল, তাহারও নাম ছিল, সুরেশ। সে চারুর বিবাহের কিছু পূর্ব্বেই মারা গিয়াছিল। চারু শ্বশুরবাড়ী আসিয়া তাহার এই প্রায় সমবয়স্ক দেবরটিকে ঘোমটার আড়াল হইতে প্রথম দিনই, কি জানি কেন, স্নেহের চক্ষে দেখিল। তারপর সে যখন জানিল, এই দেবরটির নামও সুরেশ, তখন তাহার চক্ষু অশ্রুনিষিক্ত হইয়া উঠিল! নব বধূটিকে কথা বলাইবার জন্য সুরেশকে বেশী সাধিতে হইল না। কারণ চারু পূর্ব্ব হইতেই উৎসুক হইয়া বসিয়াছিল, কখন তাহার দেবর তাহাকে কথা বলিবার জন্য একটিবার সাধিবে। সুরেশ যখন আসিয়া বলিল, "বৌদি, আমার সঙ্গে কথা বল্‌বে না? না বলত তোমার সঙ্গে আড়ি।" তখন চারু মৃদু হাসিয়া বলিল, "কেন, আমি কি বলেছি যে আপনার সঙ্গে কথা বল্‌ব না?" সুরেশ জিতিল! কারণ চারু তাহাদের বাড়ীতে আসিয়া সর্ব্বপ্রথম তাহারই সঙ্গে কথা বলিয়াছিল! এর পূর্ব্বে আরও অনেকে সাধিয়াছিল,—কিন্তু চারু আসিয়া সুরেশকে দেখিয়াই স্থির করিয়াছিল যে, সে প্রথম তাহারই সঙ্গে কথা বলিবে। সুরেশ তাহার বিজয়গর্ব্ব লুকাইয়া রাখিতে পারিল না; বিজিতের প্রতি স্নেহবশতঃই হউক, বা অনুগ্রহ

বশতঃই হউক, সুরেশ চারুকে কএকটা কালোজাম ও পেয়ারা তাহার প্রথম প্রীতিউপহার স্বরূপ প্রদান করিয়া, নূতন উপহারের সন্ধানে বাহির হইয়া গেল। কিছুদিনের পরিচয়ের পর, চারু যেদিন সাশ্রুনয়নে সুরেশকে বলিল যে, তাহার একটি ছোট ভাই ছিল, এবং তাহারও নাম ছিল সুরেশ, সেদিন সুরেশের চক্ষু দুইটাও অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল! সুরেশ সেইদিন হইতেই চারুর উপর তাহার আব্দারের মাত্রাটা বাড়াইয়া দিল, এবং চারুর সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্য বিধানের জন্য যতগুলি ব্যবস্থা তাহার বালকোচিত বুদ্ধিতে আসিতে পারে, তাহার কোনটাই সে অবলম্বন করিতে বাকী রাখিল না।

হঠাৎ একদিন স্কুল হইতে আসিয়া সে চারুকে ডাকিয়া গোপনে বলিল, "আচ্ছা বৌদি, তোমার সুরেশ তোমাকে কি ব'লে ডাকৃত?" চারু বিষণ্ণমুখে বলিল, "দিদি"—"আচ্ছা, আমি তো তোমায় 'বৌদিদি' বলেই ডাকি,—তা' 'বৌ' টুকু ছেড়ে দিয়ে, এখন থেকে 'দিদি' বলেই ডাকি না কেন? আর তুমি আমাকে নাম ধরেই ডেকো,—না হয়,"—সুরেশ একবার এদিক্ ওদিক্ চাহিল! "না হয়' কি ঠাকুরপো?—" চারু স্নিগ্ধ স্বরে জিজ্ঞাসা করিল। তাহার শোকের তীব্রতা দূর করিবার জন্য এই বালকটির আগ্রহ দেখিয়া সে অন্তরে অন্তরে একটা সান্ত্বনা লাভ করিতেছিল। "তা' তা' তোমার সুরেশকে যা' বলে ডাকৃতে!" —সুরেশ একটু সঙ্কোচের সহিত কথাটি বলিল। এই আশঙ্কা করিয়াই বোধ হয় সে কুণ্ঠাবোধ করিয়াছিল। পাছে চারু তাহার মনের ভাবটা ঠিক না ধরিতে পারে! "আমি তা'কে ভাইটি বলে ডাকৃতাম"—চারুর কণ্ঠস্বর শোক-জড়িত হইয়া আসিতেছিল। "তা' আমাকেও না হয়"—কেমন করিয়া হঠাৎ কথাটা বলিয়া ফেলিবে, সুরেশ একটু দ্বিধা করিতেছিল! চারু বলিল—"ভাইটি বলিয়া?—আমার অনেক দিন ইচ্ছা হয়েছে, তা আপনি কি

ভাব্‌বেন, আর লোকে শুন্‌লেই বা কি বল্‌বে; এই ভয়েই আপনাকে কিছু বলি নাই!"—চারুর কপোল বাহিয়া বিন্দু বিন্দু অশ্রু গড়াইয়া পড়িল! কথাটা বলিবার পক্ষে, যে লজ্জাটুকু সুরেশকে বাধা প্রদান করিতেছিল, চারু তাহা ফুটিয়া বলিয়া দূর করিয়া দিল; তখন সুরেশ ভারি একটা আরাম পাইল। একটু কাছে সরিয়া আসিয়া সুরেশ চারুর হাত ধরিল,—তারপর আস্তে আস্তে বলিল, "দেখ দিদি, আমি তোমায় দিদি বলেই ডাক্‌ব — তুমি, যখন কেউ সাম্‌নে না থাকে তখন 'ভাইটি' বলে ডেকো, কেউ কাছে থাক্‌লে 'সুরেশ, কি 'ঠাকুরপো' যা' হয়, একটা কিছু বলে ডেকো! কেমন?—এই কথা রহিল,—ঠিক্ থাকে যেন! বুঝলে—বুঝলে? আর একটা কথা; তুমি আমাকে 'আপনি' বল্‌লে তোমার সঙ্গে এমন আড়ি—বুঝলে—বুঝলে?" চারু এই অকপট স্নেহাভিব্যক্তির কাছে একেবারেই ধরা দিল! তাহার অতৃপ্ত ভ্রাতৃস্নেহের উৎস এতদিন একমাত্র ভ্রাতার অভাবে উন্মুখ হইয়াছিল, আজি তাহা সুরেশকে বেষ্টন করিয়া পবিত্র গঙ্গোদকের ন্যায় শতধারায় প্রবাহিত হইল! সুরেশ মার কাছে আসিয়া বলিল, "মা, আমার তো 'দিদি' নাই, আমি বৌদিদিকেই দিদি বলে ডাক্‌ব! কেমন?" "আচ্ছা, বেশ ত!"—দুই বৎসরের পরে মাতা যখন মৃত্যুশয্যায় শায়িতা, তখন তিনি বধূকে ডাকিয়া বলিলেন, "মা, সুরু তোমারই ভাই, ওকে তুমিই দেখ্‌বে। তুমি বুদ্ধিমতী, তোমাকে আর বেশী কি বল্‌ব?"—সুরেশকে কহিলেন, "সুরু, বৌমা এতদিন তোর দিদিই ছিল, এখন মার মত হ'ল, তোরা দুই ভাই বোন্ চিরদিন মিলে মিশে থাকিস্!"

২

শ্বাশুড়ীর মৃত্যুর পর চারুকে বাধ্য হইয়া গৃহিণীর দায়িত্বপূর্ণ পদ গ্রহণ করিতে হইল। সতীশ মেডিকেল কলেজে পড়িত।

কলেজের তৃতীয় ও চতুর্থ বৎসরে খাটুনী বেশী ; প্রায়ই 'ডিউটিতে' থাকিতে হইত ; তাই সতীশ বড় একটা বাড়ী আসিতে পারে নাই। যে দুইবার আসিয়াছিল, তাহার মধ্যে প্রথমবারু চারুর সঙ্গে কয়টি দিনের জন্য তাহার দেখা হয় ; দ্বিতীয়বার সে যখন আসে তখন চারু পিত্রালয়ে গিয়াছিল, কাজেই দেখা হয় নাই ; সুতরাং স্বামী স্ত্রীর ঘনিষ্ঠতা বাড়িয়া উঠিবার সুবিধা কোনও দিনই তেমন ঘটে নাই। বিশেষ সতীশ তাহার ডাক্তারী শেখার দিকে একান্ত ভাবেই ঝুঁকিয়া পড়িয়াছিল। আর চারুও ছিল, হিন্দুর ঘরের লজ্জানতা বধূটি ! জননীর মৃত্যু হওয়ার পর চারু ও সুরেশকে লইয়া কলিকাতায় বাসা করিয়া থাকা ছাড়া সতীশের উপায়ান্তর রহিল না। পরিবারের মধ্যে আর কোনও লোক ছিল না, শুধু ইহারাই তিনজন। পল্লীগ্রামে যে বিষয় সম্পত্তিটুকু ছিল তাহারই আয় হইতে সংসার চলিয়া যাইত। নায়েব মহাশয়ের উপর সম্পত্তি দেখিবার শুনিবার ভার দিয়া সতীশ চারু ও সুরেশকে লইয়া কলিকাতায় চলিয়া আসিল। নায়েব মহাশয় পুরাতন কর্ম্মচারী—বিশ্বাসী এবং সতীশের পিতার হিতৈষী বন্ধু ছিলেন। সম্পত্তির ভার তাঁহার উপর থাকিলে যে কোনও অনিষ্ট ঘটিবার সম্ভাবনা নাই সতীশ তাহা জানিত। সুতরাং সতীশ কলিকাতায় বাসায় আসিয়া, তাহার নরকঙ্কাল এবং সুরেশ ও চারুর পক্ষে নিতান্ত দুর্ব্বোধ্য প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ডাক্তারী পুঁথিগুলি লইয়া, নিশ্চিন্ত মনে ব্যাপৃত রহিল। চারু সতীশের পড়ার ঘরে আদবেই প্রবেশ করিতে চাহিত না। দেওয়ালের গায়ে ঝুলান বরফের ন্যায় সাদা নরকঙ্কালটা তাহার কাছে একটা কল্পনার প্রেতলোক সৃষ্টি করিয়া তুলিত ! তাহার মনে হইত ঐ কঙ্কাল-টার চারি পাশ দিয়া একটা অতৃপ্ত আত্মা দিনরাতই 'হা হা' করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে ! কঙ্কালের মায়া যেন সে আর কোন মতেই ছাড়িতে পারিতেছে না ! চারু এই সকল কথা লইয়া সুরেশের

সঙ্গে যতই আলোচনা করিত, ততই সতীশের পড়ার ঘরটা তাহার কাছে একটা বিরাট্ ভীতির আবাসস্থল বলিয়া প্রতীয়মান হইত! সুতরাং সতীশ বাহির হইবার পূর্ব্বে তার পড়ার ঘরটা প্রতিদিনই চাবি বন্ধ করিয়া রাখিয়া যাইত। চারু একদিন সতীশকে তাহার পড়ার ঘর বন্ধ করিয়া রাখিয়া যাইবার জন্য অনুরোধও করিয়াছিল! সে হয় ত মনে করিল, সতীশ যতক্ষণ বাড়ী থাকে, ততক্ষণ কঙ্কালটা ও তাহার পার্শ্ববর্ত্তী সেই কল্পিত প্রেতাত্মাটি নিরীহভাবে থাকে, কিন্তু সতীশ বাহির হইয়া গেলে যদি কঙ্কালটা গা' নাড়া দিয়া উঠে,—ওমা,—তখন সুরেশ আর সে এই নির্ব্বান্ধব বাসায় কি উপায় করিবে?

সতীশ কালেজে চলিয়া গিয়াছে। চারু তাহার ঘরে বসিয়া পান সাজিতেছে। একটা ঘুড়ির খানিকটা ছিঁড়িয়া গিয়াছে, সুরেশ তাহাই সারিয়া লইতেছে। পাশে হরিদ্রাবর্ণের সূতা-জড়ান 'লাটাই'টা পড়িয়া রহিয়াছে। হঠাৎ চারু জিজ্ঞাসা করিল,—"মানুষ মরিয়া কি হয়, সুরু?" "কেন, কঙ্কাল হয়"—বিজ্ঞের মত গম্ভীর ভাবে সুরেশ উত্তরটা দিল! চারু যখন এ বিষয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞ, সুরেশ তখন বিজ্ঞতা দেখাইতে ছাড়িবে কেন? বিশেষ ভুল ধরিবার কেহই ত সেখানে নাই! "দূর, তুমি পার্‌লে না সুরু,"—"বাঃ পার্‌লাম না কেমন, তুমি বলত! চারু তাহার শান্ত চক্ষু দুইটি বিস্ফারিত করিয়া বলিল, "আমি জানি,"—"তবে কি, বল না, দিদি!" "মানুষ ম'রে স্বর্গে যায়"। "স্বর্গ,—হুঁ,—আমার মা তা' হ'লে স্বর্গে গেছেন?" "নিশ্চয়ই,—" "আমরাও ত যাব?"—"যাব।" "কে আগে যাবে দিদি?"—সুরেশ ঘুড়ি সরাইয়া রাখিয়া চারুর মুখের দিকে উত্তরের জন্য চাহিল। অনেকদিন পরে মার কথা উঠাতে সুরেশের বুকের মধ্যে যেন কেমন একটা করিয়া উঠিল। তখন চারু একটু মৃদু হাসিয়া বলিল, "আমি আগে যাব

ভাইটি,"—"ইস্, আমি আগে,"—"না, আমি আগে,"—সুরেশ দেখিল, এভাবে কথা চলিলে আর তর্কের মীমাংসা হইয়া উঠিবে না, তখন সে বলিল, "আচ্ছা দিদি, এই কথা থাক্, যে আগে স্বর্গে যাবে সে এসে যে বেঁচে থাক্‌বে তাকে দেখা দেবে।" "আচ্ছা, এই কথা থাক্‌ল, কিন্তু তুমি ভয় পাবে না ত?" সুরেশ হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল, বলিল, "তোমাকে দেখে ভয় পাব, দিদি? ভারি মজা ত!" এমনই করিয়া সেই সরল বালক ও সরলা কিশোরীর দিন কাটিতেছিল!

৩

সতীশের প্রকৃতিতে একটা বিশেষত্ব ছিল। সে যখন যে কাজে লাগিত, তখন সে কাজটা তাহাকে একটা নেশার মত পাইয়া বসিত। ডাক্তারি শেখার দিকে একটা ঝোঁক তাহার বাল্যকাল হইতেই ছিল। এফ্‌ এ পাশ করিয়া সে যখন মেডিকেল কালেজে প্রবেশ করিল, তখন ডাক্তারির পুঁথিগুলি, কঙ্কালগুলি তাহার একমাত্র সঙ্গী হইয়া উঠিল। এখন শেষ পরীক্ষার দিন কাছে আসিয়া পড়িয়াছে, বিশ্বসংসারে এমন কিছুই নাই, যাহার আকর্ষণ সতীশকে তাহার পাঠগৃহ হইতে টানিয়া রাখিতে পারে! গভীর রাত্রি পর্য্যন্ত সে তাহার পড়ার ঘরে, নানা আলোচনায় নিযুক্ত থাকিত। চারু যে তাহার জন্য অপেক্ষা করিয়া আছে, একথা একটিবারও তাহার মনে উঠিত না! চারু অনেকক্ষণ বসিয়া থাকিত, ঘুমে তাহার চক্ষু ভরিয়া আসিত, তারপর কখন যে সে ঘুমাইয়া পড়িত, তাহা জানিতেও পারিত না। ছয় মাসের উপর সে কলিকাতায় আসিয়াছে; ইহার মধ্যে স্মরণযোগ্য কিছু যে সে স্বামীর কাছে পাইয়াছে, তাহা মনেই করিতে পারিত না! চারু, ছোট লাজুক মেয়েটী, একটু বেশী অভিমানিনী! কেমন করিয়া স্বামীর ভালবাসা আদায় করিয়া লওয়া যায়, সে কৌশলটি চারু

একেবারেই জানিত না! সে ভাবিত, "স্বামীর কর্ত্তব্য স্বামীর কাছে; আমার কর্ত্তব্য আমার কাছে! স্বামী নিজ হইতে যতটুকু দিবেন, আমি তাহাই লইব, তাহার বেশী পাইবার জন্য কি নিজে যাইয়া লজ্জাহীনার ন্যায় ধরা দিব? ছিঃ!" কিন্তু ভিতরে ভিতরে তাহার তৃষিত নারী-প্রকৃতি, তাহার ন্যায্য প্রাপ্য কড়ায় গণ্ডায় বুঝিয়া পাইবার জন্য উন্মুখ হইয়া উঠিতেছিল! সতীশ যখন চারুর কাছে, তাহার অভাব আকাঙ্ক্ষা বুঝিয়া পরিবেশন করিতে আসিল না, তখন চারু কি অমৃতভাণ্ড লুণ্ঠন করিতে যাইবে? না বলিবে, বলিবে, আমার পিপাসা, আমার ক্ষুধা, ওগো, তুমি মিটাও! চারুর প্রার্থিত কি, সুরেশ সবটা পরিষ্কাররূপে না বুঝিলেও কতকটা বুঝিত! সতীশ যখন গভীর মনোযোগের সহিত তাহার ডাক্তারি শাস্ত্র-চর্চ্চায় নিযুক্ত থাকিত, তখন সুরেশ তাহার ছোট ঘরটি ছাড়িয়া মধ্যে মধ্যে উঠিয়া আসিত এবং দাদার পড়ার ঘরের কাছে গিয়া দাঁড়াইত। খোলা জানালার ফাঁক দিয়া বহুক্ষণ পর্য্যন্ত সে দাদার আনত মুখের দিকে চাহিয়া থাকিত। ঐ প্রকাণ্ড পুঁথিগুলার মধ্যে তাহার দাদা যে কি অমূল্য রত্ন পাইয়াছে, সুরেশ তাহা কোনক্রমেই বুঝিয়া উঠিতে পারিত না। পাশে চারুর শয়নকক্ষ; স্তিমিতালোকে চারু শয্যার উপর বালিশে মুখ গুঁজিয়া পড়িয়া রহিয়াছে। সে কি ঘুমাইয়াছে? না, কখনই না! সুরেশের সমস্ত হৃদয় দাদার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইয়া উঠিত। বারাণ্ডার উপর দিয়া জুতার শব্দ করিতে করিতে নিজের ছোট ঘরটিতে প্রবেশ করিত। সুরেশের পায়ের শব্দ ও তাহার দুয়ার বন্ধ করার শব্দ শুনিয়া মুহূর্ত্তকালের জন্য সতীশের মনোযোগ ভঙ্গ হইত! "কে, সুরু নাকি?" কিন্তু সুরু ত কোন উত্তর দেবার জন্য শব্দ করে নাই। সতীশ উত্তর না পাইয়া আবার পড়িতে বসিত! সুরেশ এখন একটু বড় হইয়াছে, কিন্তু ছেলেবেলার মত দিদির উপর আব্দার খাটানটুকু সে ঠিক বজায় রাখিয়াছে! সুরেশ দিদিকে স্নেহের দাবী পরিপূরণে নিযুক্ত

রাখিতে প্রাণপণে চেষ্টা করিত! সতীশ যে তাহার দিদির প্রতি সুবিচার করে নাই, এজন্য সে যেন চারুর কাছে একটু কুণ্ঠা বোধ করিত! চারুত কোন দিন সতীশের ঔদাসীন্যের সম্বন্ধে কোনও কথাই সুরেশকে বলে নাই। কিন্তু এমন কতকগুলি ব্যাপার আছে, না বলাতেই যাহার তীব্রতাটা বেশী করিয়া ধরা পড়ে! চারু কোনও দিন কিছু বলে নাই, তবুও তাহার হৃদয়ের মধ্যে যে একটি যাতনাপূর্ণ অংশ অন্যের অলক্ষ্যে প্রচ্ছন্নভাবে রহিয়াছে, চারুর নীরবতাই, সেই অংশটাকে বেশী করিয়া ধরাইয়া দিত! স্বর্গগত মা ও বাবার কথা স্মরণ করিয়া মধ্যে মধ্যে চারুর চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিত, সুরেশ সেই অশ্রুর অন্তরালে সতীশের উপেক্ষার অংশটাও সুস্পষ্ট দেখিতে পাইত। চারুর হৃদয়ের সবটুকু বেদনা দূর করা ত সতীশেরই কর্ত্তব্য ছিল। সুরেশ কলিকাতার রাস্তায় বাহির হইয়া যেখানে যে কৌতূহলজনক দৃশ্য দেখিত, বাসায় ফিরিয়া চারুর কাছে তাহা বর্ণনা করা তাহার একটা দৈনিক কাজ হইয়া পড়িল। খুটীনাটী জিনিষ কিনিয়া কিনিয়া সে বাসার ঘরগুলি পূর্ণ করিয়া ফেলিল। প্রত্যহ একটা কিছু নূতন জিনিষ সে বাসায় আনিত! আর সেই জিনিষটির নির্ম্মাণ-কৌশলের প্রশংসা বা অপ্রশংসা লইয়া, এই দুইটী নিতান্ত অসহায় প্রাণীর অনেকটা সময় কাটিয়া যাইত। সুরেশের শ্রদ্ধা ও একান্ত সহানুভূতি, চারুর হৃদয়-ক্ষতের উপর একটা প্রলেপের মত লাগিয়া রহিল। এদিকে সতীশের কালেজের শেষ পরীক্ষার দিন নিকট হইয়া আসিতে লাগিল। সতীশ পাঠের মধ্যে আপনাকে একেবারেই নিমগ্ন করিয়া দিল। জানালার ফাঁক দিয়া চারু দেখিত, সতীশ নিবিষ্টমনে তাহার বইয়ের পাতা উল্‌টাইয়া যাইতেছে; বিশ্বের একদিক যদি ভূমিকম্পে ভাঙ্গিয়া চূর্ণ হইয়াও যাইত, তাহা হইলেও বোধ হয় সতীশের ধ্যানভঙ্গ হইত না! তা' কোথায় চারু কোন্ জানালার ফাঁক দিয়া তাহার দিকে শান্ত দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিয়াছে, কেমন

করিয়া আর তাহা সতীশের চক্ষে পড়িবে? বিশেষ, চারু ত ধরা দিতে যাইত না—সে দেখিতেই যাইত; সতীশ হয়ত দেখিতে পাইবে এমনটা বুঝিলে সে সরিয়া আসিত! এমনই করিয়া এই অতৃপ্তহৃদয়া যুবতী তাহার আপনার স্ফুটনোন্মুখ যৌবনের সমগ্র সাধ ও আশা স্বামীর উদ্দেশ্যে নীরবে নিবেদন করিয়া দিতেছিল! কিন্তু তাহার একাগ্রচিত্ত দেবতার সম্মুখে তাহার নৈবেদ্যটুকু অস্পৃষ্ট অবস্থায়ই পড়িয়া রহিল;—দেবতা তাহা স্পর্শও করিতেন না; বুঝি একবার চাহিয়াও দেখিলেন না!

৪

আজ সতীশের পরীক্ষা শেষ হইল। পাঁচবৎসর বসিয়া সে অনন্যমনে যে বোঝাটা টানিয়াছে, আজ পরীক্ষা-মন্দিরে সেই বোঝাটাকে নামাইয়া দিয়া সতীশ বেশ একটু আরাম বোধ করিতেছিল! তখনও সন্ধ্যা হয় নাই! অস্তগামী সূর্য্যের সিন্দূর-রাগরঞ্জিত রশ্মি কলিকাতার বড় বড় বাড়ীগুলার মাথার উপর তখনও শোভা পাইতেছিল। সতীশ রাস্তার জনতা ভেদ করিয়া বাসায় চলিয়া আসিল। চারুর শয়নকক্ষের পাশ দিয়াই তাহার পড়ার ঘরে যাইতে হয়। চারুর কক্ষের সম্মুখে আসিয়া সে দাঁড়াইল। কি যেন মনে করিয়া ডাকিল, "সুরু!"—আজ পরীক্ষা অবসানের প্রথম মুহূর্ত্তেই, চারুকে অভিনন্দন করিবার জন্য বোধ হয় তাহার হৃদয় চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল! সুরেশ ঘরের মধ্য হইতে উত্তর দিল,—"দাদা, এখানে একবার আস্‌বে? দিদির ভারি জ্বর হয়েছে।"—চারুর জ্বরের কথা শুনিয়া সতীশ আর পড়ার ঘরে গেল না; পত্নীর শয্যার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "কখন্ জ্বর এসেছে?" সুরেশ শিয়রে বসিয়া ধীরে ধীরে দিদির মাথা টিপিয়া দিতেছিল। সে বলিল, "তুমি বেরিয়ে যাবার পরই জ্বর এসেছে, ক্রমেই বাড়্‌ছে।" চারুর সুগৌর মুখ-

খানি জ্বরের উত্তাপে লাল হইয়া উঠিয়াছিল! সুরেশ ডাকিল—"দিদি, দাদা এসেছেন।" চারু চক্ষু মেলিয়া চাহিল, তারপর মাথার কাপড়টা টানিয়া দেওয়ার চেষ্টা করিল। "দিদি এর পূর্ব্বে বল্‌ছিল, সর্ব্বাঙ্গে বড় বেদনা হয়েছে। তুমি ভাল করে দেখ না দাদা,"—সুরেশের কণ্ঠস্বর মমতা ও বেদনাপূর্ণ। চারুর এমন জ্বর সুরেশ আর কোনও দিন দেখে নাই। সে বড়ই ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিল। চারুকে পরীক্ষা করিয়া সতীশের মুখ শুকাইয়া গেল এবং সে তখনই বাসা হইতে বাহির হইয়া গিয়া একজন বড় ডাক্তারকে সঙ্গে লইয়া অবিলম্বে ফিরিয়া আসিল। ডাক্তার চারুকে পরীক্ষা করিয়া সতীশকে বাহিরে ডাকিয়া লইয়া কহিলেন, "আপনি যা' ধরেছেন তাই-ই—ছেলেটি কে? আপনার ভাই বুঝি? ওকে এখান থেকে আর কোথাও পাঠিয়ে দিন, আর এঁর উপর বিশেষ যত্ন নেবেন,—আপনাকে আর বেশী কি বল্‌ব!"—ডাক্তার "প্রেস্‌ক্রুপশন" করিয়া চলিয়া গেলেন। সুরেশকে একটু দূরে ডাকিয়া সতীশ বলিল, "সুরু, তোমার দিদির অসুখটা ভাল বোধ হচ্ছে না। তুমি আজ রাত্রে বিনোদ্‌দার বাসায়ই না হয় গিয়ে থাক।"—এমন সময়ে, চারু ক্ষীণকণ্ঠে ডাকিল, "সুরু, ভাইটি,"—সুরেশ ছুটিয়া আসিয়া দিদির কাছে বসিল, এবং মাথা নীচু করিয়া বলিল, "দিদি, এই ত আমি এখানেই আছি।" চারু তাহার জ্বরতপ্ত হাতখানি বাড়াইয়া দিয়া সুরেশের হাত ধরিল, বলিল, "আমায় একটু জল দাও, ভাইটি"—সুরেশ জল দিয়া দৃঢ়স্বরে সতীশকে বলিল, "আমি দিদির কাছ ছেড়ে কোথাও যাব না। দাদা—তুমি দিদির চিকিৎসার জন্য ভাল বন্দোবস্ত কর।"—ডাক্তারের কথার ভাবেই সুরেশ বুঝিয়াছিল যে, চারুর প্লেগ হইয়াছে। দিদির অসুখ; তাহাকে ফেলিয়া প্রাণ বাঁচাইবার জন্য সে অন্য বাসায় যাইয়া লুকাইয়া থাকিবে, এর অপেক্ষা মর্ম্মভেদী প্রস্তাব আর কি হইতে পারে, সুরেশ তাহা

ভাবিয়াও স্থির করিতে পারিল না! তাহার শরীরের প্রত্যেক অণুটি পর্য্যন্ত বিদ্রোহী হইয়া উঠিল! যে দিদি তাহাকে মাতৃশোক পর্য্যন্ত ভুলাইয়া দিয়াছে,—সহোদরার মমতায় তাহাকে বেড়িয়া রাখিয়াছে, সেই স্নেহময়ী দিদিকে রোগশয্যায় ফেলিয়া সে প্রাণভয়ে পলাইয়া যাইবে? সে আপনা আপনি বিপুল আবেগের সহিত বলিয়া উঠিল, "না না, তা হ'তেই পারে না—কিছুতেই না।"—তারপর দুইদিন পর্য্যন্ত সুরেশ ও সতীশ চারুর সেবা শুশ্রূষা করিল। কালেজের অধ্যাপকেরা ও কলিকাতার প্রায় সকল খ্যাতনামা ডাক্তারই চারুকে দেখিলেন। কিন্তু ভগবান্ যাহাকে কোলে তুলিয়া লইতেছেন, মানুষের চেষ্টা কেমন করিয়া তাহাকে বাঁধিয়া রাখিবে! পরদিন শেষ রাত্রে সুরেশ ও সতীশের সকল চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া দিয়া চারু স্বামীকে ফেলিয়া, স্নেহের ভাইটির স্নেহপাশ ছিন্ন করিয়া, কোন্ অজানা দেশে চলিয়া গেল—একবার ফিরিয়াও চাহিল না!

৫

চারুর অসুখের সংবাদ পাইয়া গ্রাম হইতে নায়েব মহাশয়ও আসিয়াছিলেন। নায়েব মহাশয় চিরদিনই এই পরিবারের শুভাকাঙ্ক্ষী। সতীশ ও সুরেশ এই সরলপ্রাণ বৃদ্ধকে পিতার ন্যায় ভক্তি ও শ্রদ্ধা করিত। চারুর মৃত্যুর পর একমাস কাটিয়া গিয়াছে। বাহিরের একটা ঘরে বসিয়া সতীশ একখানি খবরের কাগজের পাতা উল্টাইতেছিল। নায়েব মহাশয় সেখানে আসিলেন। "সতু!"—সতীশ অন্যমনস্ক ছিল; নায়েব মহাশয়ের স্নেহপূর্ণ কণ্ঠস্বর শুনিয়া সে উঠিয়া দাঁড়াইল। "ব'স বাবা, তোমাকে কয়টা কথা বলিতে আসিয়াছি।" নায়েব মহাশয় চৌকীর উপর বসিলেন, সতীশও চৌকীর একপ্রান্তে বিনীতভাবে বসিল। নায়েব মহাশয় বলিলেন, "এখন কি কর্ত্তব্য স্থির করিয়াছ?"—"আজ্ঞে, কিছুই ত স্থির করি নাই। আপনি কি

আদেশ করেন ?”—“আমি বলি তুমি কলিকাতাতেই ডিস্পেন্‌সারি খোল”—“আমি মনে করিতেছিলাম, উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে একটা সুবিধামত চাকরি পাই কিনা দেখি।”—সতীশের পরীক্ষার ফল তখনও বাহির হয় নাই। এ পর্য্যন্ত প্রতিবৎসরই সে প্রত্যেক পরীক্ষায় প্রথমস্থান অধিকার করিয়া আসিয়াছে,—গোপনে সন্ধান লইয়া কএকটা বিষয়ের ফলও সে ইতিমধ্যে জানিতে পারিয়াছে। সে যে এই শেষ পরীক্ষাতেও প্রথমস্থান অধিকার করিবে, সে বিষয়ে ছাত্র বা অধ্যাপক কাহারও সন্দেহ ছিল না। সতীশের উত্তর শুনিয়া নায়েব মহাশয় একটু গম্ভীরভাবে কহিলেন, “সতীশ, মনের অস্থির অবস্থায় হঠাৎ কোনও একটা কাজ করা ঠিক নহে। বিশেষ আমি জীবিত থাকিতে ললিত চৌধুরীর পুত্রকে চাকরি করিতে দিতে পারিব না,—এ বুড়ো মরিয়া গেলে যা’ হয় করিও। তোমার ডিস্‌পেন্‌সারি খুলিবার সমস্ত বন্দোবস্ত করিয়া দিয়া আমি বাড়ী ফিরিব।” একটু চুপ করিয়া থাকিয়া তিনি পুনরায় বলিলেন, “আমার হাতে এখন অনেক কাজ রহিয়াছে, আমি বেশীদিন আর কলিকাতায় থাকিতে পারিব না।”—কথাগুলি বলিয়া নায়েব মহাশয় একবার তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে সতীশের মুখের দিকে চাহিলেন। সতীশ, কাজটা কি, বুঝিল, কিন্তু ধরা দিল না। বলিল, “কাকা, সুরেশের কি করা যায়? সে যে বড় অস্থির হয়ে পড়্‌ল।” হরকিশোর বাবু বহুকাল নায়েবি করিয়া চুল পাকাইয়াছেন; বুঝিলেন, সতীশ ধরা দিবে না, তাই কথাটা বিষয়ান্তরে লইয়া যাইতেছে! কিন্তু বিষয়কার্য্যে দীর্ঘকাল যাঁহারা লিপ্ত থাকেন, প্রতিকূল অবস্থাটাকে প্রকারান্তরে অনুকূল করিয়া লইবার ক্ষমতা তাঁহাদের মধ্যে বহুল পরিমাণে দেখা যায়। হরকিশোর বাবু উত্তর করিলেন, “ছেলে মানুষ মার কোল ছেড়ে অবধি বৌমারই বাধ্য হ’য়ে পড়েছিল; বড় আঘাত পেয়েছে! তা’ আবার একটি সঙ্গী না পেলে ঠিক স্থির হ’তে পার্‌বে না।”

সতীশ চুপ করিয়া রহিল; একটু অন্যমনস্ক ভাবে খবরের কাগজের একটু অংশ ছিন্ন করিয়া লইয়া সে তাহাই ভাঁজ করিতে লাগিল! সূর্য্যকরতপ্ত কুন্দকুসুমের ন্যায় চারুর জ্বরতাপ-ক্লিষ্ট সুন্দর মুখখানি আজি তাহার ক্রমাগতই মনে পড়িতেছিল! যে তরুণ লতিকা সতীশকে বেড়িয়া উঠিতে চাহিয়াছিল, সে তাহাকে আশ্রয় দেয় নাই! কেন দেয় নাই? সে প্রশ্ন সে নিজের কাছেও ত করিতে পারিতেছে না! চারুকে ত সে উপেক্ষা করে নাই! একটা তুচ্ছ পরীক্ষার অনুরোধে সে যে দীর্ঘকাল বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ভুলিয়া দেবরাজ ইন্দ্রের মত তপশ্চর্য্যায় নিযুক্ত ছিল, একথা ত চারু বুঝে নাই! সেই অভিমানিনী বালিকা, কতবার তাহার পাঠগৃহের কাছ দিয়া ধীরে ধীরে চলিয়া গিয়াছে, কতবার সে জানালার ফাঁক দিয়া তাহার শান্ত স্নিগ্ধ দৃষ্টি উৎসারিত করিয়া চাহিয়া দেখিয়াছে; কিন্তু সতীশ ত তাহাকে একটিবারও ডাকিয়া বলে নাই, "চারু, আমি তোমারই!" কিন্তু তবু সতীশ চারুকে উপেক্ষা করে নাই! কোথায় চারু, হায় কেমন করিয়া সতীশ তাহাকে সব চেয়ে খাঁটি এই সত্য কথাটি বুঝাইয়া দিবে! ভুল করিয়া মানুষ যখন ক্ষমা চাহিবার জন্য প্রস্তুত হয়, তখন যাহার উপর অন্যায় করা হইয়াছে, তাহাকে আর খুঁজিয়া পাওয়া যায় না! এইটিই মানুষের সর্ব্বাপেক্ষা বড় দুঃখ! হায়, চারু! সতীশের চক্ষু জলে ভরিয়া আসিতেছিল! হরকিশোর বাবু তাহার মনের অবস্থা বুঝিয়া ধীরে ধীরে উঠিয়া গেলেন।

৬

সুরেশের কিশোর হৃদয়ে এই শোক অতি তীব্রভাবে আঘাত করিয়াছিল। সুরেশ ভাবিল, তাহার দিদি—সেই আনন্দময়ী স্নেহশালিনী দিদি, কোথায় গেল! তাহার ক্রীড়াকৌতুকের সঙ্গিনী, স্নেহনির্ঝরিণী দিদি, তাহাকে ভুলিয়া কোথায় যাইতে

পারে? সে যে আর দিদিকে দেখিতে পাইবে না, আব্দারের দাবী পরিপূরণের জন্য আর তাহাকে ব্যস্ত করিয়া তুলিবে না, সুরেশ একথা ভাবিতেও পারিত না! সকালে, সন্ধ্যায় তাহার ছোট ঘরটির জানালার কাছে বসিয়া সুরেশ ভাবিত;—ঐ নক্ষত্রখচিত সান্ধ্য নীলাকাশ,—ঐ আকাশের দিকে চাহিয়া দিদির কথাই তাহার সর্ব্বাগ্রে মনে পড়িত! দিদি একদিন বলিয়াছিল, মানুষ মরিলে পর নক্ষত্র হয়, আর অমনই করিয়া পৃথিবীর প্রিয়জনের দিকে অনিমেষে চাহিয়া থাকে!—দিদি কি নক্ষত্র হইয়াছে? এতগুলি নক্ষত্রের মধ্য হইতে সে তাহার দিদিকে কেমন করিয়া বাছিয়া বাহির করিবে? তাহার বুকের মধ্যে ওলট-পালট করিয়া শুধু একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস-জড়িত করুণ আহ্বান বাহির হইয়া আসিত,—"দিদি,—দিদি!"—পাশের একটা বাড়ীর ছাদের উপর একটি ছোট বধূ প্রত্যহ কাপড় তুলিতে আসিত। সুরেশ চাহিয়া চাহিয়া দেখিত, সে তাহার দিদিরই মত ছোট, তেমনই সুন্দর! ছাদের উপর হইতে ডাকিয়া চারু কয়দিন তাহার সহিত আলাপ করিয়াছিল। চারুর মৃত্যুর পরও বধূটি তেমনই প্রত্যহ ছাদে আসিত—সুরেশদের বাড়ীর দিকে চাহিয়া দেখিত। সে দেখিতে পাইত অশ্রুপ্লাবিত শূন্যদৃষ্টিতে সুরেশ জানালার কাছে বসিয়া রহিয়াছে,—তাহার সঙ্গিনী 'দিদি' তাহাকে ছাড়িয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছে। একটা রুদ্ধ বেদনায় বধূটির হৃদয় ভরিয়া উঠিত! হৃদয়ে সে আঘাত পাওয়া যায়, তীব্র হইলে সে আঘাত শরীর সহ্য করিতে পারে না! চারুর মৃত্যুর পর সুরেশ প্রথমতঃ শুকাইতে লাগিল, তারপর তাহার একটু একটু জ্বর দেখা দিল। সুরেশ সকালে সন্ধ্যায় আর তেমন করিয়া জানালার কাছে বেশীক্ষণ বসিয়া থাকিতে পারিত না! তাহার ছোট বিছানাখানির উপর সে যেদিন সন্ধ্যাবেলাও শুইয়া রহিল, সেদিন তাহার জ্বর অনেকটা বেশী হইয়াছে দেখা গেল! সতীশ

আসিয়া দেখিল, জ্বরতপ্ত হাত দু'খানি মুঠা করিয়া বুকের উপর রাখিয়া সুরেশ চক্ষু মুদিয়া শুইয়া রহিয়াছে! সতীশ স্নেহকোমলস্বরে ডাকিল,—"সুরু!"—সুরেশ চাহিল,—তাহার দৃষ্টি অবলম্বন-বিহীনের ন্যায় উদাস, চকিত! "জ্বর বেশী হ'য়েছে সুরু?"—সতীশ সুরেশের ললাটে ও কপোলে ধীরে ধীরে হাত বুলাইয়া দিতে লাগিল! সুরেশ চক্ষু বুজিল, উত্তর দিল না! চারুর মৃত্যুর পর হইতে এ পর্য্যন্ত সুরেশ কোনও দিন সতীশের কাছে চারুর কথা উল্লেখ করে নাই! চারুকে সতীশ যে তেমন করিয়া কাছে ডাকে নাই, সেজন্য চারুর মর্ম্মবীণায় যে একটা বেদনা ও অভিমানের সুর বাজিয়া উঠিয়াছিল, চারু খুলিয়া না বলিলেও, সুরেশ তাহা তীব্রভাবে অনুভব করিয়াছিল! যাহারা অল্পবয়সে মাতৃহীন হয়, অভিমানের ভাবটা তাহারা বড় সহজেই ধরিতে পারে! চারু চলিয়া গেল; তখন সুরেশ আর কিছুতেই ভুলিতে পারিল না, যে সতীশ তাহার উপর অন্যায় করিয়াছে। সে সতীশকে ক্ষমা করিতে পারিল না, মুখ ফুটিয়াও কিছু বলিল না। রুদ্ধ অভিমানের আগুনে শুধু নিজেই দগ্ধ হইতে লাগিল! সুরেশের তরুণ হৃদয়ে কি আঘাত লাগিয়াছে, সতীশ তাহা বুঝিল। কিন্তু কেমন করিয়া সে তাহার হৃদয়-বেদনা দূর করিতে পারিবে, তাহার কোনও উপায় সে খুঁজিয়া পাইল না। সুরেশের রোগশয্যার কাছে বসিয়া সতীশ তাহার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিত। সরল শিশুর মত মুখখানি,—অন্তরবেদনার ছায়াপাতে ম্লান হইয়া উঠিয়াছে! এ মাটীর পৃথিবীর সঙ্গে যেন তার আর কোনও বন্ধন নাই—সম্পর্ক নাই! সংসারে আসিয়া, যে স্নেহ ছাড়া কিছু পায় নাই, অনভিজ্ঞ সতীশ কেমন করিয়া তাহাকে সঞ্জীবিত করিয়া রাখিবে, কিছুতেই সে তাহা স্থির করিতে পারিল না!

৭

পরদিন প্রাতঃকালে বাড়ী হইতে একটা টেলিগ্রাম আসিয়া সতীশের জীবনের হাল্‌কা ভাবটাকে একটু চাপিয়া দিল, এবং যে জীবন একটা সোজা পথ ধরিয়া চলিতেছিল, তাহাকে একটা নূতন বাঁকের মুখে উঠাইয়া দিয়া গেল। নায়েব মহাশয় কোনও একটা সম্পত্তির ব্যবস্থার জন্য সতীশের সঙ্গে পরামর্শ করা আবশ্যক বলিয়া টেলিগ্রাম করিয়াছেন। সুরেশকে সঙ্গে লইয়া সতীশ বাড়ী গেল। কুশল জিজ্ঞাসা ও অন্য দু'এক কথার পর নায়েব মহাশয় বলিলেন, "সুরুর অসুখটা ক্রমেই বাড়িতে লাগিল, কি কর্ত্তব্য স্থির করিলে?"—আমি ওকে নিয়ে একটু পশ্চিমে যাব মনে ক'রেছি, আপনি কি বলেন, কাকা?"—"তা' পশ্চিমে কোনও ভাল জায়গায় গিয়ে কিছুদিন থেকে আসা ভালই মনে করি;—কিন্তু" নায়েব মহাশয় সতীশের মুখের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিলেন, তারপর ধীরে ধীরে বলিলেন, "কিন্তু ওর অসুখ হ'ল মনে, মনটা সুস্থির করা দরকার।"—"তার কি করা যায় কাকা?"—সতীশের স্বর গাঢ়, বেদনাপূর্ণ! "ওর একটি সমবয়স্ক সঙ্গী জুটিয়ে দিতে পার্‌লে বোধ হয় কাজ হ'ত,"—এতক্ষণে সতীশ কথাটা পরিষ্কার করিয়া বুঝিল! তা'র বুকের মধ্যে কেমন করিয়া উঠিল! একবার ইচ্ছা হইল বুকটা দুই হাতে চাপিয়া, সেই মেঝের উপর লুটিয়া পড়িয়া একবার একটু কাঁদিয়া লয়! কিন্তু কাকা যে সেখানে! নায়েব মহাশয় অন্যান্য কথার পর বলিলেন, "দেখ সতু সুরেশের জীবন তোমার উপর নির্ভর কর্‌ছে, তুমি বুড়ার কথাটা ফেল' না, বাবা"—নায়েব মহাশয় চলিয়া গেলেন। সতীশ বসিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিল। সুরেশের সুস্থতার জন্য সে কি না করিতে পারে! সতীশের হৃদয়ে সুরেশের জন্য যে একটা নির্দ্দিষ্ট স্নেহতন্ত্রী ছিল, নায়েব মহাশয়

সেই স্নেহতন্ত্রীটির উপর মৃদু আঘাত করিয়া যে সুর তুলিয়া দিয়া গেলেন, তাহার রেশ্ সতীশের কাণের কাছে ক্রমাগতই বাজিতে লাগিল! চারু যখন জীবিত ছিল, তখন সতীশ কোনও দিন বুঝিতে পারে নাই যে, সে চারুর প্রতি অন্যায় করিতেছে। কিন্তু চারু যখন চলিয়া গেল, তখন সে বুঝিল, কোথায় তাহার অপরাধ! সুরেশের নীরবতা ও পীড়া তাহাকে আরও অস্থির করিয়া তুলিতেছিল! যেমন করিয়াই হউক সুরেশকে প্রফুল্ল করিতেই হইবে,—বাঁচাইয়া তুলিতেই হইবে! সুরেশের সঙ্গে চারুর স্মৃতি এতটাই জড়িত যে, তাহাকে ধরিয়া রাখিতে পারিলে, চারুরই কতকটা যেন রাখা যাইবে, এমনই একটা বিশ্বাস নিশিদিন সতীশের হৃদয়ে জাগিতেছিল। সুতরাং নায়েব মহাশয় তাহার উপর যে শাস্তির বিধান করিতেছেন, সুরেশেরই জন্য তাহাকে সে নিষ্ঠুর দণ্ড গ্রহণ করিতেই হইবে।

৮

ওয়াল্‌টেয়ারের একটা ছোট বাসায় প্রায় এক মাস হইল পীড়িত সুরেশ ও নববধূ সরযূকে লইয়া সতীশ বায়ু-পরিবর্ত্তনের জন্য আসিয়াছে। সরযূর একটু বেশী বয়সেই বিবাহ হইয়াছিল। সতীশ একটু আধটু ইতস্ততের পর সরযূর নিকট চারু ও সুরেশের সমস্ত ইতিহাস ভাঙ্গিয়া বলিল। সরযূ সব শুনিল; এমন বেদনাপূর্ণ কাহিনী সে আর শুনে নাই! সুরেশের জন্য তাহার সমস্ত হৃদয় সহানুভূতিতেই পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল! প্রথমেই তাহার এই কথা মনে হইল যে, সে যেমন করিয়াই পারে সুরেশের শোক ও অভিমান দূর করিয়া দিবে! পীড়িত সুরেশের সেবা ও শুশ্রূষার ভার সরযূ এমন সহজভাবে গ্রহণ করিল, যেন সে সুরেশের বহুদিনের পরিচিত। প্রত্যেক কার্য্যের মধ্যে তাহার সেবা-নিপুণতা ফুটিয়া উঠিতে লাগিল। সতীশ

দেখিয়া শুনিয়া একটু আরাম পাইল; তাহার মনে হইল সরযূর সঙ্গ এবং যত্ন যদি সুরেশকে বাঁচাইয়া তুলিতে পারে! কলিকাতার বাসায়, যখন চারু জীবিত ছিল, তখন সতীশ ডাক্তারি আলোচনার দিকেই একান্তভাবে ঝুঁকিয়া পড়িয়া বাহিরের বিচিত্র বিশ্বকে একেবারেই ভুলিয়া গিয়াছিল। দ্বিতীয়বার বিবাহের পর প্রথম ওয়াল্‌টেয়ারের বাসায় আসিয়া সতীশ সরযূকে তেমন ভাবে গ্রহণ করে নাই! সেদিন সন্ধ্যার পর যখন সতীশ ছাদে একটা পাটীর উপর পড়িয়া আকাশ পাতাল ভাবিতে ছিল, তখন নীচের ঘরে, সারা দিনের কর্ম্ম-বসানের পর, সরযূ একলাটী একটু শান্তি পাইতেছিল না। রুগ্ন সুরেশ তাহার সঙ্গে এ পর্য্যন্ত কথা কহে নাই! সরযূ আস্তে আস্তে ছাদে উঠিয়া গেল; সতীশকে দেখিল। সেই সন্ধ্যার বিরলান্ধকারের মধ্যে সতীশ একটী পাটীর উপর পড়িয়া রহিয়াছে! সরযূর বুকের মধ্যে কেমন করিয়া উঠিল! সে কি এই বিষাদ-কালিমা দূর করিয়া দিতে পারিবে না! সংসারের মধ্যে যাহাকে পরিচিত করিয়া দিবার কেহ না থাকে, তাহাকে বাধ্য হইয়া নিজের স্থান খুঁজিয়া লইতে হয়! বিবাহের পর দিন সরযূকে আশীর্ব্বাদ করিবার সময় বৃদ্ধ নায়েব মহাশয় যে কয়টি কথা বলিয়াছিলেন, তাহা হইতেই সে বুঝিয়া লইয়াছিল, এ সংসারে তাহাকে নিজেই নিজের স্থান করিয়া লইতে হইবে। কয়দিন পর্য্যন্ত ভাবিয়া ভাবিয়া সে স্থির করিয়াছিল, আজ যেমন করিয়াই হউক, সে স্বামীর দুঃখের অংশ গ্রহণ করিবে। এই সংকল্প বুকে লইয়া, সে অকম্পিত পদে ছাদে উঠিয়াছিল; কিন্তু যখন স্বামীর মূর্ত্তিখানি অন্ধকার ভেদ করিয়া অস্পষ্টভাবে তাহার চক্ষের সম্মুখে পড়িল, তখন নববধূসুলভ লজ্জা তাহাকে একেবারে চাপিয়া ধরিল! সে কি ফিরিয়া আসিবে, না অগ্রসর হইবে বুঝিতে পারিতেছিল না! তাহার কাপড়ের একটু খস্ খস্ শব্দ

কিংবা তাহার গুরুনিঃশ্বাস-পতন শব্দ বুঝি সতীশের কাণে গিয়াছিল। সতীশ চকিতভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "কে"?—সতীশ চারুকেই ভাবিতেছিল। চারু আসিয়াছে কি? সমস্ত দ্বিধা সবলে দূর করিয়া সরযূ অগ্রসর হইল। একেবারে স্বামীর কাছেই গিয়া দাঁড়াইল। "কে সরযূ!—ব'স!—" যে কথা বলিবার জন্য সতীশের বুকের মধ্যে এ কয়দিন ওলট্‌পালট্ করিতেছিল,—আজ তাহাই প্রকাশ করিয়া বলিবার একটা সুযোগ এমন করিয়া অযাচিত ভাবে সতীশের কাছে আসিয়া পড়িয়াছে! সরযূ স্বামীর পায়ের দিকে একটু ঘেঁসিয়া বসিয়া পড়িল! উপরে মুক্ত নীলাকাশ! রাত্রির অন্ধকার পৃথিবীর উপর নিবিড়তর হইয়া নামিয়া আসিতেছে, আর এমনই সময়ে সরযূ, একটি অসহায় শিশুর মত তাহার দুইটি কোমল বাহুবল্লরী দিয়া তাহাকেই বেষ্টন করিয়া আশ্রয় পাইবার জন্য অযাচিতভাবে কাছে আসিয়াছে! সতীশের হৃদয় পূর্ব্ব হইতেই আবেগে পরিপূর্ণ ছিল. সরযূ এমন সময়ে এমন করিয়া কাছে আসিয়া তাহার হৃদয়টাকে একেবারে উদ্বেলিত করিয়া দিল। হঠাৎ উঠিয়া বসিয়া সতীশ সরযূকে বুকের মধ্যে টানিয়া লইয়া সঙ্গে সঙ্গে বলিয়া উঠিল,—"সরযূ, আমি তোমার মধ্যেই চারুকে পাইতে চাই"—এই একটি কথাতেই স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে সমস্ত দ্বিধা কাটিয়া গেল! চারুকে ভুলিয়া যদি সতীশ সরযূকে পাইতে চাহিত, তাহা হইলে সরযূ বুঝি কোন মতেই স্বামীর কাছে এমন করিয়া ধরা দিতে পারিত না! আজ অকুণ্ঠিত তৃপ্তির গৌরব সরযূকে তাহার নারীজীবনের সর্ব্বপ্রধান সার্থকতা প্রদান করিয়া অভিনন্দন করিল! তারপর হইতেই সরযূ ও সতীশ সুরেশের সেবার মধ্যে আপনাদিগকে একান্তভাবে নিযুক্ত করিয়া দিল! বাসায় কোন কাজ নাই—শুধু সুরেশের সেবা করা! সে সেবার ভারটুকুও সরযূই সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করিয়াছে! সুতরাং সতীশের হাতে একপ্রকার কোন কাজই

ছিল না! ভাবপ্রবণ হৃদয়ের লক্ষণই এই যে, সে তাহার ভাবরাশির কেন্দ্রস্বরূপে অবলম্বনের জন্য একটা না একটা কিছু চাহে! সতীশ চারুকে বিমুখ করিয়া যে ক্ষোভ পাইয়াছিল, আজি সরযূকে বেষ্টন করিয়া তাহা মিটাইতে চাহিল! স্বর্গগতা চারুর বিরুদ্ধে সরযূ কোনও প্রকার বিদ্বেষভাব হৃদয়ে পোষণ ত করিতই না, বরং চারুর প্রতি তাহার একটা আন্তরিক শ্রদ্ধা দিন দিনই গভীরভাবে ফুটিয়া উঠিতেছিল! সরযূর উপর সতীশের প্রেম বাধামুক্ত পার্ব্বত্য-স্রোতের মত আসিয়া তাহাকে ভাসাইয়া লইয়া যাইবার উপক্রম করিল! সরযূ বুঝিত, স্বামীর হৃদয়ের এই আবেগ চারুরই প্রাপ্য এবং স্বামী যে এই স্নেহধারা তাহার উপর এমন করিয়া ঢালিয়া দিতেছেন, সে শুধু তাহার মধ্যে চারুকে খুঁজিয়া পাইবার জন্য। তাহার হৃদয়ের মধ্যে কোন্ স্থানটা বেদনাপ্লুত হইয়া রহিয়াছে, সতীশ তাহা কিছুমাত্র গোপন না করিয়া সরযূকে দেখাইয়াছিল! সাধ্বী সরযূ স্বামীর হৃদয়ের সেই বেদনাপ্লুত অংশটি দেখিয়া শিহরিয়া উঠিল; এবং আপনার সমস্ত শক্তি নিয়োগ করিয়া, যাহাতে স্বামীর এই কুণ্ঠা, এই অতৃপ্তি, এই বেদনার সবটুকু মুছিয়া ফেলিতে পারে, তাহাই জীবনের ব্রতরূপে গ্রহণ করিল!

৯

রোগশয্যায় পড়িয়া সুরেশ দেখিত, যে অধিকার তাহার দিদি লাভ করিতে পারে নাই, সরযূ কেমন সহজে তাহা আয়ত্ত করিয়া লইয়াছে! সতীশের অখণ্ড মনোযোগ, পূর্ব্বে ডাক্তারিশাস্ত্র আলোচনার মধ্যেই আবদ্ধ ছিল, আজি তাহা ভিন্নপাত্রে অর্পিত হইয়াছে! দাদা 'নূতন বৌ'কে ভালবাসুক, তাহাতে সুরেশের কোনও আপত্তি ছিল না; কিন্তু তাহার 'দিদি' কি অপরাধ করিয়াছিল? তাহার স্নেহশালিনী দিদি!—সে ত কোন

অপরাধই করে নাই! দিদির কথা মনে করিয়া সুরেশ ক্রমেই শয্যার সঙ্গে মিশিয়া যাইতে লাগিল! সমস্ত বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড তাহার দিদিকে ভুলিয়া যাইতে পারে, কিন্তু সে কিছুতেই ত ভুলিবে না! কেহ ভুলাইয়া দিতে চাহিলেও তাহার বিরুদ্ধে সুরেশের হৃদয় বিদ্রোহী হইয়া উঠিত! হায়, সে যদি দিদিকে ভুলিয়া যায় তাহা হইলে মনে করিবার মত পৃথিবীতে আর কেহই ত তাহার থাকিবে না! সরযূ যতই সুরেশকে স্নেহ দ্বারা সেবা দ্বারা বেষ্টন করিয়া ধরিতেছিল, সুরেশের ততই মনে হইতেছিল, এ শুধু 'দিদিকে' ভুলাইয়া দিবার জন্য সরযূর একটা চতুর আয়োজন! সুতরাং সে কিছুতে ধরা দিবে না বলিয়া নিশিদিনই আপনার সমস্ত হৃদয়কে সচেতন ও বিদ্রোহী করিয়া রাখিল! প্রায় চারিমাস পর্য্যন্ত ওয়াল্‌টেয়ারে থাকিয়াও সুরেশের পীড়ার কোনই উপশম দেখা গেল না! সতীশ তাহার ডাক্তারির অভিজ্ঞতায় বুঝিল, এমন ভাবে আর কিছুদিন চলিলে, সুরেশকে বাঁচাইয়া তোলা কষ্টকর হইবে!

১০

সেদিন ২৩শে ভাদ্র—চারুর মৃত্যু তারিখ! সুরেশ সমস্ত দিন গত বৎসরের এই দিনটির কথা ভাবিতেছিল! আজ এক বৎসরের মধ্যে এক মুহূর্ত্তের জন্যও সুরেশ এই দিনের কথা ভুলিতে পারে নাই, তবু আজ তাহার ক্ষুদ্র হৃদয়খানি যেন বেশী করিয়া উদ্বেলিত হইয়া উঠিল! গত বৎসর ঠিক এমন দিনটিতে, এমন সময় পর্য্যন্তও তাহার দিদি জীবিত ছিল। সে দিনটি পৃথিবীতে তাহার দিদির জীবনের শেষ দিন, সে দিনটিকে ত সে কোন মতেই ভুলিতে পারে না! সমস্ত দিন ধরিয়া সে তাহার মস্তিষ্কের সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করিয়া শুধু তাহার দিদির কথাই চিন্তা করিতে লাগিল। সন্ধ্যার পর তাহার এমন বেগে জ্বর আসিল যে, ব্যজনরতা সরযূ ভীতা হইয়া উঠিল এবং বাহিরের ঘর হইতে সতীশকে ডাকিয়া আনিল।

সতীশ সুরেশকে দেখিল। দেখিয়া প্রমাদ গণিল! সংবাদ পাইয়া অমূল্য ডাক্তার দেখিতে আসিলেন, কিন্তু তিনি বড় একটা আশার কথা বলিলেন না। জ্বর ত্যাগের সময় সাবধান থাকিতে বলিয়া তিনি চলিয়া যাইতেছিলেন, অমনই সরযূ সতীশকে ইঙ্গিত করিয়া ডাক্তারকে রাত্রির জন্য রাখিতে বলিল। অনুরুদ্ধ হইয়া ডাক্তার বলিলেন, "আমি ফিরে আস্‌ব এখনই,—একবার কেশব বাবুর ছেলেটিকে দেখ্‌তে হবে!" সরযূ পার্শ্বে বসিয়া এক দৃষ্টিতে সুরেশের মুখের দিকে চাহিয়া আছে,—সরযূর মনে হইতেছিল, যেন সমস্ত অপরাধ তাহারই,—এই মৃত্যুশয্যাশায়ী কিশোর দেবরটির রোগক্লিষ্ট পাণ্ডুর মুখশ্রী তাহার হৃদয়ে একটা মর্ম্মদাহী বেদনার সৃষ্টি করিয়া তুলিতেছিল। সে যদি তাহার দিদির স্থান পরিপূরণ করিতে নাই পারিবে, তাহা হইলে সে কেন সমস্ত অপরাধের বোঝাটা মাথায় তুলিয়া লইতে এই সংসারের মধ্যে আসিল! হায়, সে যদি নিজের প্রাণ দিয়াও সুরেশকে বাঁচাইয়া তুলিতে পারিত! সুরেশ শয্যায় পড়িয়া ছটফট্ করিতেছিল। সতীশ রাত্রি দশটার সময় একবার উত্তাপ লইয়া সভয়ে দেখিল, প্রায় এক ডিগ্রী জ্বর কমিয়া গিয়াছে,—সে চকিতকণ্ঠে বলিয়া উঠিল,—"অ্যাঁ, জ্বরটা পড়ে আস্‌ছে যে!—" "জ্বর প'ড়ে আসা কি ভাল নয়?"—কম্পিত-কণ্ঠে সরযূ জিজ্ঞাসা করিল! "না, সরযূ, ভাল ত নয়ই, বড্ড খারাপ—" সতীশের কথা শুনিয়া সরযূর সমস্ত শরীর স্রোতকম্পিত বেতসলতার ন্যায় কাঁপিতে লাগিল! "কি হবে তা' হ'লে! ঠাকুর পো' সেরে উঠুক, আমি মার বাড়ী পূজো দেব।" সরযূর কণ্ঠ রুদ্ধপ্রায় হইয়া আসিল। "এখন এই ওষুধটা খাওয়াও ত সরযূ।" সরযূ সুরেশকে ঔষধ খাওয়াইল। জ্বর বড় তাড়াতাড়ি করিতেছিল! সুরেশ অবসন্ন ভাবে শয্যার উপর পড়িয়া আছে; সরযূর মুখে তাহার আন্তরিক আশঙ্কা ও বিষাদের ছায়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। সতীশ শিয়রে একখানি চেয়ারের

উপর বসিয়া সুরেশের ম্লান মুখের দিকে চাহিয়া রহিয়াছে। অমূল্য ডাক্তার দূরে একটা টেবিলের কাছে দাঁড়াইয়া কি একটা ঔষধ মিশাইতেছিলেন। সরযূ দেখিল, সুরেশের ম্লান মুখখানি মধ্যে মধ্যে উজ্জ্বল হইয়া উঠিতেছে, প্রদীপ নিবিবার পূর্ব্বে ত এমনই উজ্জ্বল হইয়া উঠে! সত্যই কি সুরেশ বাঁচিবে না?—না, তা কি হয়! সুরেশের কপালটা ঘামিতেছিল, সরযূ অঞ্চল দিয়া মুছাইয়া দিল! সতীশ ঘড়ির দিকে চাহিয়া দেখিল, ১টা ৫ মিঃ—গত বৎসরের এই দিনের আর একখানি করুণ চিত্র সতীশের স্মৃতিপথে জাগিয়া উঠিল;—সেও এমনই সময়ে—না, আর কয়েক মিনিট পরে, ১টা ১৫ মিনিটের সময়, চারু চলিয়া গিয়াছিল! আর আজ এখন ১টা ৫ মিঃ—পনর মিনিটের সময় কি হইবে কে জানে?—'চারু—কি ও?'—সুরেশের চিন্তাসূত্র ছিন্ন হইল—"দিদি—দিদি—তুমি কি দিদি?"—সুরেশ চীৎকার করিয়া শয্যার উপর উঠিয়া সরযূর মুখের দিকে চাহিল,—তাহার চক্ষে এক অস্বাভাবিক উৎসাহ ও আনন্দের জ্যোতিঃ ফুটিয়া উঠিয়াছে,—তারপর সুরেশ প্রাণপণে সরযূকে তাহার শীর্ণ তুষারশীতল বাহুযুগল দ্বারা জড়াইয়া ধরিয়া তাহার কোলের উপর অবসন্ন ভাবে এলাইয়া পড়িল। অমূল্য ডাক্তার দৌড়াইয়া আসিয়া বলিলেন, "দেখুন ত ফিট হ'ল নাকি? জলের ঝাপ্‌টা দিন চোখে মুখে,—নাঃ, আপনারা এমন হ'লে চল্‌বে কেন!" তখন সতীশ ও অমূল্য ডাক্তার সুরেশের স্পন্দনবিহীন দেহ সরযূর অঙ্ক হইতে ধীরে ধীরে তুলিয়া লইয়া নীচের শয্যার উপর শায়িত করিয়া দিল! দেওয়ালের গায়ের ঘড়িটায় কোয়াটার বাজিল—১টা ১৫মিঃ।

ত্রিবেণী

১

শরৎ পত্নীর মুখের দিকে চাহিয়া মৃদুস্বরে ডাকিল, "নির্ম্মলা !"—নির্ম্মলা কথা কহিল না ; হাতে একটা সেলাইয়ের কাজ ছিল, অন্যমনস্কভাবে তাহাই বারংবার উল্‌টাইতে লাগিল। শরৎ একটু কাছে সরিয়া আসিয়া, নির্ম্মলার কণ্ঠ বাহুদ্বয় দ্বারা বেষ্টন করিয়া ধরিয়া, আবার মৃদুতরস্বরে ডাকিল "নির্ম্মল !"—তখন নির্ম্মলা তাহার প্রশান্ত নয়নদ্বয় স্বামীর মুখের উপর স্থাপন করিয়া ধীরে ধীরে কহিল,—"আমার কথার উত্তর দাও নাই ত !"—"উত্তর দেওয়ার অবসর কই, নির্ম্মল ?"—"ছিঃ, এমন কেন তুমি !"—"কি আমি, নির্ম্মল ?"—"আমি একাই তো তোমার কাছে সবটুকু চাহি নাই,—আমাকে কেন সবটুকু দিবে ?"—"সেই এক কথা,—আবার !"—শরতের কণ্ঠস্বর উত্ত্যক্ত অপরাধীর মত ! "তুমি রাগ করিও না, একটু ভাবিয়া দেখ !"—নির্ম্মলা কথা কয়টি বলিয়া স্বামীর স্কন্ধে মুখ রক্ষা করিল। শরৎ কি একটু ভাবিল, তারপর কহিল, "দেখ নির্ম্মলা একটু তৃপ্তির জন্য যখনি তোমার কাছে আসি, তখনি যদি তুমি এমনি করিয়া আমাকে আঘাত কর, আমি না হয় আর আসিব না।"—নির্ম্মলা স্বামীর কথা শুনিয়া শিহরিয়া উঠিয়া কহিল, "ক্ষমা কর, ক্ষমা কর ! আমি তোমাকে আঘাত করিবার জন্য কিছু বলি নাই ; তুমি আমাকে যাহা দিয়াছ, তাহার একটুকু অংশ দিদিকে দাও, তাহা হইলেই আমার প্রার্থনীয় আর কিছুই থাকিবে না !" নির্ম্মলার কণ্ঠ হইতে বাহু শ্লথ করিয়া লইয়া, শরৎ একটু রুক্ষভাবে কহিল,—

—"তুমি আমাকে কর্ত্তব্য শিখাইতেছ, নির্ম্মলা!"—নির্ম্মলা দেখিল, শরৎ ক্রমেই রুষ্ট হইয়া উঠিতেছে, তখন সে বড় ব্যস্ত হইয়া উঠিল; কহিল, "তোমার পায়ের ধূলা আমি; ভালবাস, তাই প্রশ্রয় পাইয়াছি। ক্ষমা কর!"—নির্ম্মলা কাতরভাবে শরতের পদ-স্পর্শ করিল। শরৎ বুঝিতেছিল, সেই অন্যায় করিতেছে! কিন্তু যে কাপুরুষ হয়, সে যাহার প্রতি অন্যায় করে, তাহাকেই আঘাত করিয়া, নিজের অন্তরকে বুঝাইতে চাহে যে, সে ঠিকই করিতেছে। শরৎও নির্ম্মলার অন্তরে আঘাত দিয়া, নিজের কুণ্ঠা ও দৈন্যকে ঢাকিতে চাহিল। উত্তর না পাইয়া নির্ম্মলা আবেগরুদ্ধ কণ্ঠে কহিল—"বল, ক্ষমা করিলে?"—শরৎ উঠিয়া দাঁড়াইয়া, তাহার দুই বাহু বক্ষ-সম্বদ্ধ করিয়া, কহিল, "নির্ম্মলা, শোন, আজ বলিব! আমি এমন হৃদয়হীন নহি যে, তোমার নিঃস্বার্থ ভাবটিকে উপলব্ধি করিতে পারি না; সব পারি, সব বুঝি, কিন্তু উপায় নাই। যৌবনের আরম্ভের দিনে যাহা করিয়া ফেলিয়াছি, আজ আর তাহাকে ফিরাইবার উপায় নাই। যে প্রেম নিজ হইতে হৃদয় গলিয়া বাহির হইয়া না আইসে, তাহা কৃত্রিম। প্রেমাভিনয় করিবার প্রবৃত্তি বা শক্তি আমার নাই। তাহাতে সেও সুখী হইবে না,—আমিও সুখী হইব না।"—শরৎ এই পর্য্যন্ত বলিয়া আবার নির্ম্মলার মুখের দিকে চাহিল। দেখিল, সে মুখে একটি বিষাদছায়া ফুটিয়া উঠিয়াছে; কপোলদ্বয় প্লাবিত করিয়া, অশ্রু নামিয়া আসিয়াছে। নির্ম্মলা মৃদুকাতরকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "সে তাহার ব্যর্থ নারী-জীবন লইয়া কি করিবে, যদি তুমি তাহাকে ভাল না বাস,—তাহাকে হৃদয়ে স্থান না দাও?"—নির্ম্মলার আবেগকণ্ঠের এই মৃদু আক্ষেপোক্তিটি শ্রবণ করিয়া শরৎ বিস্মিত স্তব্ধ হইল। শরৎ ভাবিল, এই নারী কি, দেবী না মানবী, যে এমন করিয়া আপনার সর্ব্বস্ব অংশ করিয়া লইতে চাহে, বিলাইয়া দিতে চাহে! শরতের প্রত্যেক ভঙ্গির মধ্যে একটি অকরুণ ভাব

ফুটিয়া উঠিতেছিল, তাহা দূর হইয়া গেল। তাহার হৃৎপিণ্ডটা কে যেন কঠিন হস্তে মুঠা করিয়া ধরিয়া একবার সবলে নাড়িয়া দিল। তাহার চিন্তা ও কল্পনার স্রোত হঠাৎ এমন এক স্থানে আসিয়া থামিয়া গেল, যেখানে সে আর কোনমতেই একটি শ্রেয়ঃ পথ খুঁজিয়া পাইতেছিল না। নির্ম্মলার কথার কি উত্তর সে দিবে? শ্রদ্ধায় ও সম্ভ্রমে তাহার অন্তর পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল! এই দেবীরূপা নির্ম্মলাকে একটু পূর্ব্বেই সে আঘাতের দ্বারা নিরস্ত করিবার জন্য উন্মুখ হইয়া উঠিয়াছিল! তখন শরৎ আবার নির্ম্মলার দিকে অগ্রসর হইয়া গেল; আবার তাহার কণ্ঠালিঙ্গন করিয়া মৃদুস্বরে কহিল,—"তুমি কি করিতে বল, নির্ম্মল?"—নির্ম্মলা তাহার বাষ্পব্যাকুল দৃষ্টিটুকু একবার শরতের মুখের উপর স্থাপন করিল;—তারপর স্বামীর প্রেমোদ্বেলিত বক্ষে মুখ লুকাইয়া অশ্রুরোধের ব্যর্থ চেষ্টা করিতে লাগিল। শরৎ নির্ম্মলাকে তাহার উচ্ছ্বসিত বক্ষের কাছে চাপিয়া ধরিল, সেই কুসুমপেলবা নারীর স্নিগ্ধ স্পর্শ তাহার সমগ্র অনুভূতিটুকুকে আচ্ছন্ন, পরিমূঢ় করিয়া তুলিল। এ কি দুঃখ? এ কি তৃপ্তি?—কি এ? শরৎ কিছুই বুঝিল না;—শুধু তাহার স্নিগ্ধ দৃষ্টি সেই বক্ষবিলগ্না নারীর দিকেই একান্তভাবে ফিরিয়া আসিল। তারপর ধীরে ধীরে তাহার চক্ষুদ্বয় আপনা হইতেই মুদ্রিত হইয়া আসিল।

২

দ্বিতলের ছোট একটি কক্ষের মধ্যে দুইটি রমণী উপবিষ্টা ছিল। একজন নির্ম্মলা,—অপরা তাহার দিদি, উৎপল। হাতের সেলাই বন্ধ করিয়া উৎপল কহিল, "নির্ম্মল, তুই কি আমাকে স্থির থাকিতে দিবি না?"—"কেন, কি করিয়াছি আমি?"—নির্ম্মলার মুখে একটু মৃদু হাসি ফুটিয়া উঠিতেছিল; সে তাহা চাপিয়া গেল, "তোমার সাত রাজার ধন এক মাণিক কাড়িয়া লইতেছি না

ত ?”—“যে দিন মনে করিয়াছিলাম, বাস্তবিকই তুই কাড়িয়া নিতেছিস্, সে দিনও প্রাণে যে শান্তিটুকু ছিল, আজ যেন তাহাও নাই মনে হইতেছে।”—নির্ম্মলা চাহিয়া দেখিল, উৎপলের চক্ষু বাষ্পাকুল হইয়া উঠিয়াছে ; তাহার স্বর গাঢ় ; বক্ষ আবেগ-[illegible]ত। [illegible]লা উৎপলের দিকে সরিয়া আসি[illegible] তাহার শিথিলবিন্যস্ত দক্ষিণ হস্তখানি নিজ প্রকোষ্ঠমধ্যে [illegible]ণ করিল, তারপর মৃদুকণ্ঠে ডা[illegible] “—অপরাধ করিয়াছি ?” “তুই সতী , এমন কেন তুই, নির্ম্মল ?”—“দিদ !”—“কি ?”—“স্বামী ত [illegible]র্ব্বাপেক্ষা প্রিয়, তাঁহাকে যদি সকলেই ভালবাসে, বড় সুখের [illegible]ে কি ? সতীনই স্বামীকে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী ভালবাসে, সুতরাং সর্ব্বাপেক্ষা সতীন প্রিয় নহে কেন ?”—সতী[illegible] মু[illegible] কি শুনিতেছিল ! কি ত্যাগের মহামন্ত্র এই ! “আমরা দুই ভগিনী যদি তাঁহাকে যত্ন করিতে পারি, সুখী করিতে পারি, তার চেয়ে আর সুখ কি আছে, দিদি ?”—“তাই বলিয়া পাগলী, সতীনকে ভাগ দিব ?”—“কার ভাগ কে দেয়, দিদি ?”—“তুই তো সবই পাইয়াছিলি !”—“তোমাকে বঞ্চিত করিয়া,—ছিঃ !”—“তিনি তো আমাকে ভুলিয়াছিলেন, তুই কেন তাঁহাকে এমন করিয়া ফিরাইলি ? যে উৎসমুখ শুকাইয়া গিয়াছে, তুই কেন জোর করিয়া সেখানে প্রবাহ আনিতে চাহিতেছিস্ ?”—“প্রবাহ যদি আসে সৌভাগ্য মনে করিব।”—“মিথ্যা কথা, প্রবাহ আসে না ; কর্ত্তব্যের তাড়নায় শুধু অন্তরকেই ক্লিষ্ট করিয়া তোলা হয় ;—নির্ম্মল, তুই আমাকে রক্ষা কর্। তাঁহাকে এমন করিয়া জ্বালাইয়া লাভ কি ?” নির্ম্মলা কথা কহিল না। এমন সময়ে কক্ষদ্বারে শরৎ আসিয়া ডাকিল, “নি,—উৎপল !”—উৎপল জানিত নির্ম্মলার অপার্থিব ত্যাগের মহিমা স্বামীর মর্ম্মবীণায় এমনি একটি অননুভূতপূর্ব্ব ঝঙ্কার তুলিয়াছিল, যাহাকে তিনি নিশিদিন অন্তরমধ্যে অভিনন্দন করিতেছিলেন। যে প্রেমপ্রবাহ সহজ গতিতে

নির্ম্মলার দিকেই প্রধাবিত হইতেছিল, তাহাকে কর্ত্তব্যের গণ্ডীর মধ্য দিয়া ফিরাইয়া লইয়া উৎপলের দিকে আনিবার নিষ্ফল চেষ্টা করিতেছিলেন! যে আহ্বান নির্ম্মলার জন্যই হৃদয়মধ্যে পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিতেছিল, তাহাকে উৎপলের দিকে ফিরাইয়া দিবার জন্য শরতের যে কৃত্রিমতাটুকু অবলম্বন করিতে হইল, সে কৃত্রিমতাটুকু উৎপলকে মর্ম্মন্তুদ বেদনায় কাতর করিয়া তুলিল! স্বামীর আহ্বান শুনিয়া উৎপলের কপোল ও ললাটে শোণিতের একটা ক্ষণিক উচ্ছ্বাস খেলিয়া গেল।—তারপরই যে তাহার সমস্ত মুখখানি একেবারে পাংশুবর্ণ ধারণ করিল, নির্ম্মলা তাহা লক্ষ্য করিল। শয্যার নিকট হইতে একখানি হাতপাখা টানিয়া লইয়া নির্ম্মলা কহিল, "দিদি,—তুমি হাওয়া কর, আমি জলখাবারের রেকাবী খানা লইয়া আসি।" নির্ম্মলা বাহির হইয়া গেল। উৎপল তাড়াতাড়ি পাখা লইয়া শরতের কাছে গিয়া দাঁড়াইল। শরৎ কি ভাবিয়া দুই বাহু প্রসারিত করিয়া উৎপলকে বুকের কাছে টানিয়া লইল, এবং তাহার কম্পিত রক্তাধরে একটি চুম্বন মুদ্রিত করিয়া দিল। দ্বারের কাছে নির্ম্মলা আসিতেছিল, সে ঈষৎ হাসিয়া দুই পা পিছাইয়া কবাটের অন্তরালে গেল।

৩

বাহিরের ঘরে একখানা ছোট টুলের উপর বসিয়া বসিয়া শরৎ ভাবিতেছিল, জীবনটাকে এমন করিয়া সে কোথায় টানিয়া লইয়া চলিয়াছে? এ কি মিথ্যা প্রেমাভিনয় তাহাকে নিশিদিন করিতে হইতেছে! কোথায় ইহার শেষ? সাধ্বী নির্ম্মলার কাছে ত্যাগের যে মহামন্ত্র সে শিক্ষা করিয়াছে, তাহা তাহাকে পুড়াইয়াই ছাই করিতেছিল! তাহার হৃদয়ের উন্মুখ আকাঙ্ক্ষারাশি নির্ম্মলাকেই অবলম্বন করিয়া বাড়িয়া উঠিতে চাহিতেছে, কিন্তু নির্ম্মলা তাহার সেই উচ্ছ্বসিত প্রেমকে উৎপলের দিকেই ফিরাইয়া

দিবার জন্য চেষ্টা করিতেছে! অদৃষ্টের এ কি নির্ম্মম পরিহাস! এই পুষ্পপেলবা নারী, কিন্তু কি বিপুল তাহার অন্তরশক্তি! গর্ব্বিত পুরুষ সে, সে কেমন করিয়া তাহার কাছে হৃদয়ের দুর্ব্বলতা প্রকাশ করিবে? কিন্তু এমন করিয়া সে কয়দিন বাঁচিবে? তাহার অন্তর যে ভিতরে ভিতরে ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিতেছিল, বিদ্রোহী হইয়া উঠিতেছিল, সে তাহা কেমন করিয়া রোধ করিবে? প্রেমের এই মিথ্যা অভিনয়ে, এই ইচ্ছাকৃত আত্মপ্রবঞ্চনায়, উৎপলও তো শান্তি পাইতেছে না! সে তাহাকে যতটুকু দিতে চাহিতেছে, সেটুকু তো স্বাভাবিক প্রেমাভিব্যক্তির ফলস্বরূপ নহে;—সেটুকু যে অনুগ্রহদান মাত্র! এ দান তাহাকে নিরন্তর ব্যথিত, ক্ষুব্ধ, সন্ত্রস্ত করিয়াই তুলিতেছে! এ যেন নারীত্বের প্রতি একটা বিষম অপমান! এমন করিয়া উৎপলকে অপমান করিবার কি অধিকার তাহার আছে? না, সে আর নির্ম্মলার কথায় ভুলিবে না,—তাহার অশ্রুবিন্দু এমন করিয়া আর উৎপলকে অপমান করিবার জন্য প্রস্তুত করিতে পারিবে না! না—কখনই না!—ভিতরের দিক্‌কার দরজার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া কে যেন চাবির গুচ্ছ নাড়িয়া মৃদুশব্দ করিল, শরৎ ফিরিয়া দেখিল নির্ম্মলা! একখানি গরিমাময়ী দেবী-প্রতিমার মত সেই মূর্ত্তিখানি বড়ই সুন্দর দেখাইতেছিল! শরৎ নিমেষশূন্য নয়নে চাহিয়া চাহিয়া দেখিল,—কি সে অনাবিল সৌন্দর্য্য! স্রস্ত কুন্তলদাম তাহার অংসে, উরসে আসিয়া পড়িয়াছে; ললাটের পার্শ্বে পার্শ্বে চূর্ণকুন্তল ঈষৎ উড়িতেছিল! আননে তাহার অপূর্ব্ব গরিমাচ্ছটা, অধর হাস্য-বিরঞ্জিত! শরৎ তাহাকে ঈশারা করিয়া কাছে ডাকিল; নির্ম্মলা কহিল, "সম্মুখের দরজাটা বন্ধ কর, আসিতেছি!"—শরৎ উঠিয়া সম্মুখের দরজা বন্ধ করিল, তখন নির্ম্মলা কাছে আসিল। কোমল, কম্পিত কণ্ঠে শরৎ ডাকিল—"নির্ম্মল!"—নির্ম্মলা উত্তর দিবার পূর্ব্বেই শরৎ তাহাকে

তাহার উচ্ছ্বসিত বক্ষের কাছে টানিয়া লইল! নির্ম্মলা ধরা দিল;—তাহার পুষ্পদলতুল্য অধরপুটে শরৎ যখন তাহার উষ্ণ কম্পিতাধর স্থাপন করিল, তখন নির্ম্মলার নয়নপল্লব আপনা হইতেই নিমীলিত হইয়া আসিল; সে সেই এক মুহূর্ত্তের জন্য নিজের অস্তিত্বটুকুকেও বিস্মৃত হইয়া গেল! শরৎ যে তাহার প্রেমকে কোনও মতেই উৎপলাভিমুখী করিতে পারিতেছিল না, সে যে শুধু নির্ম্মলাকেই সুখিনী দেখিবার জন্য, তৃপ্তা দেখিবার জন্য, তাহার হৃদয়ের সহিত এই উন্মাদ সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াছিল, নির্ম্মলা তাহা বুঝিত। শরতের মর্ম্মে মর্ম্মে যে অবসাদছায়া তাহাকে ক্লিষ্ট, পীড়িত করিয়া তুলিতেছিল, নির্ম্মলা তাহা বুঝিত! কিন্তু সে যদি দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, তাহা হইলে শরতের দুর্দ্দমনীয় হৃদয়বেগকে ত আর কোনোমতেই রোধ করিয়া রাখা যাইবে না; সুতরাং এ সংগ্রামকে তাহার জাগাইয়া রাখিতেই হইবে! কিন্তু এই সুখ, এই প্রলোভন, কোন্ নারী এমন করিয়া ত্যাগ করিতে পারিয়াছে? একখানি প্রেমপূর্ণ হৃদয় তাহার দিকে আপনার সহস্রমুখী উচ্ছ্বাস, আবেগ লইয়া অগ্রসর হইয়া আসিতে চাহিতেছে, সে তাহাকে নিষ্ঠুরের মত দুইহাতে ঠেলিয়া ফিরাইয়া দিতেছে! কি নিষ্ঠুর কি পাষাণী সে! হে বিশ্বদেবতা, হে নির্ম্মলার অন্তরের ঠাকুর, তুমি তাহাকে শক্তি দাও, বল দাও! স্বামী মুহূর্ত্তের ভ্রমে যে অন্যায় করিয়াছেন, নির্ম্মলা তাহারই প্রায়শ্চিত্ত করিবে! সে নারী হইয়া কেমন করিয়া উৎপলকে স্বামিসুখ হইতে বঞ্চিতা করিবে? না, হইতেই পারে না! তাহার স্নেহময়ী দিদি উৎপল;—স্বামীর উপর তাহারই তো সর্ব্বপ্রথম অধিকার! সেই সাধ্বী মমতাময়ী নারীকে সে কেমন করিয়া সর্ব্বসুখবঞ্চিতা দেখিবে? স্বামীর প্রেমকে সে তো সম্পূর্ণরূপেই নিজের আয়ত্ত করিতে পারিত! কিন্তু, আনন্দ, তৃপ্তি, সুখ কি শুধু ভোগের মধ্যেই,—না ত্যাগের মধ্যে? সে কি এমনই হীন যে, ভোগের মধ্যেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সুখ ও তৃপ্তিকে চাহিবে?

স্বামীর প্রেমবিগলিত আহ্বান তাহার মুগ্ধ শ্রবণযুগলে প্রবেশ করিল, "নির্ম্মল!"—নির্ম্মলার বুকের মধ্যে বড় কেমন করিতেছিল; এই উচ্ছ্বসিত আবেগকে সে কেমন করিয়া অস্বীকার করিবে? নির্ম্মলা তবু তাহার হৃদয়কে দৃঢ় করিল; এ পরীক্ষা-সমুদ্র যে তাহাকে পার হইতেই হইবে! মৃদু সংযতকণ্ঠে নির্ম্মলা উত্তর দিল, "কি?"—শরৎ দেখিল, এতটুকু এই উত্তরটুকু! নির্ম্মলা ইচ্ছা করিলে ইহারই ভিতর দিয়া তাহার হৃদয়ের সমস্ত আবেগকে, প্রেমকে আকারের সার্থকতা প্রদান করিতে পারিত। হায়, নির্ম্মলা কি সত্যই পাষাণপ্রতিমা? তাহার নিবেদিত প্রেমটুকু কি চিরদিনই এমনি অপরিগৃহীত, অস্বীকৃত রহিবে! শরৎ বেদনাপূর্ণ স্বরে কহিল, "কি করিলে তোমাকে সুখিনী দেখিব, তৃপ্তা দেখিব, নির্ম্মলা?"—নির্ম্মলার বুকের মধ্যে একটি প্রবল ঝটিকা প্রবাহিত হইতেছিল;—তাহা তাহার অন্তরদেশকে বিধ্বস্ত, লুণ্ঠিত করিতেছিল! কিন্তু আজ ত সে কিছুতেই কাতর হইবে না! নির্ম্মলা কহিল, "দিদিকেও যেদিন এমনই করিয়া ডাকিবে, বুকের কাছে টানিয়া নিবে, সেই দিনই আমি সুখী হইব!"—শরৎ বিস্মিত, স্তব্ধ হইয়া গেল! তাহার সর্ব্বাঙ্গ এক বিপুল আবেগে কম্পিত হইতেছিল, সে সেই আলিঙ্গনমুক্তা নারীর দিকে বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে একবার চাহিল, তারপর অন্যমনস্কভাবে ধীরে ধীরে কহিল,—"কি তুমি, নির্ম্মলা, দেবী, না রাক্ষসী!"—"আমি তোমারই"—নির্ম্মলার কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই শরৎ কক্ষ ত্যাগ করিয়া বাহির হইয়া গেল! তখন নির্ম্মলা সেই কক্ষের মধ্যেই লুঠাইয়া পড়িল! তাহার হৃদয় আজিকার এই সংগ্রামে বিধ্বস্ত, ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে। তাহার কেবলই মনে হইতে লাগিল, সত্যসত্যই কি সে রাক্ষসী!

৪

সে দিন প্রভাতের বহুপূর্ব্বে নির্ম্মলার নিদ্রাভঙ্গ হইল। সপ্তমীর ক্ষীণ চন্দ্র তখনও আকাশে হাসিতেছিল। উন্মুক্ত জানালার ভিতর দিয়া দুই একটী ক্ষীণ রশ্মি নির্ম্মলার নিঃসঙ্গ শয্যাখানির উপর পড়িয়াছে; সে আলোকটুকুতে কক্ষটাকে সম্পূর্ণ উজ্জ্বল করিয়া তুলিতে পারে নাই। মেঘকৃষ্ণ প্রস্তরখণ্ডের উপর কনক নিকষ-রেখার ন্যায়, অন্ধকারপূর্ণ কক্ষের মধ্যে সেই আলোকরশ্মি বড় শোভা পাইতেছিল! নিদ্রাভঙ্গের পর নির্ম্মলার হৃদয়তন্ত্রী বড় একটা করুণ সুরে বাজিতেছিল। তাহার বুকের মধ্যে ব্যথা, বেদনা, মান, অভিমান, কিছুরই আর স্থান ছিল না। 'ভাদরের' কূলপ্লাবিনী তরঙ্গিণীর মত, সেই মুহূর্ত্তটিতে তাহার হৃদয়খানি উচ্ছ্বাসে, আগ্রহে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে! তাহার অস্তিত্বটুকু যেন একেবারে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে; শুধু একটি উন্মুখ আগ্রহ তাহাকে বেষ্টন করিয়া, ছাপাইয়া বাড়িয়া উঠিয়াছে! বাহিরের বিশ্বপ্রকৃতির দিকে নির্ম্মলা চাহিয়া দেখিল; সেখানেও বিপুল পরিপূর্ণতা, একটি একমুখী উন্মুখ আগ্রহ সমগ্র বিশ্বসৌন্দর্য্যকে সার্থকতা প্রদান করিতেছে। নির্ম্মলা ধীরে ধীরে দরজা খুলিয়া বারান্দার উপর আসিয়া দাঁড়াইল! চন্দ্রমাশালিনী যামিনী! দুঃখের পাশে সুখের হাসিটুকুর মত, ছায়ায় ও আলোকে বাহিরের দৃশ্যপট আবৃত রহিয়াছে। নির্ম্মলা একখানি ছোট টুলের উপর বসিল। রেলিংএর পাশে পাশে সাজানো টবগুলির মধ্যে ফুলের গাছ ছিল; তাহাতে দুই একটা ফুল ফুটিয়াছে। মৃদু পবনস্পর্শে গাছগুলি একটু একটু নড়িতেছিল; ফুলগন্ধ বহন করিয়া, বায়ু নির্ম্মলার চূর্ণকুন্তল উড়াইয়া, তাহার রক্তকপোল স্পর্শ করিয়া, অঞ্চলাগ্রভাগ দুলাইয়া প্রবাহিত হইতেছিল! উপরে নক্ষত্ররাজি-পরিশোভিত অনন্ত নীলাকাশ; নিম্নে সুপ্তিমগ্না বিপুলা ধরণী! নির্ম্মলা দেখিল, সেই বিরাট্ বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে কোথাও এতটুকু

দৈন্য নাই, এতটুকু অসামঞ্জস্য নাই! মানুষ তাহার আকাঙ্ক্ষা দ্বারাই দৈন্যকে সৃষ্টি করিয়া তুলে;—সে যে দুঃখ পায়, সে শুধু সে ত্যাগের মধ্যে আনন্দ পায় না বলিয়াই! ঠাকুরের এই সুন্দর সৃষ্টির মধ্যে, মানুষ—কেন সাধ করিয়া দৈন্যকে আনয়ন করে? হে বিশ্বরাজ, তুমিই নির্ম্মলার অন্তরকে শান্ত কর, পরিতৃপ্ত কর! কাহার মৃদুস্পর্শে নির্ম্মলা চমকিয়া উঠিল। চাহিয়া দেখিল, উৎপল।—"দিদি! তুমি এখনি উঠিলে?"—"নির্ম্মল, ঘুমাও নাই বুঝি?"—"হঠাৎ ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল; বড় সুন্দর বাহিরটা, তাই এখানে আসিয়া বসিলাম।"—একটু চুপ করিয়া নির্ম্মলা আবার কহিল,—"দিদি!"—"কি নিরু!"—"তিনি উঠিয়াছেন?"—"না, ঘুমান নাই বোধ হয়!"—উৎপলের কণ্ঠস্বর একটু ধরিয়া আসিতেছিল! একটু চকিতভাবে নির্ম্মলা কহিল, "বোধ হয়, সে কি!"—"নির্ম্মল, তুই আমাকে রক্ষা কর্; তুই আমাকে রক্ষা কর্; তুই আমাকে এ কি পরীক্ষার মধ্যে ফেলিয়াছিস্! নিজের অন্তরের সঙ্গে প্রতিদিন এমন করিয়া সংগ্রাম করিয়া আর পারি না!"—"কেন, কি হইয়াছে দিদি?"—একটু কুণ্ঠিতভাবে নির্ম্মলা কহিল। "তুই যে সতীন সে পরিচয় তুই দিয়াছিস্!—কিন্তু এমন করিয়া দিলি কেন নিরু! দেখ্ নির্ম্মলা, স্বামীর সুখই আমি চাহি; আমি নিজের সুখ চাহি না! স্বামী সুখী হইয়াছেন জানিলেই সুখী হইব! তুই কেন এমন করিয়া, তাঁহার অন্তরবেগকে ফিরাইতে চাহিতেছিস্? ইহাতে তাঁহাকে সুখী করা হয় নাই; তোর তৃপ্তির জন্য তিনি তাঁহার সুখস্বাচ্ছন্দ্য সকলি বিসর্জ্জন দিতে বসিয়াছেন;—তুই কি পাষাণী নির্ম্মলা!—না, এমন করিয়া আর আমি তোকে বাড়িতে দিব না!"—"দিদি, দিদি ক্ষমা কর দিদি!"—নির্ম্মলার কণ্ঠ আবেগরুদ্ধ হইয়া আসিল! সে ভূনতজানু হইয়া উৎপলের পাদমূলে বসিয়া পড়িল।—এমন সময়ে পার্শ্বে কাহার পদশব্দ শোনা গেল। উৎপল ও

নির্ম্মলা দেখিল স্বামী। উভয়েই সসম্ভ্রমে উঠিয়া দাঁড়াইল। শরৎ সেই অনাবিল চন্দ্রালোকে দেখিল, উৎপল ও নির্ম্মল। এই দুই নারী, উৎপল ও নির্ম্মল, তাহাকেই আশ্রয় করিয়া জীবনের উর্ব্বর ক্ষেত্রের মধ্য দিয়া গঙ্গা ও যমুনার পবিত্র ধারার মত ছুটিয়া চলিয়াছে। হায়, সে যদি তাহার প্রেমকে এই দুই ধারার সহিত সম্মিলিত করিতে পারিত! শরৎ তাহার বাহুদ্বয় বক্ষসম্বদ্ধ করিল। ধীরে ধীরে তাহার নয়নদ্বয় নিমীলিত হইয়া আসিল। একটি উত্তপ্ত দীর্ঘনিশ্বাস তাহার হৃদয়কে মথিত করিয়া বাহির হইয়া আসিল। কি এই দুর্ব্বার সংগ্রাম, যাহা নিশিদিন হৃদয়কে ব্যথিত, বিধ্বস্ত, লুণ্ঠিত করিয়া দিতেছে! শরৎ চক্ষু চাহিয়া দেখিল, উৎপল চলিয়া গিয়াছে। আর তাহার সম্মুখে রূপপ্রভায় সেই স্নিগ্ধ চন্দ্রালোক গরিমামণ্ডিত করিয়া দণ্ডায়মানা রহিয়াছে, তাহারই চির-ঈপ্সিতা দয়িতা, পাষাণী নির্ম্মলা! শরৎ রাক্ষসের ক্ষুধা লইয়া বিপুলবেগে সেই বেপথুমতী নারীর উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল; তারপর তাহাকে স্বীয় আবেগোচ্ছ্বসিত বক্ষের কাছে সজোরে টানিয়া লইল! এই দুর্দ্দমনীয় উচ্ছ্বাসের মুখে নির্ম্মলা ভাসিয়া গেল; শুধু সে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া মনে মনে কহিল,—
"দিদি, স্বামী তোমারই, তোমাকেই দিব।"

৫

বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। দ্বিতলের একটি কক্ষের মধ্যে একখানি শুভ্র শয্যার উপর নির্ম্মলা শয়ন করিয়াছিল। পার্শ্বে একটি নিদ্রিত ক্ষুদ্র শিশু। একরাশি স্বর্ণচম্পক কে যেন শয্যার উপর ঢালিয়া রাখিয়া গিয়াছে। নির্ম্মলা স্থিরদৃষ্টিতে সেই ক্ষুদ্র শিশুটির মুখের দিকে চাহিয়াছিল। দুইমাস পূর্ব্বে শিশু যেদিন সর্ব্বপ্রথম তাহার অস্ফুট কাকলী দ্বারা আপনার আগমনবার্ত্তা ঘোষণা করিয়া দিয়াছিল, সেইদিন হইতেই নির্ম্মলা পীড়িতা। গত

দুইমাসের মধ্যে এমন অনেক মুহূর্ত্ত গিয়াছে, যখন সে জীবন ও মরণের সন্ধিস্থলে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে ; প্রত্যেক বারই উৎপলের প্রাণপণ সেবা তাহাকে ফিরাইয়া রাখিয়াছে। কিন্তু তবু নির্ম্মলা ভাবিত, এবার বুঝি তাহার ডাক পড়িয়াছে। স্বামীর অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করিবার জন্য সে যে তুষানল আহার হৃদয়ের মধ্যে নিশিদিন প্রজ্বলিত করিয়া রাখিয়াছে—তাহারই নিমেষহীন শিখা তাহাকে দিনে দিনে, পলে পলে, দহন করিতেছিল,—প্রশান্ত, সুন্দর মৃত্যুর দিনে পথ দেখাইতেছিল। নির্ম্মলা আপনার অস্তিত্ব-টুকুকে সম্পূর্ণরূপে উৎপলের মধ্যে লীন করিয়া দিতে চাহিতে-ছিল ;—উৎপল আর সে, গঙ্গা ও যমুনার মত একই ধারায় মিলিত হইয়া, স্বামীকে বেষ্টন করিয়া যদি বাড়িয়া না উঠিতেই পারিল, তাহা হইলে কোথায় তাহার নারী-জীবনের সার্থকতা ? নারীর প্রেমপূর্ণ হৃদয় লইয়া সে বিশ্বে আসিয়াছে ;—ত্যাগের মধ্যে এ জীবনকে নিঃশেষ করিয়া দিয়া, সে কি আপনাকে একটি পরম ও চরম সার্থকতা প্রদান করিতে পারিবে না ! ধীরে ধীরে নির্ম্মলা চক্ষু মুদ্রিত করিল ; সুখে ও বেদনায় সচেতন একটি কোমলতম সুর তাহার মর্ম্মতন্ত্রীতে বড় ধীরে ধীরে বাজিতেছিল। শয্যাশায়িত পুষ্পপেলব শিশুটি, আজি তাহার নয়নের কাছে একটি নিমেষহীন দীপশিখার ন্যায় প্রকাশিত হইয়া, তাহাকে তাহার অন্তরের চিরসমস্যার মীমাংসা-পথ দেখাইতেছিল। নিঃশব্দচরণে উৎপল কক্ষমধ্যে আসিল। শিশু জাগিয়া, তাহার হাত পা নাড়িতেছিল। উৎপল শয্যার পার্শ্বে ধীরে ভূ-নত-জানু হইয়া, বসিয়া সস্নেহে শিশুর ললাটে তাহার বিম্বাধর স্পর্শ করিল। তাহার নয়ন হইতে দুই বিন্দু অশ্রু মুক্তাফলের মত গড়াইয়া নামিয়া আসিল। শিশু সেই মৃদু স্পর্শানুভব করিয়া, একটু অব্যক্ত শব্দ করিল। নির্ম্মলা চক্ষু চাহিয়া দেখিল, "দিদি।"—তৃপ্তিতে ও আনন্দে তাহার হৃদয় উদ্বেলিত হইয়া উঠিল ; সে ডাকিল—"দিদি !"—উৎপল উত্তর দিল

না, শিশুকে তুলিয়া বুকের কাছে চাপিয়া ধরিল।—তাহার নয়নে অশ্রু,—মুখে প্রসন্ন হাসির রেখা। নির্ম্মল আবার চক্ষু মুদ্রিত করিল, কহিল, "দিদি!"—"কি, নিরু?"—"এখন যদি মরিতে পারিতাম, দিদি!"—"ভাগ্যবতী তুই, এ তোর কি সাধ নিরু!"—নির্ম্মলার বুকের মধ্যে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস বড় ওলট পালট করিতে-ছিল; সে সেই নিঃশ্বাসটাকে চাপিয়া ফিরাইয়া দিয়া কহিল, "দিদি, খোকাকে ত তাঁহার কোলে দিলে না,—" "তুই সারিয়া ওঠ্—তারপর,"—"রাণী-দিদির মত বিচার করিও, দিদি! আমি পেটে ধরিয়াছি বলিয়া, খোকা কি বেশী করিয়া আমার?" "রাক্ষসি এমন করিয়া তুই আমাকে হত্যা করিতে চাহিতেছিস্ কেন?"—"সতীন যে!"—নির্ম্মলার পাণ্ডুর অধরে একটি প্রশান্ত নির্ম্মল হাসি বিদ্যুতের মত ক্রীড়া করিয়া গেল। নীচে শরতের কণ্ঠস্বর শুনা গেল। নির্ম্মলা কহিল, "খোকাকে তিনি একদিনও কোলে করেন নাই,—বড় সাধ হইতেছে, তাঁহার কোলে খোকাকে দেখিব; দিদি, এ সাধ কি মরিবার আগে পূর্ণ হইবে না?"—উৎপলের কপোল অশ্রুপ্লাবিত হইয়া গেল! সে নির্ম্মলার চিবুক স্পর্শ করিয়া কহিল—"পাগল আর কি! এবার তোকে মরিতে দিলাম কই?"—দ্বারের কাছে কাহার পদশব্দ হইল, উভয়ে চাহিয়া দেখিল, স্বামী! শরৎ অতৃপ্তনয়নে চাহিয়া চাহিয়া দেখিতেছিল—কি স্বর্গীয় দৃশ্য! এতদিন যে মোহ, যে অন্ধ আবেগ, তাহাকে নিবিড়ভাবে বেষ্টন করিয়াছিল, এই নির্ম্মল, পবিত্র দৃশ্য দেখিয়া, আজি তাহা এক মুহূর্ত্তের মধ্যে কাটিয়া গেল। দিনের পর দিন সে এই দুই মহীয়সী রমণীর অপূর্ব্ব অন্তর-সৌন্দর্য্য লক্ষ্য করিয়া বিস্মিত হইতেছিল। নিজের হৃদয়-দৈন্য, দিনে দিনে, পলে পলে, তাহাকে কুণ্ঠিত, পীড়িত করিয়া তুলিতেছিল। আজই সে সর্ব্বপ্রথম নিজেকে পরম সৌভাগ্যবান্ বলিয়া অভিনন্দন করিল। জগতে কোন্ শ্রেষ্ঠ চিত্রকর এমন একখানি চিত্র অঙ্কিত করিতে পারিয়াছেন? সে দ্রুতপদে নির্ম্মলার

শয্যার দিকে অগ্রসর হইয়া গিয়া উচ্ছ্বসিতস্বরে কহিল, "নিরু, অপরাধ করিয়াছি, ক্ষমা কর আমাকে!"—উৎপল একটু অগ্রসর হইয়া, তাহার বক্ষসংলগ্ন শিশুকে স্বামীর প্রসারিত বাহুর মধ্যে অর্পণ করিল। এক মুহূর্ত্তের মধ্যে সমস্ত কুণ্ঠা, অভিমান, ব্যথা ও বাধা দূর হইয়া গেল। শরৎ অগ্রসর হইয়া নির্ম্মলার ললাটে আবেগতপ্ত ওষ্ঠ স্পর্শ করিল। উৎপলও একটু নীচু হইয়া নির্ম্মলার কপোলে তাহার বান্ধুলিপুষ্পতুল্য অধরপুট স্থাপন করিল। নির্ম্মলা সুখের ও তৃপ্তির আবেগে চক্ষু মুদ্রিত করিল, কহিল,—"দিদি, এবার ত মরা হইল না!"—শরৎ ধীরে ধীরে ক্রোড়স্থ শিশুকে উৎপলের ক্রোড়ে দিয়া বাষ্পজড়িতকণ্ঠে ডাকিল, "উৎপল!"—হায়, আজ কত কথা, কত কাহিনী, কত বেদনা ও উপেক্ষার ইতিহাস যুগপৎ তাহার মনে জাগিয়া উঠিতেছিল। সে অপরাধী,—নির্ম্মলার কাছে অপরাধী, উৎপলের কাছে অপরাধী! স্বেচ্ছায়—অনিচ্ছায় নারী-হৃদয়-রহস্য উপেক্ষা ও অবহেলা করিয়া আসিয়াছে। উৎপল কোনও কথা না কহিয়া স্বামীর চরণের কাছে মাথা নত করিল; তখন শরৎ সেই অশ্রুমুখী নারীকে তাহার কম্পিত বক্ষের কাছে টানিয়া লইল!

সমাপ্ত

আটআনা সংস্করণ গ্রন্থমালা—

য়ুরোপ প্রভৃতি মহাদেশে "ছয়-পেনি-সংস্করণ"—"সাত-পেনি-সংস্করণ" প্রভৃতি নানাবিধ সুলভ অথচ সুন্দর সংস্করণ প্রকাশিত হয়—কিন্তু সে সকল পূর্ব্বপ্রকাশিত অপেক্ষাকৃত অধিক মূল্যের পুস্তকাবলীর অন্যতম সংস্করণ মাত্র। বাঙ্গালাদেশে—পাঠকসংখ্যা বাড়িয়াছে, আর বাঙ্গালাদেশের লোক—ভাল জিনিসের কদর বুঝিতে শিখিয়াছে; সেই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়াই, আমরা বাঙ্গালা দেশের লব্ধপ্রতিষ্ঠ কীর্ত্তিকুশল গ্রন্থকারবর্গ-রচিত সারবান্, সুখপাঠ্য, অথচ অপূর্ব্বপ্রকাশিত পুস্তকগুলি এইরূপ সুলভ সংস্করণে প্রকাশিত করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম। আমাদের এ চেষ্টা যে সফল হইয়াছে, 'অভাগী' ও 'পল্লী-সমাজের' এই কয়েক মাসের মধ্যে তৃতীয় সংস্করণ এবং 'বড়বাড়ী', 'অরক্ষণীয়া' ও 'ধর্ম্মপালের' দ্বিতীয় সংস্করণ ছাপিবার প্রয়োজন হওয়াই তাহার প্রমাণ।

যে আশা লইয়া এ কার্য্যে ব্রতী হইয়াছিলাম, ভগবৎপ্রসাদে ও সহৃদয় পাঠকবর্গের অনুগ্রহে আমাদের সে আশা অনেকাংশে ফলবতী হইয়াছে। "ক্লেশঃ ফলেন হি পুনর্নবতাং বিধত্তে।" শ্রম সার্থক হইলে হৃদয়ে নূতন আশা ও আকাঙ্ক্ষার উদয় হয়। আমরাও অনেক কার্য্যের কল্পনা করিতেছি। এই সিরিজের উত্তরোত্তর উন্নতির সহিত একে একে সেই সঙ্কল্পগুলি কার্য্যে পরিণত করিতে চেষ্টা করিব।

বাঙ্গালাদেশে—শুধু বাঙ্গালা কেন—সমগ্র ভারতবর্ষে এরূপ সুলভ সুন্দর সংস্করণের আমরাই সর্ব্বপ্রথম প্রবর্ত্তক। আমরা অনুরোধ করিতেছি, প্রবাসী বাঙ্গালী মাত্রেই আট-আনা-সংস্করণ গ্রন্থাবলীর নির্দ্দিষ্ট গ্রাহকশ্রেণীভুক্ত হইয়া এই 'সিরিজে'র স্থায়িত্ব সম্পাদন ও আমাদের উৎসাহবর্দ্ধন করুন।

কাহাকেও অগ্রিম মূল্য দিতে হইবে না, নাম রেজেষ্টারী করিয়া রাখিলেই আমরা যখন যেখানি প্রকাশিত হইবে, সেইখানি ভি, পি ডাকে প্রেরণ করিব। সর্ব্বসাধারণের সহানুভূতির উপর নির্ভর করিয়াই আমরা এই বহুব্যয়সাধ্য কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছি; গ্রাহকের সংখ্যা নির্দ্দিষ্ট থাকিলে আমাদিগকে দ্বিতীয় বা তৃতীয় সংস্করণ ছাপাইয়া অধিক ব্যয়ভার বহন করিতে হইবে না।

এই গ্রন্থমালার প্রকাশিত

গ্রন্থাবলী

১। অভাগী (৩য় সংস্করণ)—শ্রীজলধর সেন।

২। ধর্ম্মপাল (২য় সংস্করণ)—শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

৩। পল্লীসমাজ (৩য় সংস্করণ)—শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

৪। কাঞ্চনমালা (২য় সংস্করণ)—শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী।

৫। বিবাহবিপ্লব (২য় সংস্করণ)—শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত এম্-এ, বি-এল্।

৬। চিত্রালী—শ্রীসুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

৭। দূর্ব্বাদল (২য় সংস্করণ)—শ্রীযতীন্দ্রমোহন সেন গুপ্ত।

৮। শাশ্বতভিখারী—শ্রীরাধাকমল মুখোপাধ্যায়।

৯। বড় বাড়ী (২য় সংস্করণ)—শ্রীজলধর সেন।

১০। অরক্ষণীয়া (২য় সংস্করণ)—শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

১১। ময়ূখ—শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ।

১২। সত্য ও মিথ্যা—শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল।

১৩। রূপের বালাই—শ্রীহরিসাধন মুখোপাধ্যায়।

১৪। সোণার পদ্ম—শ্রীসরোজরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ।

১৫। লাইকা—শ্রীমতী হেমনলিনী দেবী।

১৬। আলেয়া—শ্রীমতী নিরুপমা দেবী।

১৭। বেগম সমরু—শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

১৮। নকল পাঞ্জাবী—শ্রীউপেন্দ্রনাথ দত্ত।

১৯। বিল্বদল—শ্রীযতীন্দ্রমোহন সেন গুপ্ত।

২০। হাল্‌দার বাড়ী—শ্রীমুনীন্দ্রপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী।

২১। মধুপর্ক—শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়।

২২। লীলার স্বপ্ন—শ্রীমনোমোহন রায় বি-এল।

প্রাপ্তিস্থান—গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্,

২০১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

বঙ্গ-সাহিত্য-ভাণ্ডারের
কয়েকখানি অপূর্ব্ব-রত্ন

বিনিময়।—শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য প্রণীত। নূতন ধরণের শ্রেষ্ঠ সামাজিক উপন্যাস—দার্শনিক বলেন, জগতের একবিন্দু কর্ম্ম নিষ্ফলে যায় না। তাহার বিনিময় আছে, বৈষম্য আছে, নাই বাধা—নাই বৈফল্য! বঙ্গ সংসারের খুটি নাটি কাজেও এই নিয়মের ব্যতিক্রম নাই তাই অনভিজ্ঞ গ্রন্থকার তাঁহার সেই আকর্ষণী শক্তিশালিনী আবেগময়ী ভাষায় নিপুণতার সহিত "বিনিময়ে" বঙ্গ-সংসারের এক নিখুঁত ফটো তুলিয়াছেন। মনোজ্ঞ বাঁধাই ও বহুচিত্র শোভিত। মূল্য ১৷৽ দেড় টাকা। ডাকব্যয় ৶৽।

নারীলিপি।—একাধারে নারীলিপি ও নারী-গীতা! শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ রায় প্রণীত। পত্রগুলি এমনই কৌশলে রচিত যে ইহাদের ভিতরেই রমণী-দিগের অবশ্য পালনীয় প্রায় সকল নীতিকথারই উল্লেখ আছে। এই উপদেশ গুলি পালন করিয়া চলিলে, রমণীগণ সত্য-সত্যই লক্ষ্মীস্বরূপা হইতে পারিবেন। এই উভয় উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় বলিয়া পুস্তকখানি রমণী সমাজের বিশেষ কল্যাণকর হইয়াছে। প্রত্যেক প্রিয়পাত্রীকে একখানি উপহার দিতে ভুলিবেন না। মূল্য ১।৽, ডাকব্যয় ৶৽ আনা।

কুললক্ষ্মী।—শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ রায় প্রণীত। প্রত্যেক বঙ্গ-রমণীর অবশ্য পাঠ্য। কি করিয়া আমাদের বালিকারা লক্ষ্মীস্বরূপা এবং স্বামীগৃহে প্রবেশ করিয়াই সকলের মনোরঞ্জন করিয়া 'কুললক্ষ্মী' বলিয়া পরিচিতা হইতে পারেন, তাহা এই গ্রন্থে অতি সরল ভাষায় প্রদর্শিত হইয়াছে। এই গ্রন্থখানি পড়িয়া যে রমণী ইহার উপদেশ পালন করিবেন, তাঁহাকে আর শ্বশুর-গৃহে কাহারও অনাদর সহ্য করিতে হইবে না। পাঁচখানি বহুবর্ণের অতি সুন্দর চিত্র ভূষিত, রঙ্গিন ছাপা, অতি উৎকৃষ্ট বাঁধা—মূল্য ১৲ টাকা ও ডাকব্যয় ৶৽।

দেবগণের মর্ত্ত্যে আগমন।—পণ্ডিত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ সম্পাদিত। একাধারে ভ্রমণ-কাহিনী, ইতিহাস, জীবন-চরিত, উপন্যাস, গুপ্তকথা ও রসকথা! ভারতবর্ষের তীর্থ স্থানের কাহিনী আছে। কত শত খ্যাতনামা ব্যক্তির জীবন চরিত আছে। দেশের কথা সংসারের কথা—পুরাণের কথা—ইতিহাসের কথা—বড় লোকের কথা—গেরোস্তের কথা—

গুপ্তকথা—রসের কথা,—ইত্যাদি কৌতূহলোদ্দীপক নানা কথায় "দেবগণের মর্ত্ত্যে আগমন" প্রায় ৭০০ পৃষ্ঠায় পরিপূর্ণ। মূল্য যৎসামান্য, মাত্র ২, ডাকব্যয় ।/০।

বাণী ও কল্যাণী। কবি রজনীকান্ত সেনের সাহিত্য সাধনার প্রথম ও শ্রেষ্ঠ ফল। "বাণী" ও "কল্যাণী" রচনাই কবিবরকে অমর করিয়াছে। কবিবরের 'কান্ত পদাবলী' বঙ্গের নরনারীর প্রাণে এক অপূর্ব্ব সঙ্গীতের মূর্চ্ছনা জাগাইয়া তুলিয়াছে। বাণী ও কল্যাণীর সঙ্গীতগুলি ত্রিস্রোতের ন্যায় —ভক্তি, প্রেম ও হাস্যরসের ত্রিধারায় বিভক্ত। ইহার প্রতিছত্রে "বাণী পঞ্চমে বোলেরে"। জন্মভূমির দারুণ ব্যথায় কোথাও গাহিয়াছেন,—

"মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় মাথায় তুলে নেরে ভাই"

আবার কোথাও—ভগবদ্ভক্তির গভীর গদ্‌গদ ধ্বনি বাহির হইয়াছে। সিল্কপ্যাড্ বাঁধাই, মূল্য প্রত্যেক খানি ১, এক টাকা। উপহারের শ্রেষ্ঠ কাব্য।

সাবিত্রী সত্যবান।—শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ রায় প্রণীত। সাবিত্রী সত্যবান উপহার রাজ্যে ও স্ত্রীশিক্ষা সমাজে যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছে। সতীকুলরাণী সাবিত্রীর কাহিনী পাঠ না করিলে নারীজন্ম ব্যর্থ হয়। প্রত্যেক হিন্দুনারীরই ইহা দেবতার নির্ম্মাল্য বোধে মাথায় রাখা ও রামায়ণ মহাভারতের ন্যায় নিত্য পাঠ করা উচিত। এই সংস্করণে গ্রন্থ কলেবর আরও সুশ্রী ও মনোহর করা হইয়াছে। মূল্যবান্ আসল লাল সাটিন সিল্কাপড় প্যাড বাঁধাই ও বহুবর্ণের 'সাবিত্রীর ত্রিরাত্র ব্রত' চিত্রাবরণে মণ্ডিত।— পাতায় পাতায় সৌন্দর্য্য—একাধারে উপদেশ ও উপভোগ—ছত্রে ছত্রে শিক্ষা! মূল্যাদি বর্দ্ধিত হয় নাই, পূর্ব্বমূল্য ১॥০ মাশুল ।০ আনা।

পদ্মিনী।—শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ রায় প্রণীত। পৌরাণিক যুগে সাবিত্রী যে স্থান অধিকার করিয়া আছেন, ঐতিহাসিক যুগে পদ্মিনীর সেই স্থান। যিনি সতীত্ব, ধর্ম্ম, ও মর্য্যাদা রক্ষার জন্য অকাতরে ভীষণ জহরানলে দেহ-বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন, যাঁহার স্মৃতি বক্ষে ধারণ করিয়া রাজস্থান এখনও গৌরবান্বিত—সেই সতীর পুণ্য কাহিনী প্রত্যেক বঙ্গবধূকে উপহার দিন। প্রত্যেক বঙ্গের কুললক্ষ্মীই "ত্যাগ গরিমায়" বঙ্গদেশকে রাজস্থানে পরিণত করিবেন।—ঘরে ঘরে 'পদ্মিনী'র ন্যায় নির্ভীক নারীর সৃষ্টি হইবে।—একাধারে শিক্ষা দীক্ষা ও উপন্যাসের মাধুর্য্য। মূল্য ১॥০ টাকা, ডাকব্যয় ।০ আনা।

কঙ্কণচোর।—শ্রীহরিসাধন মুখোপাধ্যায় প্রণীত।—সচিত্র ঐতিহাসিক বৃহৎ উপন্যাস, ৪৮০ পৃষ্ঠা। মহারাণী মুরলার সুবর্ণ-কঙ্কণ চুরির ব্যাপার লইয়া ইহার প্রাণ প্রতিষ্ঠা।—চাণক্যের কূট রাজনীতি—চন্দ্রগুপ্তের আত্মত্যাগ

—মহারাণীর পতিভক্তি—তড়িতার অপূর্ব্ব লীলা—ইহাতে বিচিত্র লীলা—ইহাতে বিচিত্র নানা ঘটনার সৃষ্টি করিয়াছে। কি করিয়া চাণক্য ও চন্দ্রগুপ্ত কর্ত্তৃক মগধের নন্দবংশ ধ্বংস হয়—তাহার বিচিত্র চিত্র—'কঙ্কণচোরে' চিত্রিত আছে।—মূল্য ২৲ ডাকব্যয় ।৹

শর্ম্মিষ্ঠা।—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ রায় প্রণীত। শর্ম্মিষ্ঠার পিতৃভক্তি—আত্ম-ত্যাগ, সকলের শিক্ষণীয়। এমন পবিত্র হৃদয়গ্রাহী স্ত্রীপাঠ্য পৌরাণিক কাহিনী, মনোজ্ঞ বাঁধাই, রঙ্গিন ছাপাই ও সুন্দর সুন্দর চিত্র ভূষিত, উপহারগ্রন্থ এক টাকা মূল্যে আর পূর্ব্বে কখনও প্রকাশিত হয় নাই। প্রত্যেক পিতাই তাঁহার সন্তান সন্ততিকে 'শর্ম্মিষ্ঠা' উপহার দিয়া 'পিতৃভক্তি' শিক্ষা দিন। মূল্য ১৲ ডাকব্যয় ৵৹।

সীতাদেবী।—খ্যাতনামা প্রবীণ সম্পাদক শ্রীযুক্ত জলধর সেন প্রণীত। সতীকুলরাণী জনম-দুঃখিনী সীতার জীবন কথা। ইহাতে রামায়ণের সূচনা হইতে সীতার পাতাল প্রবেশ পর্য্যন্ত—(অর্থাৎ সমস্ত রামায়ণ) অতি সুললিত সহজ ভাষায় বর্ণিত আছে। নূতন আকারে, বহু বর্ণের চিত্রাবরণ মণ্ডিত, তৃতীয় সংস্করণ বাহির হইল। সিল্কের কাপড়ে, প্যাড বাঁধাই—মূল্য সেই এক টাকা মাত্র, ডাকব্যয় ৵৹।

শৈব্যা—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ রায় প্রণীত। সতী-সাবিত্রী "শৈব্যা"র অপূর্ব্ব পাতিব্রত্য পাঠ করিয়া কোনও রমণীই অশ্রুপাত না করিয়া পারিবেন না। প্রত্যেক কুলাঙ্গনারই একখানি লইয়া গৃহের শোভা বর্দ্ধন করা উচিত। ভ্রাতা, ভগ্নী, পুত্র, কন্যা, পত্নী, আত্মীয়স্বজন, সকলকেই বিনা বিচারে সতীমাহাত্ম্য উপহার দিবার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পৌরাণিক কাহিনী ও উপন্যাস। চতুর্থ সংস্করণে শৈব্যার সৌন্দর্য্য শতগুণ বর্দ্ধিত হইয়াছে। মূল্য—১॥৹ ডাকব্যয় ।৹।

উমা।—শ্রীপাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। সংসারের স্বাভাবিক ও সাধারণ ঘটনা অবলম্বনে লিখিত। "উমা" একখানি মনোরম গৃহচিত্র—লেখক উপদেষ্টার আসন গ্রহণ না করিয়া—জিজ্ঞাসু হইয়া এই অপূর্ব্ব উপন্যাসের শ্রেষ্ঠ—উমা চরিত্র—অঙ্কিত করিয়াছেন। উমার আদর্শে, মাধুর্য্যে হৃদয় মুগ্ধ হয়। মূল্য ১৷৹ ডাকব্যয় ৵৹।

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্,
২০১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।